কৃষিতত্ত্ব।

কৃষি-বিষয়ক সচিত্র

"কৃষির্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ।
হিংসাদিদোষযুক্তেঽপি মুচ্যতেঽতিথিপূজনাৎ॥"

৩৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, ইম্পিরিয়াল নর্শরী হইতে
শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন প্রেসে
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৭ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ইম্পিরিয়েল নর্শরি।

এই নর্শরিতে সকল সময়ের এবং সকল মরসমোপযোগী শাক সবজি, ফুল ফল ও অপরাপর আবশ্যকীয় বীজাদি পত্র লিখিলে ভিঃ পিতেও প্রেরণ করা হয়। এই সময়ের এবং বর্ষার বপন উপযোগী কুড়ি রকমের শাক সবজির বীজ মূল্য ১৲ টাকা, পঁচিশ রকমের মূল্য ১॥৹ টাকা এবং ত্রিশ রকমের বীজ মূল্য ২৲ টাকায় পাওয়া যায়। বর্ষার উপযোগী বাগান সাজাইবার মনোহর ফুলের বীজ পোনের রকমের মূল্য ১৲ টাকা। কাশীর পেয়ারা ও মানপুরে উৎকৃষ্ট পেঁপের বীজ তোলা।৹ আনা। আমাদের নর্শরিতে এরূপ গাছ নাই যে পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ আম্রের কলম দুই হাজার রকমের সদাসর্ব্বদা টবে মজুৎ থাকে। ক্রোটন ও গোলাপ ইত্যাদি গাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দর অতি সুলভ, বেশী গাছ লইলে আরও সুলভে পাওয়া যায়। গাছ রেলে কি ষ্টীমারে নির্ব্বিঘ্নে পাঠান যায়। যদি কোন গাছ পথিমধ্যে মরিয়া যায়, দ্বিতীয় অর্ডারের গাছের সহিত বিনামূল্যে তাহা বদল দেওয়া হয়। ফল গাছের জন্য যিনি যেরূপ গ্যারান্টীর আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা দিতে প্রস্তুত আছি। গাছ ও বীজের তালিকার জন্য অর্দ্ধ আনার ষ্টাম্প পাঠাইতে হয়।

গতবর্ষের কৃষিতত্ত্ব পুস্তকাকারে বাঁধাইয়া মজুৎ রাখা হইয়াছে, ইহাতে বিস্তর সুন্দর সুন্দর ছবি আছে, আকার ডিমাই ৮ পেজী, ২৮৮ পৃষ্ঠায় শেষ, মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১॥৹ টাকা। এই সকলের জন্য পত্রাদি এবং মূল্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইবেন। ইনিই এ প্রদেশের নর্শরির সৃষ্টিকর্ত্তা ও কৃষিতত্ত্বের আবিষ্কারক। ইহার দ্বারায় লোকে কৃষিকার্য্যে জ্ঞান লাভ করিয়া সৌখীন হইয়াছেন। এরূপ লোকের ও কৃষিতত্ত্বের পরিচয় দেওয়া বাহুল্য। গ্রাহকগণ কোন কাগজে আমাদের বিজ্ঞাপন দেখিতে না পাইলেও মনে করিবেন যে, এই নর্শরীর বিজ্ঞাপন না দিয়াও কার্য্য চালান হইয়া থাকে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়,—ম্যানেজার।

৩৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত

হাঁপানী কাসের

দৈব মহৌষধ।

ক্ষয় বা যক্ষ্মা কাসি, কাসির সঙ্গে রক্ত উঠা, সর্ব্বদা জ্বরলগ্ন আছে, শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক পাইতেছে, কোন চিকিৎসাতেই উপকার হইতেছে না, এমতাবস্থায় জীবনে নৈরাশ না হইয়া একবার সন্ন্যাসীপ্রদত্ত এই মহৌষধ সেবন করুন। হাঁপানী কাসি মানবজীবনের ভারি কষ্টদায়ক, এই পীড়া ডাক্তারী কিম্বা কবিরাজি চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না, তাহা সর্ব্বসাধারণের জানা আছে। কিন্তু এই সন্ন্যাসীপ্রদত্ত হাঁপানী কাসির মহৌষধ সেবনে বহুলোক আরোগ্য হইয়াছেন ও হইতেছেন। তরুণ, পুরাতন কাসি, (ব্রণকাইটিস) আক্ষেপিক কাসি, হুপিং কফ, সর্দ্দি শুষ্কবশতঃ কাসি সমস্তই নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। ভূরি ভূরি প্রশংসাপত্র আছে। অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে প্রশংসাপত্রের বহি পাঠান যায়। ঔষধের মূল্য ১।০ সিকা।

প্রমেহ সংহারক চূর্ণ।—প্রমেহ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহানির মহৌষধ মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

বিনোদ বটিকা।—ম্যালেরিয়া ও প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরের মহৌষধ। মূল্য বড় কৌটা ১৲ টাকা, ছোট কৌটা ॥৵০ আনা।

সর্ব্বমঙ্গলা ঘৃত।—যাবতীয় চর্ম্মরোগের ও দক্রুরোগের মহৌষধ। মূল্য ॥০ আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ডাক্তার শ্রীমুকুন্দচন্দ্র পাল চৌধুরী। আদিস্থান—পোষ্ট আফিস উথলী (ঢাকা)।

ইউনিভার্সেল মেডিকেল ষ্টোর।

৯১ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই স্থানে খুচরা ও পাইকারী ঔষধ এবং বিলাতী পথ্য দ্রব্যাদি বড়বাজারের দরে পাওয়া যায়।

এস, গুপ্ত এণ্ড কোং,
সত্বাধিকারী।

কৃষিতত্ত্ব। কৃষিতত্ত্ব।। কৃষিতত্ত্ব।।!

(কৃষি-বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র)।

"কৃষিতত্ত্ব"—খ্যাতনামা কৃষিবিশারদ নর্শরির সৃষ্টিকর্ত্তা বাবু নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় যাঁহার সাহায্যে কৃষির উপর লোকের সখ জন্মিয়াছে সেই পরমাদরের "কৃষিতত্ত্ব" আবার নূতন সাজে নূতন বেশে সুন্দর সুন্দর চিত্রসহ গতবর্ষ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। এইক্ষণে সকলে স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইয়া, ভিঃ পিতে প্রথম ভাগ গ্রহণ করুন ও দ্বিতীয় বর্ষের মূল্য পাঠাইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হউন। ইহার বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ টাকা মাত্র। পত্রিকার আকার ৮ পেজী ডিমাই তিন ফর্ম্মা। প্রথম ভাগ ২৮৮ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে এবং খুব ভাল বাঁধান। কৃষিতত্ত্বে কি কি আছে দেখুন, জলসিঞ্চন, বীজবপন, হাপর প্রস্তুত করণ, বীজ ধরা এবং রক্ষা করণ, জমীর এবং গাছের পোকা নিবারণ, গাছের কলম করা এবং কত প্রকারের কলম হইতে পারে, বিলাতি সবজীর রন্ধন প্রণালী। ধান্য, চা, তুলার এবং মূলোর আবাদ সমস্ত বিশদরূপে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ হইয়াছে। ফল কথা কৃষিকার্য্যের যাহা কিছু আবশ্যক তাহা কৃষিতত্ত্বে বাদ যায় নাই। চিঠি পত্র এবং মূল্যাদি ম্যানেজারের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়,—ম্যানেজার।
ইম্পিরিয়েল নর্শরি, ৩৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট।

---

১ মোহিনী। **বিরাট উপহার।** ২ কামশাস্ত্র।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

হেড আফিস জামনগর, ব্রাঞ্চ আফিস—বোম্বে, কলিকাতা এবং পুনা।

স্ত্রী পুরুষের রজঃ ও শুক্রসম্বন্ধীয় যাবতীয় দোষ ও তজ্জনিত অন্যান্য ব্যাধিসমূহ নির্ম্মূলকরণক্ষম এবং স্বাস্থ্য ও শক্তিসঞ্চারক—

আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা।—মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা মাত্র। একত্র ৪৲ টাকার ঔষধ লইলে, বিখ্যাত চিত্রকর রবি বর্ম্মার তুলিকানিঃসৃত বিবিধ বর্ণবৈচিত্রশালিনী "২৪।৩৬" আকারের

মোহিনী নামক চিত্র উপহার দেওয়া যায়। যিনি আমার নিম্নলিখিত ঠিকানায় নাম ধাম পাঠাইবেন, তাঁহাকে

কামশাস্ত্র নামক বিশেষ উপযোগী পুস্তক বিনা মূল্যে ও বিনা ডাঃ মাঃ প্রেরণ করা যায়। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে, নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিবেন।

কবিরাজ শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,
১৬৬-৬৮, হেরিসন রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্যবস্থাপক চিকিৎসক

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

এই স্থানে কবিরাজী মতের সর্ব্বপ্রকার অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল ঘৃত, মকরধ্বজ প্রভৃতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। বিদেশীয় রোগিগণ অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্পসহ রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রেরণ করা হয়। ১৩০৬ সালের পঞ্জিকা ও বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত আমাদের ঔষধালয়ের মূল্য-নিরূপণ পুস্তক, পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে পাঠাইয়া থাকি।

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল জগতে অতুলনীয়। ইহার মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই। জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্কের স্নিগ্ধকর। জবাকুসুম তৈল শিরোরোগের মহৌষধ। জবাকুসুম তৈল কেশের পরম হিতকর। জবাকুসুম তৈল মহা সুগন্ধি। ভারতের যাবতীয় খ্যাতনামা মহাত্মাগণ ইহার প্রশংসা ও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মূল্য এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাশুল ।০ আনা, প্যাকিং ৵০ আনা। ভিঃ পিতে আর ৵০ আনা অধিক। ডজন ১০৲ টাকা, মাশুলাদি ২।৵০ টাকা।

সর্ব্বরোগনাশক

ষড়্গুণবলিজারিত স্বর্ণ-ঘটিত বিশুদ্ধ মকরধ্বজ।

মকরধ্বজ যে সর্ব্বরোগের মহৌষধ, ইহা কোনও ভারতবাসীর অবিদিত নাই; শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে যথার্থরূপে প্রস্তুত হইলে, মকরধ্বজের ন্যায় সর্ব্বরোগদমন ও বলকারক ঔষধ অতি বিরল। অনুপান বিশেষে প্রযোজিত হইলে ইহা দ্বারা অজীর্ণ, অর্শ, অম্লপিত্ত, শুক্রক্ষয়, দুঃস্বপ্ন, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, শ্বাস, কাস, অজীর্ণ, ক্রিমি এবং বৃদ্ধাবস্থায় প্রায় সমস্ত পীড়া, উৎকট ব্যাধির অন্তে বা স্ত্রীগণের প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য এবং জীর্ণ ও জটিল রোগ সকার সকল ত্বরায় নিবারিত হয়।

৭ পুরিয়ার মূল্য ১৲ টাকা, মাশুল ।০ আনা। ভিঃ পিতে ৵০ আনা অধিক। ।০ আনা মাশুলে অনেক ঔষধ যায়।

এক ভরির মূল্য ২৪৲ টাকা। মাশুল ।০ আনা, পত্রাদি আমার নামে পাঠাইবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

কৃষিতত্ত্ব।

কৃষিবিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড। মাঘ ১৩০৬ সাল। ১ম সংখ্যা।

আমাদের নিবেদন।

পরমকরুণানিদান মঙ্গলময় পরমপিতা বিশ্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় অপ্রতিহতপ্রভাবে অদ্য আমরা আবার সাধারণের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইলাম। কোথা হইতে কাহারদ্বারা এবং কিরূপে সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা সহজজাত বনপ্রসূনের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে তাহা অল্পবুদ্ধি আমরা কি প্রকারে বুঝিব? মায়াবদ্ধ জীব আশার কুহকে পড়িয়া মনে মনে নিজ ভবিষ্যতের কত চিত্রই নিত্য চিত্রিত করিতেছে কিন্তু তাহার কয়টি আশা পূর্ণ হইবার সম্পূর্ণ অবসর উপস্থিত হয়? এই দুঃখদারিদ্র-পূর্ণ আধি-ব্যাধিসঙ্কুল পৃথিবীতে মনুষ্যের সকল আশা পূর্ণ হয় না। পূর্ণ হয় কেবল মাত্র সেই অনাদি অনন্ত কল্যাণনিকেতন শ্রীভগবানের ইচ্ছা। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করে কাহার সাধ্য? তাই অদ্য আমরা শ্রীভগবানের অপার করুণায় নির্ভর করিয়া তাহারই অভয়পদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া "কৃষিতত্ত্ব" বাহির করিলাম। পুরাতন ও নূতন গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পাঠকপাঠিকাদিগের সহৃদয়তার উপর "কৃষিতত্ত্বের" জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। আশা করি তাঁহারাও পূর্ব্বমত "কৃষিতত্ত্বের" আশ্রয়দানে মুক্ত-হস্ত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

আজ কৃষিতত্ত্ব নূতনবেশে নূতনকলেবরে সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট উপস্থিত হইলেও কৃষিতত্ত্বের যিনি প্রাণস্বরূপ তিনি সকলেরই বিশেষ পরিচিত। যে সদাশয় ব্যক্তি নিজের পার্থিব সুখসচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টিপাত

না করিয়া কেবলমাত্র পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া নিজজন্মভূমির দুঃখ-দুর্দ্দশায় হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াছিলেন এবং আমাদের দেশের লোকের কৃষিবিষয়ে যাহাতে প্রবৃত্তি হয় প্রতিনিয়তই তাহার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং যিনি ভারতবর্ষে নর্শারির স্থষ্টিকর্ত্তা সেই বিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের পরম সহায়। তাঁহারই নেতৃত্বে এবং তাহারই উপদেশ ও আদেশমত কৃষিতত্ত্ব পরিচালিত হইবে। কৃষিতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত নৃত্যগোপাল বাবু এই কৃষিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া এক সময় রাজাপ্রজা ধনী-নিধন সকলকেই মোহিত করিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর মধ্যে কৃষিবিষয়ে প্রবৃত্তিপ্রচারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া "কৃষিতত্ত্ব" যে পূর্ব্ববৎ জনসাধারণের চিত্তাকর্ষন ও মনো-রঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে তাহা একরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত। কেবলমাত্র নৃত্যগোপাল বাবুর নাম করিলেই সাধারণে বুঝিতে পারিবেন কৃষিতত্ত্ব কিরূপ উপাদেয় তত্ত্বে পূর্ণ থাকিবে। তথাপি আমরা সাধারণের অবগতির জন্য কৃষিতত্ত্বের বিষয়সন্নিবেশের কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আভাষ পাঠকবর্গকে প্রদান করিতেছি।

কৃষিতত্ত্বে সাধারণ কৃষি-সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই সন্নিবেশিত হইবে। দেশীয় এবং বিদেশীয় কৃষি ও কৃষকের কথা এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে দেশের কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধমালা কৃষিতত্ত্ববিশারদ বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ দ্বারা লিখিত হইয়া কৃষিতত্ত্বের কলেবর পূর্ণ করিবে। যে সকল ব্যক্তি নিজে কৃষিকার্যে ও উদ্যানবাটিকা প্রস্তুত করিতে যাইয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য আমরা নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিশেষ মনোযোগের সহিত ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত করিব।

(১) বীজ বপন—অনেক ব্যক্তি অর্থদিয়া কেবলমাত্র বিজ্ঞাপন দেখিয়া নানা-বিধ বীজ ক্রয় করিয়া রোপন করিয়া থাকেন। কিন্তু বীজ বপন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অভাবে সকল সময়ে তাঁহাদের উক্ত বীজ অঙ্কুরিত হয় না। বীজবপন সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নিয়মাবলি প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিব।

(২) গাছ রোপণ—বীজ অঙ্কুরিত হইলেও যদি রীতিমত প্রণালী শুদ্ধভাবে বৃক্ষ রোপণ করা না হয় তাহা হইলে বৃক্ষ কখনই জীবিত থাকে না। এ সম্বন্ধেও বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রকাশিত হইবে।

(৩) জলসিঞ্চন—ঠিক নিয়ম মত জলসিঞ্চন করিতে না পারিলে হয় জলের অভাবে বৃক্ষ নষ্ট হইয়া যায় নতুবা অতিরিক্ত জল সিঞ্চন করিলে বৃক্ষ সকল হাজিয়া পচিয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে কোন্ কোন্ চাষে কি প্রণালীতে জল সিঞ্চন করিলে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও বিশেষরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

(৪) হাপর প্রস্তুত করণ—কি প্রণালীতে হাপর প্রস্তুত করিতে হয় তাহাও দেখান হইবে।

(৫) সারদেওন—সারের অভাবে কত সুন্দর উর্ব্বরা ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? পক্ষান্তরে সারের গুণে কত অনুর্ব্বরা ভূমি শোভাময়ী শস্যশ্যামলারূপ ধারণ করিতেছে। কোন্ কোন্ আবাদে কি কি সার কোন প্রণালীমত প্রদান করিতে হয়, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

(৬) চারা নাড়িয়া বসান।

(৭) দেশ বিদেশের চাষ আবাদ করণ—আজ কাল আমাদের দেশে অনেকেই বিদেশীয় শাক্ সব্জী ও বৃক্ষ লতাদি রোপণে অভিলাষী কিন্তু রোপণের প্রণালী অজ্ঞাত থাকায় অনেকেই সফলমনোরথ হইতে পারেন না। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

(৮) গাছের পোকা নষ্ট করণ—বৃক্ষাদির প্রধান শত্রু পোকা লাগিয়া কত শত বৃক্ষ লতা একবারে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ঐ পোকা নষ্ট করিবার অনেক উপায় আছে। আমরা ক্রমে ক্রমে সেই সকল উপায় দেখাইতে চেষ্টা করিব।

(৯) জমির নোনা নিবারণ—জমিতে নোনা লাগিয়া অনেক জমি একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। নোনা নিবারণের বিশেষ বিশেষ নিয়মাবলি আমরা প্রকাশ করিব।

(১০) কলম প্রস্তুত করণ—অসংখ্য প্রকার কলম প্রস্তুতের প্রণালী আছে। কোন্ কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিলে অতি আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়। তদ্‌সম্বন্ধে যাবতীয় তত্ত্ব আমরা সাধ্যানুসারে প্রকাশ করিব।

(১১) সর্ব্ব প্রকার দেশীয় ও বিদেশীয় পুষ্প, ফল ও মূলের রহস্যময় তত্ত্বাবলিও প্রকাশিত হইবে।

(১২) রন্ধন প্রণালী—অনেক যত্ন চেষ্টা করিয়া শাক সব্‌জী উৎপন্ন করিতে পারিলেও ঠিক কি প্রণালীমত রন্ধন করিয়া উহা ব্যবহারোপযোগী করা যায় তাহা অনেকেই অবগত নহেন। কোন্ কোন্ সব্‌জী কি কি প্রণালীতে এবং কত প্রকার প্রণালীতে রন্ধন করা যায় আমরা তাহা বিশেষরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

উপরোক্ত বিষয়াবলি ব্যতীত নানা প্রকার আয়কর দ্রব্যের (যথা চা, কাফি, পাট, শন, তুলা, তামাক, নীল প্রভৃতি) আবাদের প্রণালী ও পদ্ধতি যথাবিহিত রূপে কৃষিতত্ত্বে স্থান পাইবে।

উল্লিখিত অসংখ্য প্রকার বিষয়ের আলোচনা করা স্থান ও সময়সাপেক্ষ প্রথম সংখ্যায় সকল বিষয়ের আলোচনা করা একবারে অসম্ভব। আমরা ক্রমে ক্রমে সকল বিষয় দেখাইতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিব। গ্রাহকগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন প্রথম সংখ্যা দেখিয়াই কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে মতামত স্থির না করেন। কৃষিতত্ত্ব কি রূপ হইবে তাহা অন্ততঃ এক বৎসর কাল পত্র পাঠ না করিলে বুঝিতে পারা যাইবে না।

কৃষি ও কৃষক।

সুসভ্য ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রদেশে কৃষিকার্য্য ও কৃষক কুলেরযেরূপ সমাদর ও সম্মান দৃষ্টি গোচর হয় আমাদের দেশের কৃষককুল ও কৃষিকার্যের উপর দেশের শিক্ষিত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গকে সেরূপ সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করিতে দেখা যায় না। কৃষকদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনতো দূরের কথা আমাদের দেশের শিক্ষিত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্য ও কৃষক কুলের প্রতি পক্ষান্তরে বিপরীত ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন।

সমাজের প্রাণ ও মেরুদণ্ডস্বরূপ পরম উপকারী নিরীহ কৃষককুলকে "চাষা" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া বাহাদুরী লইতেও অনেকে পশ্চাৎপদ হয়েন না। পরপদলেহন করিয়া পরমুখাপেক্ষী থাকিয়া পরের দাসত্ব করিব, তথাপি স্বাধীনবৃত্তি কৃষি-কার্য্যে মনোযোগ দিব না। আফিসের সাহেবের নিকট অপমানিত, লাঞ্ছিত ও পদদলিত হইব এমন কি আফিসের সাহেবের স্থূপুষ্ট হস্তদ্বারা কর্ণমর্দ্দিত হইলেও স্থির হইয়া থাকিব তথাপি কোন প্রকার স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিব না। আমার যতই কেন অল্প বেতন হউক না, আমি আফিসে যাইয়া যে কোনও কার্য্য করি না কেন, আমি কিন্তু তথাপি আফিসের "বাবু"। আর তুমি স্বাধীন ভাবে কৃষিকার্য্য করিয়া কিংবা অন্য কোনও লাভজনক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সুখেসচ্ছন্দে জীবনঅতিবাহিত করিবে— তুমি কিন্তু হবে "অসভ্য চাষা" নয় "অসভ্য দোকানদার" !! দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রাগুক্ত ভাবের প্রসার বৃদ্ধি প্রকৃতই জাতীয় অধঃপতনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদের দেশের পুণ্যময় প্রাচীনকালের পুরাবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বে আমাদের দেশের এরূপ ভাব ছিল না। প্রাচীনকালে কৃষককুল বিশেষ আদর ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। কৃষিকার্য্য অতি পবিত্র বলিয়া সাধারণের ধারণা ছিল। আমাদের দেশে বশিষ্ট জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ কৃষিকার্য্য করিতে মহাগৌরব জ্ঞান করিতেন; আর আজ আমরা সামান্য দুইপাতা ইংরাজি উল্টাইয়া একবারে "বাবু" হইয়া উঠিয়া মহা গৌরবের বস্তু কৃষককুলকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখি, ইহার অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

ভারতবর্ষের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ উদরান্নের জন্য কেবলমাত্র রাজা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিদেশী বণিকদিগের করুণাকণার উপর নির্ভর না করিয়া কৃষি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে ক্রমে তাহাদের ও উদরান্নের সংস্থান হয় এবং দেশের কৃষিকার্য্যেরও ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকে। কৃষিসম্বন্ধে কৃষক-দিগের জ্ঞানের অভাবেই যে এ দেশে কৃষিকার্য্যের অবনতি হইতেছে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কৃষি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব ইংলণ্ড ও আমেরিকায় খুব অধিক, সেই জন্য তথায় কৃষিকার্য্য ও কৃষককুলের এত উন্নতি। আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণও যদি কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন

তাহা হইলে আমাদের দেশেও কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে। দেশের কতকগুলি সুসন্তান স্বদেশ হইতে বহু অর্থব্যয় করিয়া ও নানাবিধ ক্লেশস্বীকার করিয়া ইংলণ্ড যাইয়া কৃষিবিদ্যা ও কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসেন। আমরা তাঁহাদের নিকট দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইবে বলিয়া কতই আশা করিয়াছিলাম কিন্তু আমাদিগকে এসম্বন্ধে বিশেষরূপে হতাশ্বাস হইতে হইয়াছে। বিখ্যাত সিরেন্সেষ্টার কলেজ হইতে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আসিয়া ইঁহারা অনেকেই সরকারের চাকুরি করিতে বাধ্য হয়েন। ধনকুবেরদিগের বিলাতপ্রত্যাগত কৃষিবিদ্যানিপুণ ভারত সন্তানগণকে অর্থ সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করিতে আদৌ প্রবৃত্তি হইল না! ইহা বাস্তবিকই দেশের দুর্ভাগ্য। যত দিন না দেশের ধনকুবেরদিগের দেশের কৃষককুলের অবনতি দেখিয়া ও তাহাদের দুঃখদারিদ্র্যের হাহা রব শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ব্যথা লাগিবে এবং যত দিন না তাঁহারা অর্থ সাহায্য দ্বারা দেশের কৃষিকার্য্যের অবস্থার উন্নতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তত দিন দেশের কৃষককুলের অবস্থার উন্নতি কিছুতেই হইতে পারে না।

প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক্ মহোদয় যখন ভারতবর্ষের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতাপুরুষরূপে বিরাজ করিতেছিলেন তখন এদেশের কৃষককুলের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার করুণহৃদয়ে ব্যথা লাগিয়াছিল। তিনি এদেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য বিশেষরূপ যত্ন করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী লেডি উইলিয়ম বেণ্টিক্ মহোদয়াও এতদ্দেশীয় কৃষককুলকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন তিনি স্বয়ং এগ্রিকলচারল্ সোসাইটিতে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে কৃষক ও মালীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা হইতেন না। মহাত্মা বেণ্টিক বাহাদুর যে কৃষিকার্য্যকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি আপনাকে কৃষক বলিয়া পরিচয় দিতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হইতেন না, পক্ষান্তরে কৃষক বলিয়া পরিচিত হওয়াকে তিনি বিশেষ গৌরবের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। মহারাজ রণজিৎসিংহের সহিত তাঁহার কৃষিসম্বন্ধে অনেক কথা হইত। তিনি তাহার একখানি পত্রে রণজিৎসিংহজীকে লিখিয়াছিলেন "মহারাজ অবশ্যই জানেন যে তাবৎসম্পত্তির মূলই হইল ভূমি। সুতরাং যাহাতে

ভূম্যোৎপন্ন দ্রব্যের ও তাহার গুণের বৃদ্ধি হয় তৎপক্ষে সাহায্য ও পোষকতা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা করা এবং ঐরূপ আলোচনার ফল যাহাতে সাধারণ কৃষকে বুঝিতে পারে তদ্রূপ ভাবে প্রকাশ করা প্রত্যেক স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশে কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিতান্ত অনুর্ব্বরা ভূখণ্ডকেও শস্যশ্যামলা ভূখণ্ডে পরিণত করিতে পারা যাইতেছে তৎসম্বন্ধে যাবতীয় তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া প্রচার করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ফলতঃ কি করিলে দেশের নিরন্ন কৃষককুলের অবস্থার উন্নতি হয় এবং দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ দাসত্ববৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক কৃষিকার্য্যে রত হন, সকলেরই সে বিষয়ে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আমগাছে পোকা নিবারণের উপায়।

এ দেশে আজ কাল প্রায়ই আমগাছে পোকা হইয়া গাছকে বিলক্ষণ নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য করে। ইহাতে ফলেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। নিম্ন লিখিতনুযায়ী অতি সহজ উপায়ে পোকা নষ্ট হয়।

চিনির সিরা প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত গন্ধক চূর্ণ বা তাম্রচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, তৎপরে উহাতে দশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ (arsenic) অর্থাৎ সেঁকো চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বৃক্ষের শাখায় শাখায় লেপন করিতে হইবেক। উক্ত প্রলেপ বিষাক্ত বস্তু, সুতরাং যাহাতে উহা কাহারও উদরস্থ না হয় সে বিষয় দৃষ্টি রাখিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত উহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কামরাঙা।

কামরাঙা গাছ সচরাচর প্রায় সকল পল্লিগ্রামেই দেখা যায়। অনেকের বিবেচনায় কামরাঙা ফল পীড়া দায়ক, এই জন্য কামরাঙা বড় কাহারও প্রিয়বস্তু নহে। ইহা খাইতে একটু অম্লরস হইলেও সুপ্রণালীমত প্রস্তুত করিয়া খাইলে ইহা তত্তোধিক অনিষ্টকর হয় না অথচ খাইতে বেশ সুস্বাদু

হয়। কাঁচা কামরাঙায় অবশ্য অনিষ্ট হয়, সেই জন্য কাঁচা না ব্যবহার করিয়া ইহার মোরব্বা প্রস্তুত করিলে অথবা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভিনিগারে ভিজাইয়া রাখিলে, ইহা অতি উপাদেয় ও মুখরোচক খাদ্যে পরিণত হয়।

কামরাঙার আচার করিতে হইলে লেবুর রসের সহিত ঈষৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া উহাতে খণ্ড খণ্ড কামরাঙা ভিজাইয়া কিছুদিন রৌদ্রেদিয়া রাখিলে অতিসুন্দর মুখরোচক চাটনি হয়। উহাতে দুই একটি লঙ্কা দিতে পারিলেও মন্দ হয় না।

কামরাঙাগাছ ব্যবসায়ের পক্ষেও একটি বিশেষ লাভ জনক জিনিষ। কামরাঙাপাতা নীলের ন্যায় পচাইলে ও তদ্রূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করিলে, অতি সুন্দর হরিদ্রাবর্ণ প্রস্তুত হয়। কামরাঙার আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গুণ আছে, তাহা সকলেরই জানা আবশ্যক। কাপড়ে কোনরূপ লৌহের কশ ধরিলে অর্থাৎ কালি ইত্যাদি পড়িলে কামরাঙার রসে ঈষৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া সেই স্থানে মর্দ্দন করিলে, অতিশীঘ্র ও সহজে সমস্ত দাগ দূরীভূত হয়। লৌহের কশ উঠাইবার পক্ষে কামরাঙা যেরূপ অমোঘ ঔষধ তেমন আর কিছুই নহে।

অসামান্য ও অদ্ভুত গুণসম্পন্ন দেশীয় উদ্ভিদ্।

হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকের মনে অসাধারণ গুণসম্পন্ন উদ্ভিদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে। অনেকেই মনে করেন যে ভারতবর্ষে এমন অনেক লতা বৃক্ষাদি বর্ত্তমান আছে, যাহাদের গুণের সীমা করা অসম্ভব। "জ্যোতিষ্মতী" নাম্নী এক প্রকার লতা এই শ্রেণীর উদ্ভিদের অন্তর্গত। উক্ত লতার গাছ সকল আসাম প্রদেশে ও ভারতবর্ষের উত্তরাংশের দুরাতিক্রম্য পর্ব্বত শিখরে কিম্বা উপত্যকা ভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য বৃক্ষলতাদির মধ্যে থাকিলে দিবা ভাগে জ্যোতিষ্মতী লতাকে চিনিয়া বাহির করা বড়ই কঠিন। যে সকল হঠযোগীরা অসাধারণ শারীরিক কিম্বা মানসিকগুণের প্রয়াসী, তাঁহারা এই লতার অন্বেষণ জন্য বহুবিধ শ্রমস্বীকার করিয়া থাকেন। রাত্রিকালেই এই লতা চিনিয়া বাহির করিবার উপযুক্ত সময়। রাত্রে এই লতার পত্র হইতে এক

প্রকার আলোক বা জ্যোতিঃ বাহির হয় এবং এই জন্যই এই লতাকে সংস্কৃত ভাষায় "জ্যোতিষ্মতী" বলিয়া থাকে। যিনি এই বৃক্ষ অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হন তিনি নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া অতি যত্নে এই লতা সংগ্রহ করেন। ইহার পাতার রসের এমনই গুণ যে ইহা কিঞ্চিৎ মাত্র লইয়া দ্রবমান তাম্রের উপর নিক্ষেপ করিলে ঐ তাম্র তৎক্ষণাৎ ভস্মে পরিণত হইয়া যায়। বহুদিনের পর পুরাতন তাম্রই উক্ত রূপ ভস্মে পরিণত হয়। ভস্মীভূত তাম্রের গুণ অদ্ভুত। সাধারণতঃ যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিবিধ ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে যদি সেই সেই ঔষধে সেই সেই ব্যাধি আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত তাম্রভস্ম অতি অল্প মাত্রায় ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইলে অদ্ভুত ফল পাওয়া যায়। কুষ্ঠরোগ ঐরূপ ভস্মে নিশ্চয়ই আরোগ্য হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রানুসারে তিন প্রকার কুষ্ঠ আছে, এক প্রকার কুষ্ঠে কেবল মাত্র রক্ত বিকৃত হয়, এক প্রকারে মাংস বিকৃত হয় এবং অন্য প্রকারে অস্থি বিকৃত হয়। শেষোক্ত প্রকার ব্যাধি একবারে দুরারোগ্য, কিন্তু প্রথমোক্ত দুই প্রকার কুষ্ঠ উক্তরূপ তাম্রভস্মের দ্বারা আরোগ্য হয়। কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন যে উক্তপ্রকার তাম্রভস্মের দ্বারা নিকৃষ্ট ধাতু হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। দ্রবমান তাম্রের উপর এই ভস্ম কিঞ্চিৎ মাত্র নিক্ষেপ করিলেই উহা স্বর্ণে পরিণত হইয়া যায় উক্ত প্রকারে স্বর্ণ প্রস্তুত করা অসম্ভব হইলেও উহাকে একটি মূল্যবান ঔষধের লতা বলিয়া সকলেরই আদর করা উচিত।

"জ্যোতিষ্মতীর" পত্র অত্যন্ত তেজস্কর বলিয়া যে সকল ব্যক্তি সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা এই পত্র নিয়মিতরূপ সেবন করিয়া থাকেন। এই পত্র ভক্ষণের দ্বারা মস্তিষ্কে এরূপ তেজ সঞ্চয় হয় যে উহাতে মস্তিষ্কের মালিন্য দূরীভূত হইয়া মস্তিষ্ক নব আলোকে উদ্ভাসিত হয় এবং পত্র-ভক্ষকের অমানুষিক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ কিম্বদন্তি আছে যে, কোন সময় একত্রে দশ জন ব্যক্তি ঐ পত্র ভক্ষণ করিয়াছিলেন। পত্র ভক্ষণের দ্বারা শরীরের আভ্যন্তরীণ তাপ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে উক্ত দশজনের মধ্যে আটজন তৎক্ষণাৎ কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। কেবল মাত্র দুইজন জীবিত ছিলেন। উহার

মধ্যে এক জন "সিদ্ধান্তবিন্দু" প্রণেতা পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী এবং অপর জন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত এবং লেখক শ্রীযুক্ত গদাধর ভট্টাচার্য্য। "জ্যোতিষ্মতীর" পত্রভক্ষণের দ্বারাই উক্ত পণ্ডিত দ্বয়ের অসাধারণ জ্ঞান লাভ হইয়াছিল এবং এই জন্যই অপর কেহ ইঁহাদের ন্যায় অমূল্য গ্রন্থরত্নাবলী লিখিতে সমর্থ হন নাই।

আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহার নাম "রোদন্তী"। ইহার গাছগুলি ক্ষুদ্রায়তনের হয় এবং শাখা পত্রে এরূপ আবৃত থাকে যে দূর হইতে দেখিলে ঠিক একটি ছাতির ন্যায় বোধ হয়। এই বৃক্ষের পত্র হইতে নিয়তই এক প্রকার তরল পদার্থ বাহির হইতে থাকে, উহা অশ্রুজলের ন্যায় পতিত হয় বলিয়া উক্ত বৃক্ষের নাম হইয়াছে "রোদন্তি"। পারদপূর্ণ কোনও পাত্রে রোদন্তীর উক্তরূপ রস বা আটা সংগ্রহ করিলে পাত্রস্থ পারদ রৌপ্যের ন্যায় এক প্রকার পদার্থে পরিণত হয়। ঐরূপ রৌপ্য খণ্ডের দ্বারা দ্রবমান লৌহ কিম্বা তাম্রকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারা যায়.

আমরা নিজে উক্ত দুই প্রকার অদ্ভুত গুণসম্পন্ন বৃক্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনই পরিচয় পাই নাই। গত নভেম্বর মাসের "থিয়সফিষ্ট" পত্রের জনৈক লেখক উক্ত দুই প্রকার বৃক্ষের উপরোক্ত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। লেখকও স্বয়ং উক্তরূপ বৃক্ষ দেখেন নাই। যাঁহারা হিমালয় প্রদেশ ভ্রমণ করেন কিম্বা যাঁহাদের উক্ত বৃক্ষাদির সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য ঔৎসুক্য আছে তাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এবিষয়ের যথাযথ তত্ত্ব সাধারণের গোচর করেন লেখকের ইহাই ইচ্ছা। ফলবতী হইলে আমরা সুখী হইব।

বাঙ্গালাদেশের কবিরাজেরা জ্যোতীষ্মিতী নাম্নী একপ্রকার লতা ঔষধাদিতে ব্যবহার করিয়া থাকেন। চলিত কথায় ইহাকে "লতাকটুকী" বা "লতাপটকী" বলিয়া থাকে। এই "জ্যোতিষ্মতীর" সহিত উপরে বর্ণিত লতার কোনও সংস্রব আছে কি না আমরা তাহা অবগত নহি। যাহা হউক এ সম্বন্ধে .যিনি প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া .প্রকাশ করিবেন তিনি নিশ্চয়ই সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। অনুসন্ধানের ফল আমাদের নিকট পাঠাইলে আমরা সাদরে উহা "কৃষিতত্ত্বে" প্রকাশ করিব।

এলাচি।

CARDAMOM.

এলাচ গাছ ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে, তবে দক্ষিণ প্রদেশেই কিছু অধিক জন্মিয়া থাকে। এলাচ তিন প্রকার; ছোট, মাঝারি, ও বড় তন্মধ্যে মাঝারি ও বড় এক জাতীয়, ছোট এলাচ সমূহ বিভিন্ন জাতীয়। ছোট এলাচের বৈজ্ঞানিক নাম (Elellaria Cardamom) ছোট এলাচ দাক্ষিণাত্য প্রদেশেই বিস্তর জন্মিয়া থাকে; সিংহল দ্বীপেই ইহার আবাদ বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। এলাচ গাছ বড় হইতে প্রায় ৪।৫ বৎসর লাগে, এবং ৬.৭ বৎসর বাদে গাছ সকল ফল প্রসব করিয়া থাকে। ত্রিবাঙ্কুরের বনে এক এক স্থানে প্রায় ৩০০০ হইতে ৫০০০ ফিট জমি ব্যাপিয়া এলাচ গাছের ঝাড় দৃষ্ট হয়। ত্রিবাঙ্কুরে গ্রেণাইট্ প্রস্তরময় জমীর উপর এলাচ গাছ বিস্তর জন্মে।

পূর্ব্বে য়ুরোপে এলাচগাছ ছিল না.ভারতবর্ষ হইতে লইয়া গিয়া য়ুরোপিয়ানরা তথায় এলাচের চাষ করে। এলাচের জন্মস্থান আমাদের দেশে কিন্তু এই এলাচের জন্য আজ আমরা পরমুখাপেক্ষী।' ইহা কি কম দুঃখের বিষয়! একমাত্র কৃষিকার্য্যে অমনোযোগীতা আমাদের দুঃখের প্রধান কারণ। কি আশ্চর্য্য! যে ভারতবর্ষ কৃষির শীর্ষ স্থান বলিয়া পরিগণিত, যে ভারতবাসিগণ কৃষি কার্য্যকে ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, অদ্য সেই ভারতবাসিগণ কৃষিকার্য্যকে সামান্য নীচ ব্যবসা জ্ঞানে সদাই ঘৃণার চক্ষে দেখেন।

মুসলমান লেখকগণ দুইপ্রকার এলাচের উল্লেখ করিয়া থাকেন, কাকুলা ও "হিল" হাকিমী গ্রন্থেও দুই প্রকার এলাচের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, "শিঘার" (ছোট) ও "কিবার" (বড়), ছোটগুলি স্ত্রীজাতীয় ও বড়গুলি পুংজাতীয়।

ছোট এলাচ পাঁচ প্রকার, কাগচি, মালাবারী, গুজরাটি, পৈতিকি ও সিংহল, কলিকাতার ও বোম্বায়ে, মালাবারী ও গুজরাটি এলাচই বেশী চলিত। ছোট এলাচ ব্যঞ্জনাদি সদ্গন্ধ করিবার জন্যই অধিক ব্যবহৃত হয়। বড় এলাচ আমাদের বঙ্গদেশে জন্মে। বড় এলাচের মন ১০৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত। বড় এলাচ পানে ও মিষ্টান্নেই বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এলাচির সংস্কৃত পর্য্যায়—কপোতপর্ণী, বালা, বহুলগন্ধা, ঐন্দ্রী, হিমা, বলবতী, গান্ধালীগর্ভ, কায়স্থা, এলীকা, দ্রাবিড়ী, চন্দ্রিকা ও সাগরগামিনী।

এলাচির আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, কফনাশক, সুগন্ধি, শীতল, মলভেদ, বমন, শুক্র ও পিত্তরোগ নাশক। ছোট এলাচি অপেক্ষা বড় এলাচিই বহুগুণ বিশিষ্ট।

বড় এলাচির বিশেষগুণ—কোষ্ঠবদ্ধ, শূল, পিপাশা ও ছর্দ্দিনাশক।

ছোট এলাচির বিশেষগুণ—শ্বাস, কাশ, কফ, অর্শ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক। এলাচি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সময়ান্তরে প্রকাশ্য। ইহার চাষ প্রণালী প্রকাশ করিবার জন্যও আমরা বিশেষ চেষ্টায় রহিলাম, সুবিধা বুঝিলে সহৃদয় পাঠকগণকে জ্ঞাত করাইব।

চৈত্রে বা ভুঁয়ে শশা।

বালুকা মিশ্রিত মৃত্তিকাতেই চৈত্রে বা ভুঁয়ে শশার উত্তমরূপ আবাদ হইয়া থাকে। সুতরাং যে জমীতে বালুকার ভাগ বেশী, সেই জমীতেই উক্ত শশার বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। পৌষ মাসের শেষে বা মাঘ মাসের প্রথমে উত্তমরূপে দুই তিন বার লাঙ্গল দিতে হইবে এবং তৎপরে মই টানিয়া জমীর উচুঁ নিচু সমান করিয়া লইতে হইবে, তাহার পর দুই তিন হাত অন্তর এক একটি খুবরি করিয়া তাহার মধ্যে পাঁচ ছয়টী করিয়া বীজ বপন করিয়া উহার উপর অল্প পরিমাণ গুঁড়া মৃত্তিকা চাপা দিতে হইবে। মৃত্তিকা দ্বারা বীজগুলি এরূপ ভাবে চাপা দিতে হইবে, যেন উহাদিগকে বাহির হইতে দেখা না যায়। যে দিবস উক্ত প্রকারে বীজ বপন করা হইবে ঠিক তাহার পর দিবস উহার উপর সামান্য পরিমান জল দিয়া কেবল মাত্র মৃত্তিকা শীতল রাখিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে বীজ বপন করিলে তিন চারি দিবসের মধ্যেই শশার চারা বাহির হইবে। চারা বাহির হইতে কদাচিৎ কখনও কিছু বিলম্বও হইয়া থাকে। চারা সকল যখন একটু বড় হইয়া লতার আকার ধারণ করিবে তখন খুবরি গুলিতে প্রচুর পরিমাণে জল সেচন করিতে হইবে। যদি বৃহৎ ক্ষেত্রে ভুঁয়ে শশার আবাদ করিতে হয় তাহা হইলে ক্ষেত্রে ছেঁচা জল দেওয়াই কর্ত্তব্য। ভুঁয়ে

শশার বৃক্ষে উত্তমরূপ সার না দিলে তাদৃশ 'সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। পুরাতন গোময়ই ইহার পক্ষে উত্তম সার। তিন চারি বৎসরের পুরাতন গোময়, যাহা দেখিতে ঠিক মৃত্তিকার আকার ধারণ করিয়াছে, সেই প্রকার গোময়ই ভুঁয়ে শশার উপযুক্ত সার। এক অঞ্জলি সার প্রত্যেক খুবরিতে দিতে হইবে এবং খুবরির মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ পরিমাণে উঠাইয়া উহাকে পুনর্ব্বার সমতল করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে যে পরিমাণ সারমাটির প্রয়োজন সেই পরিমাণ সারমাটি ব্যবহার করিতে হইবে। যে দিবস এই প্রকারে খুবরিগুলি সমতল করিয়া দিবে তৎপর দিবস উহাতে প্রচুর পরিমাণ জল সিঞ্চন করিতে হইবে। এরূপ ভাবে জল সেচন করা উচিত যেন মাটী পাঁচ ছয় দিবস পর্য্যন্ত বেশ নরম থাকে। প্রতি-সপ্তাহে খুবরি সকল এক এক বার নিড়ান দিয়া খুসিয়া দিতে হইবে। অতি সাবধানতার সহিত উক্তভাবে নিড়ান দেওয়া উচিত। কারণ সাবধান হইয়া না খুসাইলে শশাগাছের কোমল শিকড় সকল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যে সকল চারা বাহির হইবে তাহার মধ্যে যদি কোনও চারা নিতান্ত নিস্তেজ বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে উহা একবারে উঠাইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। চারাগুলি যখন লতাইতে আরম্ভ করিবে তখন উহাদের ডগা-গুলি পরস্পর পৃথক ভাবে রাখিতে হইবে। কতকগুলি গাছের ডগা একত্রে জড়াইয়া গেলে গাছে ভালরূপ ফল ফলিবার সম্ভবনা থাকে না।

ভুঁয়ে শশার বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ বার ঘণ্টাকাল বীজগুলিকে জলে ভিজাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে বীজ সকল অতি শীঘ্রই অঙ্কুরিত হয়। জলে বীজ সকল ভিজাইলে যে সকল বীজ ভাসিয়া থাকে, কিছুতেই ডুবে না, সেই সকল বীজ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কারণ সেই সকল বীজ অঙ্কুরিত হইবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। উপরোক্ত প্রকারে ভুঁয়ে শশার বীজ বপন করিলে এবং উপরোক্ত প্রকারে গাছগুলিকে রক্ষা করিলে প্রত্যেক গাছে প্রচুর পরিমাণে ফল হইতে পারে।

জিনিয়া এলিগেন্স্।

(Zinnia Elegans)
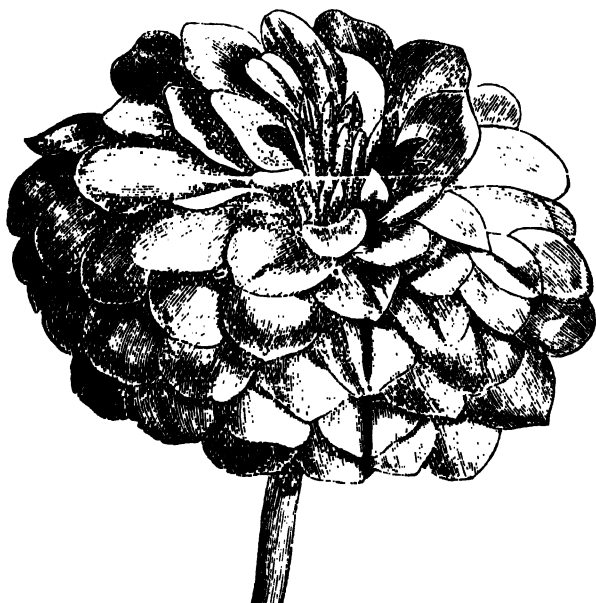
এই প্রবন্ধের শিরোদেশে যে মনোহর পুষ্পটী শোভা পাইতেছে, উহারই নাম "জিনিয়া এলিজেন্স।" জিনিয়াপুষ্প দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। এক একটী পুষ্পের নয়নমনোহর সৌন্দর্য্যে উদ্যান আলোকিত হইয়া থাকে। এই পুষ্পের প্রধান ও বিশেষ গুণ এই যে, উহা একবার প্রস্ফুটিত হইলে সহসা শুষ্ক হয় না; প্রস্ফুটিত অবস্থাতেই অনেক দিন থাকে। সুতরাং উদ্যান সুসজ্জিত করিতে হইলে, উদ্যানে জিনিয়ার বৃক্ষ রোপণ করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের দেশের গাঁদাফুলের সহিত এই ফুলের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। গাঁদার গাছ যেমন সহজে মরে না, বিশেষ পাইট্ করিতে হয় না, ফুল ফুটিতে যেমন সময় লাগে এবং একবারে ফুটিলে যেমন সহজে শুষ্ক হইয়া যায় না, জিনিয়া পুষ্পও তদ্রূপ। এদেশে বৎসরের মধ্যে দুইবার জিনিয়া পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এজন্য দুইবার বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। গাঁদাফুলের ন্যায় জিনিয়ারও দলের গোড়া হইতে চারা হইয়া

থাকে। ইহার বীজ ধানের ন্যায় চেপ্টা। মোট কথা যেরূপে গাঁদাফুলের বীজ সংগ্রহ করিতে হয়, জিনিয়ার বীজও ঠিক সেই প্রকারে সংগৃহীত হইয়া থাকে। পুষ্পটী প্রস্ফুটিত হইয়া বৃক্ষেই শুষ্ক হইলে, সেই পুষ্প হইতে বীজ সংগ্রহ করা উচিত।

জিনিয়া ফুল বিবিধ প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পুষ্পের বর্ণও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। ডবল অর্থাৎ বহু দল বিশিষ্ট জিনিয়াই দেখিতে অতি সুন্দর। একটী একটী ফুলের আকার ডালিয়া ফুলের ন্যায় বৃহৎ। যখন কোনও উদ্যানে প্রচুর পরিমাণে জিনিয়া পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়,তখন উদ্যানের শোভা অত্যন্ত মনোহর হইয়া উঠে। ফুল ফুটিয়া বাগানটী প্রকৃতই যেন আলোকিত করিয়া তুলে। এক একটী জিনিয়া বৃক্ষে প্রচুর পরিমাণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। ডবল বা বহুদলবিশিষ্ট জিনিয়া দেখিতে যত সুন্দর, সিঙ্গল বা এক দল বিশিষ্ট জিনিয়া দেখিতে তত সুন্দর নহে। জিনিয়ার বীজ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে বপন করিতে হয়। গাঁদা বা দোপাটী পুষ্পের বীজ বপনের ন্যায় জিনিয়ার বীজ বপন করিতে হয়। বীজ বপন করিবার পর যদি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে, উপ্ত বীজের উপর জলসেচন করিতে হয়। এইরূপে জলসেচন করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। চারা সকল যখন দশবার ইঞ্চি বড় হয়, তখন উহা শিকড় সহিত তুলিয়া উদ্যানে রোপণ করিতে হয়। বর্ষার সময় ফুটন্ত গাছ তুলিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। গাছের পাইটের মধ্যে কেবলমাত্র মধ্যে২ গোড়া খুসিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে।

জিনিয়ার গাছ সাধারণতঃ গাঁদাফুলের গাছের ন্যায় বড় হইয়া থাকে। কিন্তু গাঁদা গাছ হইতে জিনিয়া গাছের গঠন ও পত্রাদির আকারগত অনেক প্রভেদ আছে। সাধারণতঃ এদেশে যে সকল জিনিয়া গাছ দেখা যায়, তন্মধ্যে হাইব্রিড্ (Hybride) এলবা (Alba) হেজিনা (Haageana) টেজিটিফ্লোরা (Tagetiflora) প্রভৃতিই প্রধান। হাইব্রিড্ জাতীয় জিনিয়ার এক একটী ফুলে নানাপ্রকার বর্ণের সমাবেশ থাকে, তাহাতে পুষ্পটী দেখিতে অত্যন্ত নয়নতৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয়। এলবা দেখিতে শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট এবং হেজিনা দেখিতে কমলালেবুর বর্ণের ন্যায় সুন্দর। টেজিটিফ্লোরা দেখিতে ঠিক বিলাতী গাঁদাফুলের ন্যায়।

জিনিয়ার গাছের একটী বিশেষ গুণ এই যে,উহা প্রায় সকল দেশেই জন্মিতে পারে। জিনিয়ার বীজ ভূমিতে পতিত হইলে, প্রায়ই নষ্ট হয় না। অন্যান্য আগাছার বীজের ন্যায় জিনিয়া বীজ মাটীতে পড়িয়া থাকিয়া এবং বর্ষার জল পাইয়াই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। মোট কথা ঋতুপুষ্পের মধ্যে জিনিয়া পুষ্প যেমন বিনা আয়াসে জন্মিতে পারে, অন্য কোনও পুষ্পই সেরূপ নহে। যাঁহাদের এই সুন্দর পুষ্প উপভোগ করিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহারা অনায়াসেই ইহার বৃক্ষ রোপণে ও পুষ্প উৎপাদনে সমর্থ হইতে পারেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জিনিয়া-বীজ বৎসরের মধ্যে দুইবার বপন করিতে হয়। কিন্তু এক গাছের বীজ দুই সময়েই রোপণ করিলে, ভাল ফুল জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে যে সকল ফুল ফুটিয়া থাকে, সেই সকল ফুলের বীজ সেই সেই ঋতুতেই বপন করা কর্ত্তব্য। নতুবা বর্ষার বীজ শীতকালে এবং শীতকালের বীজ বর্ষাকালে বপন করিলে, তাহাতে ভাল ফুল উৎপাদন করা যায় না।

বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত করিবার একটী সহজ উপায়।

বার্লিন হইতে ডাক্তার 'ওডো ডেম্‌মার' বিলাতের গার্ডনারস্ ক্রণিকেল্ নামক সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, তাহার বাগানে কোনও এক জাতীয় বৃক্ষে বেশ ফল ধরিয়াছিল; এই গাছের বীজ যে সময় রোপণ করা হইত, তাহার ২৪ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিত। কিন্তু ইহাতে একটী বিশেষত্ব এই যে, কেবল মাত্র একটী বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী স্থানেই এইরূপ অল্প সময়ের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইত কিন্তু একই বীজ অন্যত্র রোপণ করিলে, তত শীঘ্র অঙ্কুরিত হইত না। এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করিয়া, ডাক্তার সাহেব জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বিদেশ হইতে যখন ঐ বৃক্ষটী আমদানি করা হইয়াছিল, তখন ঐ বৃক্ষের সহিত একপ্রকার পিপীলিকা আসিয়াছিল; উক্ত পিপীলিকায় স্থানান্তর হইতে মাটী সংগ্রহ করিয়া, প্রাগুক্ত বৃক্ষের নিকটে জমা করিত। ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ঐ মাটীতে একপ্রকার এসিড্ ছিল এবং তাহারই গুণে উক্ত মাটী অদ্ভুত উর্ব্বরাশক্তিসম্পন্ন হইয়াছিল। এদেশে বেদেরা দশ মিনিটের

মধ্যে আম্রের আঁটী হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া থাকে ; উক্ত ডাক্তার সাহেব অনুমান করেন যে বেদেরা হয় ত এই প্রকার মাটী ব্যবহার করিয়া থাকে। তিনি কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছিলেন যে, তিনি (ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি) বেদেদিগকে ঐরূপ মাটী সংগ্রহ করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। বীজে একপ্রকার এসিড্ মাখাইয়া উহাকে অতি শীঘ্র অঙ্কুরিত করিতে পারা যায়, আমরা সময়ান্তরে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

পল্লিগ্রামে অনেক স্থানে উইএর ঢিপি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ঢিপির মাটীতেও একপ্রকার এসিড্ আছে, উহাতে শীঘ্র বীজ-উৎপাদিকা শক্তি আছে বলিয়া বোধ হয়। যে সকল বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয় না, সেই সকল বীজ উইএর মাটীতে রোপণ করিলে, অতি সহজেই অঙ্কুরিত হইতে পারে। আমরা এ বিষয়ে পরীক্ষা করিতেছি এবং অন্যান্য ভদ্রমহোদয়দিগকেও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। যদি বাস্তবিকই উইএর মাটী উপরোক্ত অদ্ভুত গুণ-সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে, অন্ততঃ পল্লিগ্রামে বীজ অঙ্কুরিত করিতে আর ভাবিতে হইবে না।

গিনিঘাস

বাগানে ময়দান প্রস্তুত করিবার পক্ষে "গিনিঘাস"ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নিম্ন-লিখিত নিয়মানুযায়ী ইহার বীজ বপন করিতে হয়। এই বীজ বপন করিতে হইলে, জমী যত আর্দ্র হইবে ততই ভাল। যদ্যপি জমী তদ্রূপ না হয়, তাহা হইলে বীজ বপন করিয়া সেই স্থানে অধিক পরিমাণে জল-সেচন করা একান্ত কর্ত্তব্য। যত অধিক জল দেওয়া হউক না কেন, তাহাতে বীজের ইষ্ট বই অনিষ্ট হইবেক না। এইরূপ নিয়মানুযায়ী বীজ বপন করিলে, নিশ্চয়ই অঙ্কুরিত হইবে। তৎপরে চারা ৬।৭ ইঞ্চি হইলে, যথাস্থানে লইয়া রোপণ করিলেই চলিবে।

অসেজ অরেঞ্জ্।

অর্থাৎ

চিরস্থায়ী শক্ত বাগানের ব্যাড়া স্বরূপ বৃক্ষের বীজ।

এই বৃক্ষ এরূপ সুন্দর ফল ও পুষ্পে সুশোভিত হয় যে, দেখিলেই বোধ হয়, যেন মঙ্গলময় জগদীশ্বর পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য্য এক স্থানে দেখাইবার নিমিত্ত এই বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। বাগানের শ্রী সম্পাদন করিতে অসেজ্ অরেঞ্জ্ যেরূপ এরূপ আর কোনটী নয়।

এই বীজের বপন-প্রণালী দোষে অনেক সময়ে বৃক্ষ জন্মায় না, সুতরাং তাহাতে অনেকের অর্থহানি ঘটিয়া থাকে। সাধারণ গ্রাহকবর্গকে উক্ত মহোপকারী বৃক্ষের যথার্থ বপনপ্রণালী জানাইবার নিমিত্ত সংক্ষেপে এইখানে কিঞ্চিৎ বিবৃত করা গেল।

বপন-প্রণালী—এই বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে একটী টবে ঈষৎ উষ্ণ জলে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। এই জল অধিক উষ্ণ হইলে বীজ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তৎপরে যে পরিমাণ বীজ হইবে, তাহার পাঁচ গুণ পরিমাণ ভিজা (কাদা নহে) মাটির সহিত উহা মিশাইতে হইবে। এইরূপ বীজ মিশ্রিত উক্ত মৃত্তিকা একটি পাত্রে রাখিয়া সেই পাত্র এরূপ স্থানে রাখিতে হইবে, যে তথায় যেন সুন্দর-রূপ বাতাস পায়। উক্ত মাটির অবস্থা বুঝিয়া সময়ে ২ উহাতে উপযুক্ত পরিমাণ জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিতে হইবে; জল এত অধিক না হয়, যাহাতে বীজ পচিয়া যাইতে পারে। এইরূপ করিতে করিতে যখন বীজের উপরকার ত্বক্ ফাটিয়া যাইবে, তখন উক্ত মাটি সহিত বীজ নির্দ্ধারিত স্থানে বপন করিতে হইবে। 'এই বীজ হইতে অঙ্কুর বহির্গত হইতে সময়ে সময়ে ২।৩ সপ্তাহ এবং কখন বা ৮।৯ সপ্তাহ লাগে। এবং বপন-প্রণালী নিয়মিত না হওয়াতে, কখন কখন বীজ নষ্টও হইয়া যায়।' উপরোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিলে বীজ নিশ্চয়ই অঙ্কুরিত হইবে।

তিল।—(SESAMUM INDICUM)

তিল "পঞ্চশস্য" মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। তিল হইতে অতি উৎকৃষ্ট তৈল জন্মিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ মতে তিলোদ্ভব তৈলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বহু-

গুণ-বিশিষ্ট। দেশভেদে তিলের অনেক প্রকার নাম দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল।

বাঙ্গালা……………………তিল্।
হিন্দী ……………………তিল্, তির, জিঙ্গুঁলি।
উড়িয়া ……………………রশি, খাশা, তিলি।
নেপাল……………………তিল।
সাঁওতাল ……………………তিলমিন্।
পঞ্জাব ……………………তিল, তিলি, কুঞ্জড়।
আফ্গানিস্থান ……………………তিল্, কুঞ্জি।
বোম্বাই……………………তিল, তল, বারিফ তিল।
গুজরাট……………………তিল।
তামিল ……………………যেল্লুচ্ছেড়ি, মুব্বুল, এল্লু।
ব্রহ্ম ……………………হ্নান।
সিংহল ……………………তল্ল, তল্লসও।
আরব ……………………অল্জুল জুলান, সিম্সিম্।
পারস্য ……………………রোঘেন শিরিন্।
ফ্রান্স্ ……………………জুজিওলিন্।
স্পেন্ ……………………অল্জোঞ্জলি।
ইটালী ……………………জেরজলিন্।

তিল গ্রীষ্মমণ্ডলের শস্য। ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে তিল প্রচলিত, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে তিলের আদিজন্মস্থান আফ্রিকা ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বিপপুঞ্জে; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। ভারতবর্ষই যে তিলের আদিস্থান, তাহা প্রাচীন গ্রন্থ বেদ হইতেই সঠীক প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন হিন্দুদিগের শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়ায়, বহু পূর্ব্বকাল হইতে তিল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আইন-ই আকাবরীতেও তিলের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে লাহোর, দিল্লী, আগরা, এলাহাবাদ প্রভৃতি সুবায় ইহার চাষ হইত। গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধানে প্রকাশিত হইয়াছে যে, পরেশনাথ পাহাড়ের ১৫০০ ফিট হইতে ৩৫০০ ফিট উর্দ্ধে এই জাতীয় শস্যের গাছ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু

তাহাদের আকৃতিগত অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয় বন্য তিলের ফুল কাল ও চাষের তিলের ফুল শাদা হইয়া থাকে।

তিল সাধারণতঃ ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত ও ধূসর। ভারতে

চাষ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই ইহার চাষ হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ প্রদেশে ইহা শীতকালের শস্য, এবং শীত প্রদেশে ইহা গ্রীষ্মকালের শস্য। পঞ্জাব প্রদেশে ইহার চাষ বর্ষাকালে হইয়া থাকে। মধ্যভারত ও উত্তর ভারতের বালুকাময় ভূমিতে যেমন ইহার বৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়, অন্যান্য স্থানে সেরূপ হয় না।

বাঙ্গালা দেশে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় যেরূপ ভাবে তিলের চাষ হইয়া থাকে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

ঢাকা—ধান্যের সহিত একত্রই ইহার চাষ করিয়া থাকে। ক্ষেত্র পরিষ্কার করিবার সময় পূর্ব্ববৎসরের ধানের গোড়াগুলি তুলিয়া রাশিকৃত করিয়া পুড়াইয়া ফেলে, পরে ঐ জমীতে উত্তমরূপ লাঙ্গল দিয়া থাকে। জমী শুষ্ক হইলে লাঙ্গল দিয়াই সঙ্গে সঙ্গে মই দিয়া থাকে। জমী সরস থাকিলে আবশ্যক করে না। প্রথম চাষের পর পণের দিন মধ্যে আর এক বার আড় ভাবে লাঙ্গল দিয়া থাকে। মাঘ মাসের মধ্যেই পাট করিয়া থাকে। তার পর আরও তিন চার বার লাঙ্গল দিয়া প্রতি বিঘায় /১॥০ সের তিল ও ।০ দশ সের আমন ধান্য একত্র মিশাইয়া ছড়াইয়া যায়। ফাল্গুন মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত চারা বপন করিবার প্রশস্ত সময়। চারা ৫।৬ ইঞ্চি হইলে কোদালি দিয়া একবার কোদ্‌লাইতে হয়। যদ্যপি বড় ঘন হয় তো কতকগুলা উঠাইয়া ফেলে। কোদ্‌লাইবার ৮।১০ দিন পরে নিড়ান আবশ্যক। তৎপরে আবার ১ পক্ষ পরে নিড়াইলে, ক্ষেত্রের কাজ শেষ হইয়া গেল। পরে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষী তিল পাকিলে কাটিয়া লয় ও এক স্থানে গাদা করিয়া রাখিয়া থাকে; তাহার পর আছড়াইয়া শস্য ঝাড়িয়া লয়। এখানে প্রতি বিঘায় অন্যূন ২।৩ মণ তিল জন্মিয়া থাকে।

ক্রমশঃ—

তূদ্ বা তুঁত।
MORUS.

পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্ শাস্ত্রানুসারে তুঁত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১। Morus Alba বা শ্বেত তুঁত, ২। Morus Atropurpuria বা চীনে তুঁত, ৩। Morus Indica বা দেশী তুঁত।

Morus Alba বা শ্বেত তুঁত—পঞ্জাব প্রদেশে, উত্তর পশ্চিম হিমালয়ে ও তিব্বত প্রদেশেই বেশী জন্মে। শীতকালে ইহার পাতা ঝরিয়া যায়। ইহার ফুলে গর্ভ ও পরাগকেশর উভয়ই আছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহার বৃদ্ধি অতি শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে; বাঙ্গালে দেশে তুঁতফল অনেকে খাইয়া থাকেন; তুতফল খাইতেও মন্দ নহে, ঈষৎ অম্ল ও মিষ্টরস থাকায় সময়ে২ তুঁতফল অতি চমৎকার লাগে। আমাদের দেশে ইহার ফল, পাতা ও কাষ্ঠের জন্যই চাষ হইয়া থাকে। বেলুচিস্থানে তুঁত ৪ প্রকার আছে। "সিয়া" (ধূসর বর্ণ), "বেদানা" (বীজহীন) "পেড়োয়ালি" (কলমের চারা), "শাহ্‌তুঁত" (বড়ফল) ইহার মধ্যে "পেড়োয়ালি" ও "শাহ্‌তুত"ই উৎকৃষ্ট। কাশ্মীরে এক প্রকার তুঁত জন্মিয়া থাকে, তাহাকে "খরতুঁত" বলে; কাশ্মীরবাসিরা ইহার মোরব্বা প্রস্তুতকরিয়া রাখিয়া দেয় এবং ঐ সকল মোরোব্বা বর্ষাকালে ব্যবহার করিয়া থাকে। বেলুচিস্থানে ও আফগানিস্থানে তুঁতফল গুঁড়া করিয়া, ইহার রুটি ব্যবহার করিয়া থাকে।

Morus Atropurpuria বা চীনে তুঁত—চীনদেশেই বেশী জন্মে, তবে আজকাল চীনদেশ হইতে আনীত হইয়া এদেশে চাষ করা হইতেছে; পঞ্জাবে, শাহারণপুরে ইহার চাষ কিছু বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। তুঁতের পাতায় গুটি প্রতিপালিত হইয়া থাকে। চীনে তুঁত অতিশয় লম্বা ও পিপুলের ন্যায় গোলাকার ও গাঢ় বেগুনিরংযুক্ত হয়; এই জাতীয় তুঁত আমাদের ইম্পিরিয়াল নর্শরীতে পাওয়া যায়। ইহা খাইতেও অতি সুস্বাদু।

Morus Indica বা দেশী তুঁত—হিমালয়, কাশ্মীর, আসাম, বাঙ্গালায় ও ব্রহ্মদেশেই বেশী জন্মিয়া থাকে। তুঁত গাছের পাতা শীতকালে ঝরিয়া যায় ও বসন্তে ইহার নূতন পাতা মুঞ্জরিত হয়। গ্রীষ্মকালে ইহার ফুল ধরে ও বর্ষাকালে ফল পাকিয়া থাকে। কিন্তু পার্ব্বত্যপ্রদেশে ফল পাকিতে কিছু বিলম্ব হয়।

চিরস্থায়ী ফুল।*

*Everlesting flower.

পুষ্প স্বভাবতঃ গন্ধের জন্যই মনুষ্যের নিকট বিশেষ আদৃত হয় বটে, কিন্তু এমন অনেক পুষ্প আছে, যাহার সুন্দররূপদর্শনে চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া, এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তোলে। তখন বোধ হয়, যেন সর্ব্বমঙ্গলময় বিশ্বপতির সৃজনের মধ্যে এইটীই সুন্দর; আবার অন্যটিতে নয়ন ফিরাও, দেখিবে উহা আরও অধিকতর সুন্দর। পাঠক! তাই বলিতেছি যে, আমাদের Everlasting flower অর্থাৎ (চিরস্থায়ী ফুলও) দেখিতে পরম প্রীতি-কর। ইহার উজ্জ্বল মনোমুগ্ধকারী বর্ণ ও সুন্দর আকৃতি দেখিলে, কাহার হৃদয় না আনন্দে প্লাবিত হয়? দেখিলে বোধ হয়, যেন জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্য একস্থানে দেখাইবার নিমিত্ত এই পুষ্পের সৃজন হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে এই পুষ্পের সঠিক চিত্র চিত্রিত করিতে পারিলাম না; তবে শিরোভাগস্থ চিত্র দর্শনে ইহার সৌন্দর্য্যের কতক আভাষ মাত্র অনুমিত হইবে।

ইহা এক প্রকার ঋতু পুষ্প মধ্যে পরিগণিত। বীজ হইতেই ইহার গাছ উৎপন্ন হয়। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতেই ইহার বীজ আসিয়া থাকে। ঋতু পুষ্প অধিকাংশই প্রায় গন্ধবিহীন, সুতরাং ইহারও গন্ধ নাই। এক একটী গাছে বিস্তর ফুল ফুটিয়া থাকে। চন্দ্রমল্লিকার সহিত এই ফুলের অনেকটা সাদৃশ দেখিতে পাওয়া যায়। Everlesting flower অর্থাৎ চিরস্থায়ী ফুলের বর্ণ অনেক প্রকার আছে; তন্মধ্যে জরদ বর্ণই বেশী। ইহার আশ্চর্য্য গুণ এই

* আমাদের ইম্পিরিয়াল নর্সরীতে ইহার বীজ পাওয়া যায়।

যে, গাছ শুকাইয়া যাইলেও, ফুল শুকিয়া ঝরিয়া যায় না ; কিম্বা বর্ণের ও কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না,—যেমন বর্ণ তেমনই থাকে। ফুল শুকাইয়া গেলেও উহার বর্ণ দেখিলে শুক্‌না বলিয়া কোন ক্রমে প্রতীত হয় না।

ইহা শীতপ্রধান দেশের পুষ্প সুতরাং আমাদের দেশে শীতকালেই রোপণ করা আবশ্যক। ইংরাজি সেপ্টেম্বর কিম্বা অক্টোবর মাসের মধ্যে ইহার বীজ রোপণ করা কর্ত্তব্য। কারণ মার্চ কিম্বা এপ্রেল মাসে রৌদ্র প্রবল হইলে, ইহা শুখাইয়া যায়। এরূপ পুষ্প সকলেরই দর্শন করা উচিত। ইহা শুকাইয়া গেলেও, সজীবের ন্যায় থাকে বলিয়াই ইহার নাম চিরস্থায়ী ফুল অর্থাৎ Everlasting flower হইয়াছে। ইহার বপন ও রোপণ প্রণালী বারান্তরে প্রকাশ্য।

অহিফেন।

ভারতবর্ষেই অহিফেন প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। পোস্ত নামক এক প্রকার গাছের ফলের আটা হইতে আফিম প্রস্তুত হয়, "তুরস্কের" সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

আফিম সচরাচর দুই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার পোস্ত গাছ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার বৈজ্ঞানিক নাম (Papaver Somniferum) ইহার ফুল লালবর্ণ ও বীজ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। অন্য এক প্রকার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম (Papaver Officinale) ইহার ফুল ও বীজ শ্বেতবর্ণ। ভারতবর্ষে শেষোক্ত প্রকার বৃক্ষের চাষই অধিক। ভারতবর্ষে অফিমের ব্যবসা অন্য কেহ করিতে পারে না, ইহা গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া ব্যবসা ইহাতে গভর্ণমেণ্টের বিস্তর লাভ হইয়া থাকে। পাটনা এবং পবিত্র কাশীধামে ইহার বিস্তর চাষ হয়। গাজিপুরেও আফিমের চাষ হইয়া থাকে। এ সকল স্থান ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও ইহার বহুল পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের আফিম, চীন ও ব্রহ্ম দেশেই বেশী পরিমাণে রপ্তানি হয়। আফিম হইতে গভর্ণমেণ্টের প্রতি বৎসর প্রায় ৪,৩৪,২৪,৫০০ টাকার অধিক লাভ হইয়া থাকে।

মলকাতে ও ব্রহ্মদেশে কাঁচা আফিম ও পাক করিয়া চণ্ডু প্রস্তুত করিয়া ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালীরা একটু বয়স হইলেই প্রায় আফিম ব্যবহার করিয়া থাকে।

যাঁহারা অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে মদ্য ত্যাগ করিবার নিমিত্ত আফিম ব্যবহার করেন। আফিমখোরেরা প্রায় অনেকেই দীর্ঘজীবন লাভ করে দেখিতে পাওয়া যায়। অফিমের মৌতাত বড় ভয়ানক জিনীষ। আফিম খাইবার সময় উত্তীর্ণ হইলে, হাই উঠিতে থাকে, শরীর অবসন্ন বোধ হয়, চক্ষুতে ধোঁয়া দেখিতে হয়; যতক্ষণ না আফিম খাওয়া যায়, ততক্ষণ কিছু ভাল লাগে না। বৃদ্ধেরা এই জন্য আফিম গুলি করিয়া পাকাইয়া একটি কৌটার ভিতর পুরিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দেয়, যেন কোনক্রমে ভুল না হয়। কোন স্থানে যাইতে হইলে, কৌটাটি সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

আফিমের মৌতাত এমনি জিনীষ যে কোনও এই সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভদ্রলোক আফিমের মৌতাত কিরূপ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একটী গর্দ্দভশিশুকে প্রত্যহ আফিম খাইতে অভ্যাস করাইয়াছিলেন; গর্দ্দভটী ক্রমে বড় হইলে সে আপনি মাঠে চরিয়া আসিত ও বৈকালে আফিম খাইবার সময় উপস্থিত হইলে, খিড়কীর পুষ্করিণীর নিকট আসিয়া চিৎকার করিত,বাবুও প্রত্যহ সেই সময় গিয়া গর্দ্দভটীকে খাওয়াইয়া আসিতেন। বাবু কোথাও যাইতে হইলে বাড়ির কোনও ব্যক্তিকে এ কার্য্যের ভার দিয়া যাইতেন। একদা তিনি কোনও কার্য্যোপলক্ষে দুই তিন দিনের জন্য কোথাও গমন করিলেন, যাইবার সময় কাহাকেও এই গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া যাইতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। অনন্তর গর্দ্দভটী সেই দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া চিৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু আফিম না পাওয়ায় ক্রমে অবসন্ন হইয়া অবশেষে সেই স্থানে শুইয়া পড়িল। দুই তিন দিন পরে বাবু গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া গর্দ্দভটীর কথা স্মরণ হওয়ায়, পুষ্করিণীর নিকট দেখিলেন যে, গর্দ্দভটী মৃতবৎ শুইয়া পড়িয়া রহিয়াছে তাহাতে তিনি অতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আফিম আনাইয়া গর্দ্দভটীকে খাওয়াইয়া দিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে গর্দ্দভটী আফিমের মৌতাতে সতেজ হইয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া আনন্দে চিৎকার করিতে করিতে মাঠাভিমুখে গমন করিল।

ক্রমশঃ—

কৃষিতত্ত্ব।

কৃষিবিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড। } ফাল্গুন ১৩০৬ সাল। { ২য় সংখ্যা।

সম্পাদকীয় উক্তি।

আদর্শ রাজা ও গোলাপফুল। প্রজাকে কৃষি বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের রাজাও আমাদিগকে এবিষয়ে উৎসাহ দিয়া থাকেন; কিন্তু রাজপ্রদত্ত সাহায্য দেশের অসংখ্য প্রজার পক্ষে যথেষ্ট নহে। দেশের ধনকুবের ও রাজা জমিদারদিগের দৃষ্টি ঐ দিকে পতিত হইলে তবে প্রজার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশের সাহেবদিগের ফুলের সখ্ আছে; কিন্তু দেশের বড় বড় ধনী ব্যক্তিদিগের এ বিষয়ে তাদৃশ সখ্ নাই। এটি দেশের দুর্ভাগ্য। যদি দেশের ধনী ব্যক্তিরা প্রজাকে উৎসাহ দেন তাহা হইলে আমাদের দেশেও অন্যান্য দেশের ন্যায় উপযুক্ত মালীর সৃষ্টি হইতে পারে। তুরষ্ক দেশে প্রচুর পরিমাণ গোলাপের আবাদ হইয়া থাকে, এই প্রদেশের প্রস্তুত আতর অটো-ডি-রোজ নামে খ্যাত। সম্প্রতি তুরষ্কের স্থলতান তাহাদের মধ্যে গোলাপের সখ্ বৃদ্ধি করিবার জন্য এক লক্ষ গোলাপের কলম বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াছেন এবং প্রজাদের মধ্যে কাহারও মূলধনের অভাব থাকিলে তাহাদিগকে উপযুক্ত দাদন দিতে প্রস্তুত আছেন। আতর বা অটো প্রস্তুতোপযোগী যন্ত্রাদিও তিনি নিজ প্রজার মধ্যে বিতরণ করিবেন। আমাদের দেশের দেশীয় রাজা জমিদার প্রভৃতি ধনকুবেরদিগের সুলতানের অনুকরণে প্রবৃত্তি জন্মে ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা ও প্রার্থনা।

কলার গুঁড়ায় খাদ্যোপকরণ। আমরা কাঁচা কলা বা কাঁচকলা রাঁধিয়া খাইয়া এবং পাকা কলা বিনা রন্ধনেই ভক্ষণ করিয়া থাকি। কিন্তু

কলা হইতে গুঁড়া প্রস্তুত করিতে পারিলে উহা হইতে বেশ পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারা যায়। মালয় উপদ্বীপে নানা প্রকার সুখাদ্য কলার আবাদ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে "কুনেন" (Koonen) নামক কলা অত্যন্ত সুস্বাদু। মালয় দেশবাসীরা এই কলার খোসা ছাড়াইয়া ছুরিদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইয়া হামামদিস্তায় কুটিয়া এবং সরু চালুনি বা নেকড়া দ্বারা ছাঁকিয়া বেশ মিহিগুঁড়া প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই "কুনেন" কলার গুঁড়া সে দেশের অনেক বড়লোকদিগের শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব দূর করিয়া থাকে। আমাদের দেশে প্রচলিত নানাবিধ সুমিষ্ট ফল হইতে প্রাগুক্তরূপে গুঁড়া প্রস্তুত করা যাইতে পারে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক, আমরা উপরোক্ত "কুনেন" কলার গাছ আনয়নের চেষ্টায় আছি।

পলাশের লাহা। পলাশ বৃক্ষের বৈজ্ঞানিক নাম (Batia Frondosa) এই বৃক্ষ ব্রহ্মদেশে, আমাদের এদেশে ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই বৃক্ষকে বিশেষ উপকারী ও লাভজনক বৃক্ষে পরিণত করিতে পারা যায়; এই বৃক্ষ হইতে লা বা লাহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিরূপে এই বৃক্ষ হইতে লাহা প্রস্তুত হইতে পারে তাহা সময়ান্তরে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বীজ রক্ষার উপায়। অনেকে অর্থ দিয়া বীজ ক্রয় করিয়া তাহা উপযুক্তরূপে রক্ষা করিতে জানেন না, সুতরাং তাঁহাদের উক্ত বীজ আদৌ অঙ্কুরিত হয় না; কিন্তু দোষের ভাগী হন বীজ সরবরাহ কর্ত্তা নর্শরির অধ্যক্ষেরা। আমরা বীজ রক্ষার সহজ উপায় আমাদের গ্রাহকগণকে জানাইতেছি। বর্ষার সময় ও মেঘের সময় কখনই বীজের পার্শেল খুলিবেন না। যখন বাতাস বেশ শুষ্ক থাকিবে কেবলমাত্র সেই সময়েই পার্শেল হইতে বীজ বাহির করিবেন; যে সকল বীজ তৎক্ষণাৎ রোপণ করিবার আবশ্যক নাই তাহা একবার রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পরে ঠাণ্ডা হইলে আঁটাল কর্কযুক্ত (কাচের ছিপি হইলেই ভাল হয়) শিশিতে আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত। শিশিতে বীজ রাখিবার পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া শিশিটী শুষ্ক করিয়া লওয়া উচিত। বীজে ঠাণ্ডা লাগিলে বীজের উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইতে কিম্বা একেবারে লোপ হইতে পারে। ইহা বীজক্রেতা গ্রাহক মহোদয়দিগের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

সিরপিজিয়া।

(STEPHENOITES FLORIBONDA)

"সিরপিজিয়া" লতার গাছ দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। এদেশস্থ অধিকাংশ ইংরাজ এবং ইংরাজের দেখাদেখি অনেক বাঙ্গালীও নিজ নিজ উদ্যানবাটীকাতে এই মনোহর লতার গাছ রোপণ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন। "সিরপিজিয়া" লতাশ্রেণীর মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার পুষ্পের গন্ধ অতি মনোহর এবং সেই জন্যই পুষ্পপ্রিয় সৌখীন ব্যক্তি মাত্রেই এই লতা অতি যত্ন ও আদরের সহিত রোপণ করিয়া থাকেন।

"সিরপিজিয়ার" গাছ ক্ষেত্রে না রোপণ করিয়া সতন্ত্রভাবে টবে রোপণ করাই কর্ত্তব্য। খুব বড় টবে গাছি না রোপণ করিয়া মাঝারী টবেই রোপণ করাই উচিত। লতাটী রোপণ করিবার পর টবটী একটী বাঁশের কিম্বা লোহের ঘেরা বা জাফ্‌রীদ্বারা আবৃত করিয়া রাখা আবশ্যক। তবে লোহের জাফ্‌রী অপেক্ষা বাঁশের জাফ্‌রী ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ, কারণ লোহের জাফ্‌রী রৌদ্রতাপে শীঘ্র উত্তপ্ত হইয়া টবের গাছের অনিষ্ট করিতে পারে।

উপরোক্ত লতার ডাল কাটিয়া বসাইলে তাহা হইতে স্বতন্ত্র গাছ জন্মায় না। কলম করিয়া গাছ জন্মাইতে হয়। নিম্নলিখিত প্রকারে সিরপিজিয়ার কলম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

একটী নোয়াচে বা নূতন ডাল হইতে কলম প্রস্তুত কারতে হয়। পুরাতন ডালে কলম প্রস্তুত হয় না, কারণ পুরাতন ডালের ভিতরের অংশ একবারে শক্ত কাষ্ঠে পরিণত হওয়ায় উহা হইতে শিকড় বাহির হয় না। সুতরাং নূতন নরম ডাল ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। একটী এক বা দেড় হাত দীর্ঘ ডালের মধ্যে যে গাঁইট থাকে তাহাতে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করিতে হইবে। একটী বেশ তীক্ষ্ণ ছুরির অগ্রভাগ ঐ গাঁইটের মধ্যস্থলে প্রবেশ করাইয়া দাও। পূর্ব্ব হইতে একটী কাষ্ঠের পিন প্রস্তুত করিয়া রাখ। ছুরির দ্বারা গাঁইটের মধ্যভাগে যে ছিদ্র করিয়াছ ঐ ছিদ্রের মধ্যে কাষ্ঠের প্রস্তুত পিন্‌টী প্রবেশ করাইয়া দাও। পরে ঐ গাঁইটটী তিন চারি অঙ্গুলি মাটির নিম্নে পুঁতিয়া রাখ। অতি সাবধানতার সহিত পুঁতিবে, দেখিও যেন ডালটী ভাঙ্গিয়া না যায়।

ডালটী উপরোক্ত ভাবে প্রোথিত করিয়া উহার উপর প্রত্যহ জল সিঞ্চন করিতে হইবে; বর্ষাকালই এই কলম প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত সময়।

"সিরপিজিয়া" গাছে এক প্রকার জরদ বর্ণের পোকা লাগিয়া গাছের বিশেষ অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। এদেশে অবস্থিত কোনও ইংরাজের কতিপয় "সিরপিজিয়া গাছ" প্রাগুক্ত পোকা লাগিয়া গাছগুলি একেবারে নষ্ট করিতে থাকে। সাহেব অনেকপ্রকার চেষ্টা করিয়াও ঐ পোকা বিনাশ করিতে না পারিয়া অবশেষে বিরক্ত হইয়া লক্ষ্ণৌ সহরের গবর্মেণ্ট ডাক্তার রিড্‌লি সাহেবকে এ বিষয় অবগত করাণ। রিড্‌লি সাহেব নিম্নলিখিত প্রকারে গাছের পোকা নষ্ট করিতে পরামর্শ দেন।

একটী বড় কোয়ার্ট বোতলের চারিভাগের তিনভাগ অর্থাৎ বোতলের বার আনা অংশ দুগ্ধে পরিপূর্ণ করিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া রাখ। এরূপ সময় পর্য্যন্ত রাখিবে যেন দুগ্ধটী ঘোল অর্থাৎ টক হইয়া যায়। পরে বোতলের অবশিষ্টাংশ কেরোসিন তৈল দ্বারা পূর্ণ করিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া বোতলটী নাড়িতে থাক। দুগ্ধ হইতে মাখন প্রস্তুত করিতে হইলে যেরূপভাবে জোরের সহিত নাড়িতে হয় সেইরূপ ভাবে নাড়িতে হইবে। ঐরূপ ভাবে নাড়িতে নাড়িতে বোতলস্থিত তরল পদার্থ গাঢ় হইয়া উঠিবে। ঐ গাঢ় পদার্থের ছোট এক গ্লাস (মদের গ্লাস) এক গ্যালন জলের সহিত মিলিত করিয়া একটী ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত চোঙ্গাতে করিয়া গাছের পাত্রে সিঞ্চন করিলে প্রাগুক্ত পোকা সকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে। উপরোক্ত উপায়ে প্রস্তুত ঔষধের দ্বারা উই, লালপিপীলিকা, সুরসুরে পোকা এবং কাষ্ঠের পোকা ইত্যাদি সকল প্রকার পোকাই নষ্ট হয়; তাহা ডাক্তার সাহেব বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। উপরোক্ত ঔষধ পরগাছার পক্ষে বড়ই অনিষ্টজনক, কিন্তু যে জমিতে পোকা জন্মে সেই জমিতে এই বিষের জল দুই তিন মাস ছড়াইলে যে কোনও পোকা হউক না কেন বিনষ্ট হইয়া যায়।

এই প্রবন্ধোক্ত "সিরপিজিয়ার" সুন্দর গাছ আমাদের নর্শরিতে পাওয়া যায়।

প্রাণতোষিণী বা হার্টস্‌-ইজপুষ্প।
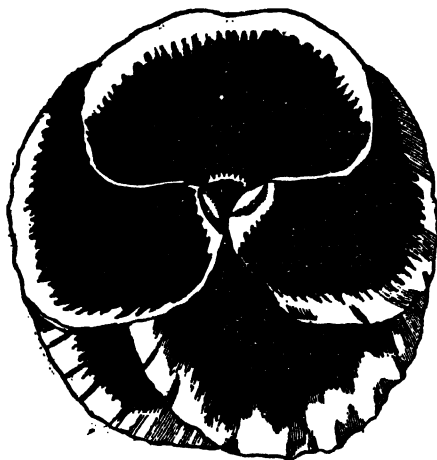
HEARTSEASE.

প্রবন্ধের শিরোভাগে যে নয়নমনোহর সুন্দর পুষ্পের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল উহাই "প্রাণতোষিণী" বা "হার্টস্‌-ইজপুষ্প"। উহা দেখিলে মনে স্বতঃই আনন্দের উদয় হয় বলিয়া উহার নাম হইয়াছে হার্টস্‌-ইজ। উপরোক্ত নাম ব্যতীত ইহার আরও কয়েকটী নাম আছে যথা "প্যানসি," "ভায়োলাট্রাইকলার" বা "ত্রিবর্ণা"। হার্টস্‌-ইজ ঋতুপুষ্পের অন্তর্গত একজাতীয় পুষ্প। ইহা শীতকালে প্রস্ফুটিত হয়। পুরাকালে আমাদের দেশে এই পুষ্প দেখিতে পাওয়া যাইত না। এ দেশে ইংরাজেরাই এই সুন্দর পুষ্প আনয়ন করেন। ইহা শীত প্রধান দেশের পুষ্প বলিয়া এদেশেও শীতঋতু ব্যতীত অন্য সময়ে প্রস্ফুটিত হয় না। যখন উদ্যানস্থ বৃক্ষ শ্রেণীর উপর প্রচুর পরিমাণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তখন উদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিলে মনপ্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। প্রাণতোষিণীর সহজসৌন্দর্য্য মানবশিল্পের অসাধ্য। পৃথিবীতে এমন কোনও শিল্পকর নাই যিনি সহস্র চেষ্টা করিয়াও একটী কৃত্রিম "প্রাণতোষিণী" পুষ্প প্রস্তুত করিতে সমর্থ। যে মহাশিল্পী এই সুন্দর বাহ্য জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র সেই মহা-পুরুষ ব্যতীত কেহই এই পুষ্পের অনুরূপ সুন্দর সামগ্রীর সৃষ্টি করিতে সমর্থ

নহে। "প্রাণতোষিণীর" অসামান্য সৌন্দর্য্য কি প্রকার তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না।

আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে কেবলমাত্র চিত্র দিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম ইহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারিলাম না। আশা করি আমাদের সহৃদয় পাঠকপাঠিকারা স্বয়ং এই পুষ্প প্রস্ফুটিত করিয়া ইহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন না।

"হার্টস্-ইজ" পুষ্প দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর হইলেও ইহার কোনও গন্ধ নাই। কোনওরূপ গন্ধ না থাকিলেও উহা কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের জন্যই সকলের নিকট সমভাবে আদৃত। "হার্টস্-ইজ" পুষ্প নানা প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়; ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পুষ্পের সৌন্দর্য্য ও বর্ণ বিভিন্ন প্রকার।

"হার্টস্-ইজ" পুষ্পের বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তনের হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত উক্ত বীজ বিশেষ সাবধানতার সহিত রোপণ করা কর্ত্তব্য। ইউরোপ ও আমেরিকা প্রদেশে ইহা যে সময়ে রোপণ করা হয় আমাদের দেশে ঠিক সেই সময়ে রোপণ করিলে চলে না। এদেশে আশ্বিন মাসের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাসের শেষ পর্য্যন্তই এই বীজ রোপণের উপযুক্ত সময়। বর্ষা থাকিতে এই বীজ রোপণ করা কোনওক্রমেই উচিত নহে। বর্ষার শেষ হইয়া শীতের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইলেই এই বীজ রোপণ করা কর্ত্তব্য। জলীয় বায়ু ও জলসিক্ত স্থান বীজের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর, এইজন্য যাহাতে বীজে ঠাণ্ডা না লাগে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। বীজগুলিকে শিশি কিম্বা বোতলের মধ্যে ছিপি আঁটিয়া (কাঁচের ছিপি হইলে ভাল হয়।) রাখা কর্ত্তব্য।

এই বীজ বপন করিতে হইলে অগ্রে উত্তমরূপে মাটি প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। আমরা দেখিয়াছি মাটির দোষে অনেক সময় বীজ অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। হার্টস্-ইজের বীজ নিম্নলিখিত প্রকারে মাটি প্রস্তুত করিয়া রোপণ করিলে বেশ সুফল পাওয়া যায়। অগ্রে মৃত্তিকা তুলিয়া আনিয়া কোনও শুষ্কস্থানে ছড়াইয়া দিতে হইবে। এই প্রকারে মাটি ছড়াইয়া রাখিলে উহা দুইচারিদিনের মধ্যে শুষ্ক হইয়া উঠিবে। রৌদ্রে শুষ্ক করিলে মাটি একবারে নীরস ও শক্ত হইয়া যায়, সেইজন্য মাটি রৌদ্রে শুষ্ক করা উচিত নয়। মাটি উপরোক্ত প্রকারে শুষ্ক হইলে উহাতে অল্প

পরিমাণ জল দিয়া মুড়কি মাথার ন্যায় উহাকে সরস করিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ এরূপ ভাবে জল দেওয়া উচিত যে মাটি অতিরিক্ত জলের দ্বারা একবারে কাদা হইয়া না যায় কিম্বা পক্ষান্তরে অল্প জলের জন্য একবারে শুষ্ক না থাকে। এইরূপে প্রস্তুত মাটির দ্বারা একটী টবের তিন ভাগ পূর্ণ করিতে হইবে, অনন্তর অবশিষ্ট শুষ্ক মাটিকে গুঁড়া করিয়া চালিয়া লইয়া যে চূর্ণ মাটি হইবে উহার দ্বারাই টবের অবশিষ্ট সিকি ভাগ পূর্ণ করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে টবটী পূর্ণ করিলে টবের নিচের সরস মাটির জলীয় ভাগের দ্বারা টবের উপরকার ধূলার ন্যায় শুষ্ক মাটিতে কিছু জল সঞ্চার হইয়া উহাকে সরস করিয়া তুলিবে। এইরূপ সরসীকৃত মৃত্তিকা বীজ অঙ্কুরিত করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক।

উপরোক্ত প্রকারে মাটি প্রস্তুত করিবার তাৎপর্য্য এই যে উক্তপ্রকারে প্রস্তুত হইলে মাটির ঝাঁজ বা তেজ কিছু পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু যদি কেবল মাত্র শুষ্ক মাটির দ্বারা টব ভর্ত্তি করিয়া উহাতে বীজ বপন করা যায় তাহা হইলে মাটির তেজে অনেক সময় বীজ নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং উহা হইতে কিছুতেই চারা নির্গত হয় না।

উপরোক্ত প্রকারে মাটি দ্বারা টব ভর্ত্তি করিয়া উহার উপর আস্তে আস্তে "হার্টস্-ইজের" বীজগুলি ছড়াইয়া দিতে হইবে। খুব সাবধানতার সহিত বীজ ছড়ান উচিত। বীজ এরূপ ভাবে ছড়াইতে হইবে যেন উহা একত্রে জমা না হইয়া যায়। তাহার পর বীজের উপর আবার কিছু শুষ্ক গুঁড়া মাটি দিয়া চাপিয়া দিতে হইবে। এইরূপ প্রকারে বীজ বপন শেষ হইলে টবটী বারান্দায় বা অন্য কোনও খোলা যায়গায় রাখিতে হইবে। দিবসে খোলা যায়গায় (যেন রৌদ্র না লাগে) ও রাত্রিকালে শিশিরে ঐ টব রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। রাত্রীকালে শিশিরে টব রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে, যদি রাত্রে বৃষ্টি হয় তাহা হইলে টবে বৃষ্টিপাত হওয়ায় টবস্থিত বীজগুলি একত্রে জমা হইয়া যাইতে পারে কিংবা বৃষ্টির জলের ভারে উহা টবের নিম্নদেশে চলিয়া যাইতে পারে। এজন্য যাহাতে টবে বৃষ্টির জল না লাগে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। টবের মাটির অবস্থা বুঝিয়া উহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। জল দিবার সময়ও খুব সাবধান হইয়া জল দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ বেশী জল

পড়িলে, অতিরিক্ত বৃষ্টির জলের ন্যায়, টবের বীজগুলি একত্রে জমা হইয়া যাইতে পারে কিংবা জলের ভারে টবের নিম্ন দেশে চলিয়া যাইতে পারে। হার্টস্-ইজের বীজ উক্ত প্রকারে বপন করিলে তিন চারি দিন মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। টবে চারা বাহির হইবার পর যদি চারার গোড়ায় শিকড় বাহির হইয়া পড়ে তাহা হইলে উহাতে পুনরায় কিছু শুষ্ক মাটি দিয়া শিকড়গুলি চাপা দিতে হইবে। চারা হইতে যখন তিন চারিটী পাতা বাহির হইবে তখন উহাকে টব হইতে তুলিয়া লইয়া অন্য টবে ৫।৭টি করিয়া চারা বসাইয়া দিতে হইবে। চারা যত বড় ও তেজস্কর হইতে থাকিবে উহাকে সেই পরিমাণ রৌদ্র ও তাপ সহ্য করাইতে হইবে। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ চারাগুলি খুব ছোট থাকিতে থাকিতে অধিক রৌদ্র লাগাইলে উহা শুষ্ক হইয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। টবের মাটি অধিক পরিমাণে শুষ্ক হইতে দেওয়া উচিত নহে; মধ্যে মধ্যে জল সিঞ্চন করিয়া মাটিকে সরস রাখা কর্ত্তব্য।

শীতকালের প্রাতঃকালে এই পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া উদ্যানভূমিকে একেবারে আলোকিত করিয়া তুলে। উদ্যানবাটীকা এই "প্রাণতোষিণী" পুষ্পের সৌন্দর্য্যে বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়া উঠে।

আমাদের দেশে "হার্টস্-ইজের" বীজ প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। যদিবা কখন দুই একটী বৃক্ষে বীজ উৎপন্ন করিতে পারা যায় কিন্তু উহা হইতে ভালরূপ ফুল উৎপন্ন হয় না। এজন্য প্রতি বৎসর উহার বীজ আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে এদেশে আনীত হয়। সমস্ত শীতকালই এই সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। ফাল্গুন মাসে রৌদ্র প্রবল হইলে গাছ মরিয়া যায়।

ভুমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসের কারণ কি।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থার বিষয় স্থিরচিত্তে আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রকৃতই হৃদয়ে ব্যথা পাইতে হয়। আজ স্বর্ণপ্রসূ ভারত এক মুষ্টি অন্ন দিয়া তাহার সকল সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদন করিতে অসমর্থ হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী করাল বদনব্যাদানপূর্ব্বক যেন বিশ্বসংসার উদরস্থাৎ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সম্প্রতি পঞ্জাবে,

গুজরাটে, রাজপুতানায় ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষ দাবানল হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আজ উক্ত প্রদেশবাসী দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিবর্গের দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়। বর্ত্তমান সময়েই যে কেবল ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে তাহা নহে। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ভারতসন্তানকে দুর্ভিক্ষের দারুণ কশাঘাতে জর্জ্জরিত কলেবরে রোদন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কেন দেশের অবস্থা এরূপ হইল? পূর্ব্বেত দেশের সকলেই দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন উদরে দিতে পাইত।

দেশের অবস্থা যে দিন দিন হীন হইতে হীনতর হইতেছে তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই। দেশের সাধারণ প্রজার বিশেষতঃ দেশের কৃষককুলের অবস্থা ক্রমেই অবনত হইতেছে। দেশের এইরূপ অবনতির বহু-বিধ কারণ আছে। তন্মধ্যে প্রধান কারণ আমাদের দেশের কর্ষণোপযোগী ভূমির উৎপাদিকা শক্তির ক্রমিক হ্রাস। পূর্ব্বে আমাদের দেশের জমিতে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইত এক্ষণে আর সে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয় না।

পূর্ব্বে এদেশে বিঘায় পোনের ষোল মণ ধান; চারি পাঁচ মণ তিল, মসিনা, সরিষা; দশ বার মণ ছোলা, গম, অড়হর; ত্রিশ চল্লিশ মণ পর্য্যন্ত ইক্ষুগুড়; বিশ বাইশ মণ হরিদ্রা, শুঁট; দশ বার মণ লঙ্কা, মরিচ, কোষ্টা, কার্পাস ইত্যাদি জন্মাইত। এক বিঘা তরকারির জমিতে পঁচিশ ত্রিশ টাকা ও এক বিঘা পাটের জমিতে একশত টাকা উৎপন্ন হইত। এক্ষণে সুবৃষ্টির বৎসরেও আর ঐরূপ ফসল জন্মেনা। যদি খুব বেশী জন্মেত উহার অর্দ্ধেক পরিমাণ জন্মিয়া থাকে। অধিকন্তু এক্ষণে সকল বৎসরে সমান ভাবে সুবৃষ্টি হইতে দেখা যায়না। কোনও বৎসরে অতিবৃষ্টি, কোনও বৎসরে অনাবৃষ্টি এবং কোনও বৎসরে বিশৃঙ্খল বৃষ্টি লাগিয়াই আছে। অতিবৃষ্টির বৎসরে ফসল সকল হাজিয়া পচিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং অনাবৃষ্টি ও বিশৃঙ্খল বৃষ্টির বৎসরে শস্য সকল শুষ্ক বা অন্য বিবিধ প্রকারে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বৃষ্টি-জলের বিশৃঙ্খলা ব্যতীত ভূমির উৎপাদিকা শক্তির ক্রমশঃ হ্রাসই এদেশে শস্যের অল্পতার প্রধান কারণ।

এক্ষণে দেখা যাউক ভূমির উৎপাদিকা শক্তির নাশের প্রধান কারণ কি। সাধারণতঃ সকলেই এবং বিশেষতঃ কৃষক মাত্রেই অবগত আছেন যে, এক ক্ষেত্রে প্রথম বৎসর যেরূপ ফসল উৎপন্ন হয়, তার পরবৎসর অর্থাৎ দ্বিতীয়

বৎসরে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং বৎসরের পর যতই বৎসর যাইতে থাকে, উত্তরোত্তর ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইয়া উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ক্রমেই অল্প হইতে অল্পতর হইয়া যায়। বহুকাল এইরূপভাবে অবস্থান করিলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। ভূমির এইরূপে উৎপাদিকা শক্তি কেন নাশ হয় তাহা সকলেরই বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

ভূগর্ভে একটী আন্তরিক শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই আন্তরিক শক্তি নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা বাহিরে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। ভূগর্ভে একটী কোনও বৃক্ষের বীজ বপন করিলে এবং তাহাতে নিয়মমত জলসেচন করিলে মৃত্তিকা, জল, বায়ু এবং বীজের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে ভূমির আন্তরিক শক্তি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। বৃক্ষটী যখন ফলেফুলে সুশোভিত হইয়া উঠে, তখন ভূগর্ভস্থ আন্তরিক শক্তির কিয়দংশ বাহিরে প্রকাশিত হইয়াছে বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমরা বৃক্ষ ও তৎসমন্বিত ফলপুষ্প আহরণ করিলাম, তাহাতেই আমাদের ভূমির অন্তর্নিহিত শক্তির কিয়দংশ আহরণ করা হইল। এইরূপে আমরা কোনও এক ভূখণ্ড হইতে যত শস্যাদি গ্রহণ করিব, ঐ সকল শস্যাদির সহিত ভূমির অন্তর্নিহিত উৎপাদিকা শক্তিরও তত হ্রাস হইবে। ফলকথা ভূমির উৎপাদিকা শক্তিই ফলপুষ্পে পরিণত হইয়া মানবের সেবায় নিযুক্ত হয়। ভূমির এই অন্তর্নিহিত শক্তি পটাস্, ফস্ফরিক্ এসিড্ প্রভৃতি দ্রব্যে আবদ্ধ থাকে। আবাদ করিতে করিতে ভূমি হইতে ক্রমে উপরোক্ত পটাস্ প্রভৃতির হ্রাস হয় এবং তাহাতেই ভূমি ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আমরা ভূমি হইতে যে শক্তিটুকু উপরোক্ত প্রকারে গ্রহণ করি তাহা আমাদের ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য; অর্থাৎ যেমন ঋণ করিলে তাহা প্রত্যর্পণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য; সেইরূপ আমরা আমাদের মাতৃস্বরূপিণী পৃথিবীর নিকট হইতে যে শক্তিটুকু ফলশস্যরূপে ঋণগ্রহণ করিয়া থাকি তাহাও পৃথিবীকে প্রত্যর্পণ করা উচিত।

কিন্তু কি প্রকারে পৃথিবীর উপরোক্ত প্রকার ঋণ পরিশোধিত হইবে? ঋণ পরিশোধ করিবার উপায় অতি সহজ। আমরা ভূমি হইতে যে পরিমাণে

উহার শক্তি গ্রহণ করি তাহার পূরণ জন্য ভূমিতে সেই পরিমাণ সার দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রতি বৎসর শস্যাদি প্রদান করিয়া ভূমির যে সারভাগের ক্ষয় হয়, সার প্রদান করিলে সেই ক্ষয়ের পূরণ হইয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তির সমতা রক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব আমাদের সকলেরই ভূমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সার দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি আমরা আলস্যপরবশ হইয়া ভূমিতে সার দিতে বিরত থাকি এবং প্রতি বৎসরই ভূমি হইতে শস্য উৎপন্ন করিয়া উহার উৎপাদিকা শক্তির অপহরণ করি তাহা হইলে আমরা প্রকৃতই তস্করের কার্য্য করিব এবং চৌর্য্যবৃত্তির অবশ্যম্ভাবী ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। যদি আমরা জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সার না দিই তাহা হইলে জমির উৎপাদিকা শক্তির ক্রমশঃ নাশ হইয়া স্বভাবতঃ উর্ব্বরা জমি একবারে অনুর্ব্বরা জমিতে পরিণত হইয়া যাইবে। যে জমিতে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল, সারের অভাবে তাহাও মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। অতএব পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সারপ্রদান করিয়া উহার উৎপাদিকা শক্তির সমতা রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

কুলিবেগুণের চাষ।

কৃষকেরা জমিতে নানাবিধ তরকারীর গাছের আবাদ করিয়া বিলক্ষণ লাভবান হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলে তরকারীর আবাদে প্রচুর লাভ হইবার কথা। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা কলিকাতায় তরকারীর মূল্য অত্যন্ত অধিক। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য কুলিবেগুণ উপরোক্ত তরকারীর অন্তর্গত। আমরা অদ্য এই কুলিবেগুণের আবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কুলিবেগুণের গাছের বিশেষ গুণ এই যে এই বৃক্ষ একবার রোপণ করিলে সমস্ত বৎসর ফল প্রদান করিয়া থাকে। কুলিবেগুণের আকার অন্য বেগুণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার বৃক্ষে অন্য বেগুণ অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ফল ফলিয়া থাকে। দো-আঁস জমিই কুলিবেগুণ চাষের বিশেষ উপযুক্ত। পৌষমাসে কুলিবেগুণের বীজ বপন করিতে হয়।

উপরোক্ত কুলিবেগুণের বীজ বপন করিতে হইলে একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া উত্তমরূপে কোদলাইতে হইবে। পরে ঐ জমি হইতে ঘাস মুথা প্রভৃতি আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। এইরূপ মাটি পরিষ্কার হইলে কোদলান মাটির চাপ হস্তে করিয়া উত্তম রূপে গুঁড়া করা আবশ্যক। এই গুঁড়া মাটি জমিতে ফেলিয়া উহার উপর বীজ ছড়াইয়া স্বতন্ত্র ধূলার ন্যায় চূর্ণীকৃত মাটি বীজের উপর ছড়াইয়া হস্ত দিয়া চাপিয়া দিতে হইবে। এইরূপ ভাবে মাটি চাপান আবশ্যক যেন বীজ মাটির মধ্যে উত্তমরূপে ঢাকিয়া যাইতে পারে। উক্তভাবে বীজ ছড়াইবার পর জমির উপর কলার পাতা কিংবা তৎসদৃশ অন্য কোনও দ্রব্য দিয়া উহা বিশেষরূপে আবৃত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সাতদিন পর্য্যন্ত এইরূপে জমি আবৃত করিয়া রাখা উচিত। সাতদিনের পর জমির আচ্ছাদন উন্মোচন করা কর্ত্তব্য। আচ্ছাদন খুলিয়া দিয়া হস্তে করিয়া জমির উপর অল্প অল্প জল সিঞ্চন করা কর্ত্তব্য। জল দিবার সময় বিশেষ সাবধানতার সহিত জল দিতে হইবে। বেশী জল দিয়া একেবারে মাটিকে কাদায় পরিণত করিলে চলিবে না। এরূপ ভাবে জল দিতে হইবে যেন কেবলমাত্র মাটি কিঞ্চিৎ আর্দ্র হয় মাত্র। এইরূপে জল দিবার পর জমি পুনরায় পূর্ব্ববৎ আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত বীজ অঙ্কুরিত না হয় ততদিন জমি উপরোক্তরূপে আবৃত করিয়া রাখা প্রয়োজন। পরে বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইলে জমি আর আবৃত রাখিবার আবশ্যক হইবে না। তখন আচ্ছাদন খুলিয়া দিলে আর কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। চারার এই অবস্থাতে আর কোনও বিশেষ পাইট করিতে হয় না। তবে মধ্যে মধ্যে জমির অবস্থা বুঝিয়া কিঞ্চিৎ জলসিঞ্চন করা আবশ্যক। কিন্তু এরূপ সময়ে প্রায় স্বতন্ত্রভাবে জল দিবার আবশ্যক হয় না। প্রকৃতিপ্রদত্ত রাত্রের শিশিরেই জমি বেশ সরস করিয়া রাখে এবং উহাতেই চারার বৃদ্ধি ও পুষ্টি হইতে থাকে। রাত্রের শিশির ও দিবসের সূর্য্যতাপ উভয়ে মিলিত হইয়া চারাগুলিকে সবল করিয়া তুলে। উপরোক্ত প্রকারে বীজ বপন করাকে আমাদের দেশের চাষীরা "তলাফেলা" বলে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দো-আঁস জমিতেই কুলিবেগুণের চাষ করা কর্ত্তব্য। যে জমিতে চারা রোপণ করিতে হইবে তাহাকে পূর্ব্ব হইতে একবার চাষ দিয়া রাখা

কর্ত্তব্য। উক্ত চাষ দেওয়া জমির উপর বেগুণের চারাগুলি সোজা লাইন করিয়া রোপণ করা আবশ্যক। এক একটি চারা এক হাত অন্তর রোপণ করিলেই ভাল হয়। কারণ চারাগুলি পরস্পর অতি নিকটে রোপণ করিলে চারার ভাল তেজ থাকে না, সুতরাং বৃক্ষ গুলি সরু হইয়া যায়। এইরূপে সরু বৃক্ষে অধিক ও উত্তম ফল ফলে না। যে গাছ অধিক সবল, বেশ পত্র পল্লবে শোভিত সেই গাছেই প্রচুর পরিমাণ সুফল ফলিয়া থাকে। উপরোক্ত তলাফেলা জমি হইতে মাঘ মাসের ১৫।১৬ দিন নাগাদ চারাগুলি তুলিয়া চাষ দেওয়া জমিতে রোপণ করিতে হয়। চারা তুলিয়া রোপণ করিবার সময় চারার গোড়া হইতে শিকড়ের কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। কারণ এইরূপ করিলে কর্ত্তিত স্থান হইতে সতেজে শিকড় বাহির হয় এবং তাহাতেই চারাগুলি অতি শীঘ্র শীঘ্র সতেজ হইয়া উঠে। সকল চাষারাই চারা রোপণ করিবার সময় উপরোক্ত প্রকারে শিকড়ের কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। চারা রোপণের পর উহাতে তিন দিন মাত্র জলসিঞ্চন করিলেই চলিতে পারে। সন্ধ্যাকাল অপেক্ষা প্রাতঃকালে জলসিঞ্চন করিলেই অধিক ফল লাভ হয়। ইহার প্রায় ১৫ দিন পরে ক্ষেতে একবার ছেঁচ দিলে ভাল হয়। এইরূপে ছেঁচ দিবার পর আর কোনও কিছু করিবার প্রয়োজন হয় না। তবে গাছগুলি যেমন বড় হইতে থাকে গাছের গোড়াগুলি মধ্যে মধ্যে খুসিয়া দিলেই চলিতে পারে। ইহার কিছুদিন পরে সমস্ত ক্ষেত্রটী একবার কোদলাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

কুলিবেগুণের চাষের নিমিত্ত জমিতে বিশেষ কোনও পাইট করিতে হয় না। তবে জমিতে পুরাতন খোইলের সার দিলে উপকার হইয়া থাকে। নূতন অপেক্ষা পুরাতন খোইলের সার দেওয়াই উচিত। কারণ নূতন খইলের ঝাঁজে চারার অনিষ্ট হইতে পারে। নূতন খইলের ঝাঁজে গাছের তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া গাছ জ্বলিয়া যায়। প্রতি বিঘায় পাঁচ মণ করিয়া খোইলের সার দিলেই চলিতে পারে। ক্ষেত্রে গাছ রাখিলে উহা হইতে এক বৎসর ফল পাওয়া যাইতে পারে, তবে ক্ষেত্রে অন্য কোনও আবাদের জন্য বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিলে স্বতন্ত্র কথা।

যদি ক্ষেত্র হইতে গাছ না কাটা যায় তাহা হইলে উহা হইতে বৎসরের সকল সময়েই প্রচুর পরিমাণে ফল পাওয়া যায়। কুলিবেগুণ গাছের যে প্রকার

ফলন অন্য কোনও গাছের সেরূপ ফলন দেখিতে পাওয়া যায় না। এক এক ক্ষেত্রে এত অধিক ফল ফলিয়া থাকে যে উহা তুলিয়া শেষ করা যায় না। বৈশাখ মাস হইতে বৃক্ষে বেগুণ ফলিতে আরম্ভ হয়। প্রথম দুই এক সপ্তাহ তত বেশী ফল ফলে না, কিন্তু তাহার পর হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ফল পাওয়া যায়। বর্ষাকালে অত্যন্ত বৃষ্টির সময় গাছের ফুল পচিয়া গিয়া ফলনের কিছু ব্যাঘাত হয় এবং সেই জন্য বর্ষার সময় কিছু কম পরিমাণ বেগুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্য সময়ে যখন ফলনের অন্য কোনও ব্যাঘাত থাকে না, তখন প্রতি বিঘায় গড়পড়তা প্রায় তিন মণ করিয়া বেগুণ উৎপন্ন হইতে পারে। অত্যন্ত ন্যূনকল্পে প্রতি সের বেগুণের মূল্য ৎ২৷৷৹ অর্দ্ধ পয়সা ধরিলেও প্রত্যহ প্রতি বিঘা হইতে ৸৶৹ পনর আনার বেগুণ পাওয়া যাইতে পারে। কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে উৎপন্ন বেগুণের মূল্য অনেক অধিক হইতে পারে; সুতরাং বেগুণের চাষে যে বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কুলিবেগুণের বীজ রক্ষা করিতে হইলে তেজাল বৃক্ষের সুপক্ক বেগুণ তুলিয়া উহা লম্বালম্বিভাবে চিরিয়া বীজগুলি বাহির করিয়া জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করত বোতলে ভরিয়া রাখা উচিত। বোতলের মধ্যে যাহাতে পিপীলিকা প্রভৃতি কীটাদি প্রবেশ করিয়া বীজ নষ্ট না করে, সেই জন্য বিশেষ সাবধানতার সহিত বোতলের মুখ বন্ধ করা কর্ত্তব্য। বোতলে বীজ রক্ষার আর এক গুণ এই যে উহাতে বাহিরের বাতাস লাগিয়া বীজের উৎপাদিকাশক্তি নষ্ট হয় না। আমাদের দেশের অজ্ঞ চাষীরা কিন্তু এ কথা অবগত নহে। সেই জন্য তাহারা বোতলে বীজ রক্ষা না করিয়া অনেক সময় কাপড়ে বাঁধিয়া রাখে। কিন্তু এরূপ করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। উহাতেই অনেক সময় চাষীদের বীজ হইতে ভাল চারা বাহির হয় না।

বেগুণের ক্ষেত্রে পিপীলিকা ও অন্যান্য কয়েক প্রকার কীট লাগিয়া ক্ষেত্রের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে; সুতরাং এই উৎপাত উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গাছে পিপীলিকা হইলে হরিদ্রার জল গাছে দিলেই পিপীলিকা মরিয়া যায়। কেহ কেহ গাছে পোকা লাগিলে উহাতে

ছাই দিয়া থাকে, কিন্তু ছাই সকল গাছের পক্ষে উপকারী নহে। ছাইএর ঝাঁজে গাছ মরিয়া যাইতে পারে; সুতরাং গাছে ছাই দেওয়া উচিত নহে।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুবৃহৎ আমেরিকান ফুলকপি।
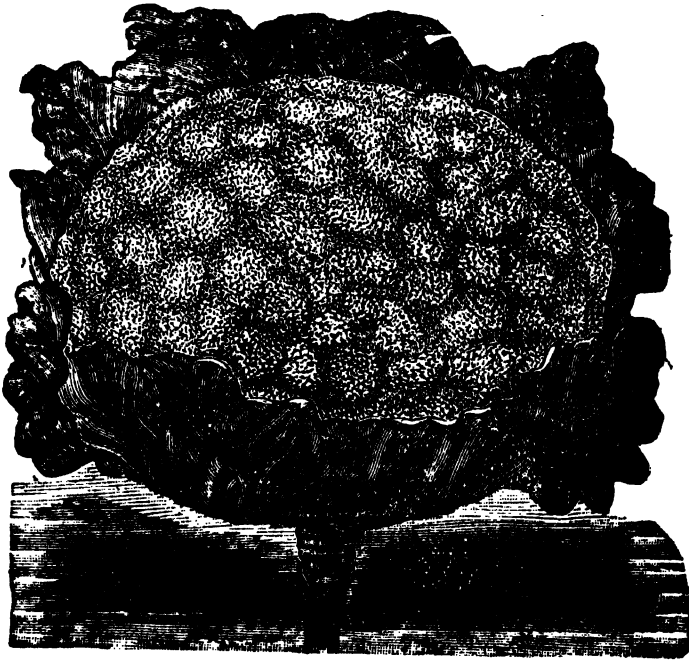
উপরে ফুলকপির যে প্রতিরূপ চিত্রিত রহিয়াছে; উহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট আমেরিকান ফুলকপি। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমেরিকান ফুলকপির বীজ আমরা প্রতি বৎসর আনয়ন করিয়া আমাদের নর্শরির অসংখ্য গ্রাহকগণকে প্রদান করিয়া তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছি। উপ-রোক্ত ফুলকপি কেবলমাত্র যে খাইতে সুস্বাদু তাহা নহে। সুন্দর স্বাদ ব্যতীত ইহার আরও অনেক গুণ আছে। এই ফুলকপি দেখিতে অত্যন্ত শুভ্রবর্ণ এবং অত্যন্ত কঠিন, ইহার গাছে বেশী পাতা হয় না এবং একটী ক্ষুদ্র গাছে একটী

সুবৃহৎ কপি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৃক্ষ রোপণ করিবার ৭০।৮০ দিন মধ্যেই বৃক্ষে ফুল ধরে।

এই ফুলকপি রোপণ করিবার উপযুক্ত সময় আশ্বিন মাস। নিম্নলিখিত প্রকারে হাপর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বীজ ছড়াইতে হয়। একটী নির্দ্দিষ্ট ভূমি খণ্ডের অর্দ্ধ হাত পরিমাণ মাটি উচ্চ করিয়া রাখিতে হইবে। মাটি এরূপ ভাবে চূর্ণ করা উচিত যেন অন্ততঃ ৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত মাটি ঠিক ধূলার ন্যায় থাকে। উক্ত ধূলার গুঁড়াগুলি ক্ষেত্রের সকল দিকে সমান ভাবে পড়া আবশ্যক ; যেন কোন দিকে উঁচু বা নিচু না হয়। উক্তরূপ জমির উপর খুব সাবধানতার সহিত বীজ ছড়াইতে হইবে। বীজ গুলি এরূপ ভাবে ছড়াইতে হইবে যেন উহা ক্ষেত্রের সকল অংশে সমান পরিমাণে পতিত হয়। পক্ষান্তরে বীজগুলি এক স্থানে একত্রে অধিক পরিমাণ পড়িলে তাহা হইতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যদি কোনও রূপে এক স্থানে বেশী বীজ পড়িয়া যায় তাহা হইলে উহাদিগকে হস্ত দিয়া চালিয়া সমান করিয়া দিতে হইবে। মোট কথা যাহাতে হাপরের সর্ব্বস্থানে সমান পরিমাণ বীজ পতিত হয় সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বীজ ছড়াইলেই চলিবে। উপরোক্ত প্রকারে বীজ ছড়াইয়া উহার উপর শুষ্ক গুঁড়া মাটি চাপা দিতে হইবে। মাটি এরূপ পরিমাণে দেওয়া উচিত যেন ঐ মাটিতে জল দিবার পর মাটির ভারের দরুণ বীজ একেবারে বসিয়া না যায়। কারণ বীজের উপর অধিক পরিমাণ মাটি থাকিলে ঐ মাটির স্তর ভেদ করিয়া অঙ্কুরোদ্গম হওয়া অসম্ভব। যদি এরূপ দেখা যায় যে হাপরে জলসিঞ্চন করিলে হাপরস্থিত বীজ উপরে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে বীজের উপর অতি অল্প পরিমাণই মাটি দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে পুনরায় শুষ্ক গুঁড়ামাটি লইয়া বীজগুলি উপযুক্তরূপে ঢাকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। হাপরে জল দিবার সময় বিশেষ সাবধান হইয়া জল দেওয়া কর্ত্তব্য। কলসীতে করিয়া বা অন্য কোনও পাত্রে করিয়া অধিক বেগে জল সিঞ্চন করিলে, জলের জোরে কতক বীজ হাপরের নিম্নদেশে চলিয়া যাইবে এবং কতক বীজ ইতস্ততঃ ভাসিয়া যাইবে। সুতরাং কলসী প্রভৃতিতে করিয়া জল না দিয়া সরুছিদ্রযুক্ত বোমাতে করিয়া হাপরে জলসিঞ্চন করা কর্ত্তব্য। বীজ বপনের দুই দিবস পর হইতে হাপরে জল দিতে

আরম্ভ করা উচিত। দুই দিবস জল না দিলে মাটির গরমে বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। তিন দিন মাত্র জল সিঞ্চন করিলেই বীজ ফাটিয়া অঙ্কুর বাহির হইবে এবং প্রায়ই পাঁচদিনের মধ্যে সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে। যখন প্রতি চারাতে ৪।৫টী করিয়া পাতা জন্মিবে। তখন হাপর হইতে গাছগুলি এক একটী করিয়া তুলিয়া অন্য একটী হাপরে বসাইতে হইবে। চারাগুলি সুবিধামত দুই কিম্বা তিন ইঞ্চ অন্তর বসাইলেই চলিবে। এস্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কপির বীজ হইতে চারা অঙ্কুরিত করিতে হইলে একই সময়ে দুইটী হাপর প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। একটী হাপরে বীজ অঙ্কুরিত করিতে হইবে এবং অপরটীতে অঙ্কুরিত চারাগুলিকে নাড়িয়া বসাইতে হইবে।

চারাগুলি যখন পাঁচ ছয়টী কিম্বা সাতটী পাতা বিস্তার করিবে তখন উহাদিগকে হাপর হইতে উঠাইয়া কপির জন্য প্রস্তুত ক্ষেত্রে দুইহাত অন্তর এক একটী চারা বসাইয়া দিতে হইবে। নিম্নলিখিত প্রকারে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

বর্ষার সময় প্রতি কাঠা পরিমাণ জমীতে ২০।২৫ কুড়ি পঁচিশটী গর্ত্ত কর এবং প্রত্যেক গর্ত্ত অন্ততঃ দুইসের খোল কিম্বা ভেড়ার সার কিম্বা পুরাতন গোময় দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া মাটি চাপা দাও। বর্ষার জলে গর্ত্তের সারগুলি পচিয়া উঠিবে। বর্ষার শেষে জমী কোদলাইয়া সার ও মাটি একত্রে মিশ্রিত করিয়া সমগ্র ক্ষেত্রে সমপরিমাণে বিছাইয়া দিতে হইবে। ঐ ক্ষেত্রে বেগুণবাড়ীর ন্যায় উচ্চ ও নিম্ন আল ও খাল প্রস্তুত করিবে এবং ঐ খালের মধ্যে দুই হাত অন্তর ফুলকপির চারা বসাইবে। যে দিন চারা বসাইবে সেই দিন হইতেই ক্ষেত্রে জলসিঞ্চন করা আবশ্যক। জমীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া জলসিঞ্চন করা কর্ত্তব্য। চারার গোড়ার জমী ভিজা থাকিলে জল দিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কপি ক্ষেত্রে ছেঁচ দিতে পারিলেই ভাল হয়। প্রকৃতরূপে ছেঁচ দিতে পারিলে তিনটী ছেঁচেই কপি প্রস্তুত হইতে পারে। কপির চাষে অধিক পরিমাণ জলের আবশ্যক। জলে কপির কিছু অনিষ্ট হয় না। তবে বর্ষার জল তত ভাল নহে। কি ফুলকপি, ওলকপি এবং বাঁধাকপি সকল কপির চাষেই প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন।

পূর্ব্বোক্ত হাপরে চারা বসাইবার পর বিশেষ সাবধান হইয়া প্রচণ্ড রৌদ্র

তাপ হইতে চারাগুলিকে রক্ষা করিতে হইবে। সেইজন্য মধ্যাহ্নে হোগলা দিয়া চারাগুলি আবৃত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ঠাণ্ডা পড়িলে হোগলা খুলিয়া দেওয়া উচিত। রাত্রে শিশির দ্বারা চারাগুলির বিশেষ উপকার হইয়া থাকে, কিন্তু বৃষ্টির জলে অনিষ্ট করিতে পারে সুতরাং বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইলে চারাগুলিকে হোগলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। অধিক ঢাকা দিয়া রাখাও ভাল নহে, কারণ তাহা হইলে চারাগুলি অযথাভাবে লম্বা হইয়া কোমর ভাঙ্গিয়া পড়ে। এইরূপ কোমর ভাঙ্গা চারা আর সোজা হয় না, সুতরাং উহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

চীনেরবাদাম বা মাটবাদাম।

ইহাকে ইংরাজিতে Ground nut, বৈজ্ঞানিক মতে Arachis Hypogia. বাঙ্গালায় চীনের বাদাম, মাটবাদাম অথবা চলিত ভাষায় মাট-কলাই বলিয়া থাকে। ইহার আদিম উৎপত্তি স্থান দক্ষিণ আমেরিকা। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকায় ইহার প্রথম আবিষ্কার হয়। এক্ষণে নানাদেশে ইহার আবাদ হইতেছে। ভারতবর্ষ ও আফ্রিকায় ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বোধ হয় চীনদেশ হইতে এদেশে প্রথম আনীত হয় বলিয়া ইহাকে চীনের-বাদাম বলিয়া থাকে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই বেশ জন্মায়; ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ প্রদেশে ইহার বহুল পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে এবং প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ মণ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে প্রতি বিঘায় প্রায় ৬ মণ করিয়া বাদাম উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যেক মণ ৫৲ টাকা কিম্বা ৫৷৷৹ সাড়ে পাঁচ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা যে একটী লাভজনক কৃষিকার্য্য তাহার আর সন্দেহ নাই।

ইহার বৃক্ষ একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মলতার ন্যায়; জমীর উপর লতাইয়া বেড়ায়। ইহার শাখা প্রশাখা ৩ ইঞ্চ হইতে ৬ ইঞ্চের বেশী হয় না। বালুকা মিশ্রিত উচ্চ ভূমিই ইহার আবাদের উপযুক্ত জমী। ফাল্গুন, চৈত্র হইতে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত আবাদের প্রশস্ত সময়। মাঘ মাসের পর ফাল্গুন মাসের প্রথমেই জমীতে বেশ করিয়া ২।৩ বার চাষ দিতে হয় এবং তৎপরে রীতিমত মই দিয়া

জমীকে সমতল করিয়া লইতে হইবে। এই সময়ে জমীর উপর একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, যেন ঢেলাগুলি বেশ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং ইট, নুড়ি, খোলাম, প্রস্তর, অন্যান্য গাছের শিকড় প্রভৃতি আবর্জ্জনাগুলি উত্তমরূপে বাছাই হয়। জমী অনুর্ব্বরা বোধ হইলে কিঞ্চিৎ সার দেওয়া কর্ত্তব্য; নচেৎ সার দেওয়ার কোন আবশ্যক নাই, কেননা ইহার পাতা পড়িয়া স্বতঃই সার উৎপন্ন হয়। এইরূপ জমী প্রস্তুত হইলে ২ ফিট অন্তর ৬ ইঞ্চ গর্ত্ত করিয়া (যেরূপ উচ্ছে, পটল প্রভৃতির ভাটী করে) তাহাতে বাদাম রোপণ করিয়া ২ ইঞ্চ গুঁড়া মাটি দ্বারা খুব্‌রিগুলি ঢাকা দিতে হইবে। সপ্তাহ অতীত হইলে যদি বীজ অঙ্কুরিত না হয় তবে কিঞ্চিৎ জলসিঞ্চন করা আবশ্যক। বীজ অঙ্কুরিত হইলেও উহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সামান্য জলসিঞ্চন করিতে হইবে। শাখা প্রশাখা বহির্গত হইলে জল সিঞ্চনের আর কোন আবশ্যকতা থাকে না। জল সিঞ্চনকালে দেখিতে হইবে যেন জমি আঁটিয়া কঠিন হইয়া না যায়। অর্থাৎ ফাঁপা বা আল্‌গা থাকে।

বীজ অঙ্কুরিত হইয়া শাখাপ্রশাখা বহির্গত হইলে পর বেশ করিয়া নিড়াইয়া গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হইবে। নিড়াইয়া দিলে যে কেবল ক্ষেত্রের জঙ্গল পরিষ্কার হয় তাহা নয় ইহাতে জমী আল্‌গা হয় এবং গাছের শ্রীবৃদ্ধি হয়। চীনের বাদামের পক্ষে জমী যত আল্‌গা রাখিতে পারা যায় ততই উত্তম। কেননা আল্‌গা মাটিতেই ভাল জন্মায়। এই বাদাম মাটির ভিতরেই জন্মিয়া থাকে। সুতরাং যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে শাখাগুলি ৯ ইঞ্চ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তখন ঐ শাখার গ্রন্থিগুলি উত্তমরূপে মাটি দিয়া চাপা দিতে হইবে। শ্রাবণ মাসের শেষাশেষি কিম্বা ভাদ্রমাসের প্রথমে যখন বৃষ্টি পতন হ্রাস হইয়া আসিবে সেই সময়ই মাটি দিবার উপযুক্ত সময়। এরূপ ভাবে মাটি চাপা দিতে হইবে যে, ডাঁটাগুলি যেন সমস্ত চাপা পড়ে, কেবল ডগাগুলি ৪ ইঞ্চ পরিমাণে বাহির হইয়া থাকে। গাছগুলির যতদিন পর্য্যন্ত বেশ তেজ থাকে, শাখাগুলি বৃদ্ধি পাইলেই এইরূপে মধ্যে মধ্যে মাটি চাপা দিতে হইবে। নিড়াইয়া দেওয়া ও মাটি চাপা দেওয়া অত্যন্ত যত্নের কার্য্য; এ সময়ে ক্ষেত্রে এমন ভাবে কার্য্য করিতে হইবে যাহাতে নীচের শিকড়গুলি (যাহা পরে বাদামে পরিণত হইবে) কাটিয়া ছিঁড়িয়া নষ্ট হইয়া না যায়। এই সকল কার্য্য আমার মতে পুরুষ অপেক্ষা

স্ত্রীলোকের দ্বারা বেশ সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। বর্ষার সময় মাটি দেওয়া কিম্বা নিড়াইয়া দেওয়ার অত্যন্ত অসুবিধা, কারণ জমী আর্দ্র থাকে এবং নিড়ানাদি চালাইলে চাপ চাপ মাটি উঠে। সেকারণ জমীর শুষ্ক অবস্থাতেই ঐ সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ডাঁটাগুলি মাটি চাপা দিবার আবশ্যকতা এই যে, লতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া উহার তেজশক্তির হ্রাস হওয়ায় ঐ ডাঁটা হইতেই শিকড় নামিয়া বাদাম উৎপন্ন হইবে এবং ঐ লতার পাতাগুলি পচিয়া জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইবে। ইহাতে জল সিঞ্চনের আদৌ আবশ্যক নাই।

আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে মটর কলাইয়ের ফুলের ন্যায় পীতবর্ণ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার পর দুই তিন মাস কাল লতার আর সেরূপ তেজ থাকে না। এই সময়েই উল্লিখিত শিকড়গুলি বাদামের আকার ধারণ করে। পৌষ মাসে বাদাম পাকিয়া থাকে, তখন খুরপী অথবা দাওলী বা কোদালির দ্বারা উত্তোলন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়।

ইহা নানাপ্রকারে আমাদের ব্যবহারে আসে, ইহার তৈল, সাবান ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য ইয়ুরোপের নানাদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। অনেক দেশে ইহা জল পাইয়ের তৈলের (Olive oil) পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। পশুগণ লতাগুলিকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকে। গৃহস্থঘরে ইহার খোলাগুলি রেড়ীর খোলার ন্যায় জ্বালানি কাষ্ঠ হয়। চীনদেশের লোকেরা এই তৈলে প্রদীপ জ্বালাইয়া থাকে। ফলতঃ আমাদের দেশে ইহার প্রচুর আবাদ হইলে নানাপ্রকারে প্রচলিত হইতে পারে।

শ্রীহরিদাস ঘোষ,
পালপাড়া, বেলুড় পোঃ অঃ হাওড়া।

ভূর্জ্জপত্র।

ভূর্জ্জপত্র (Melaleuca Cajuputi) হিন্দুদিগের একটী পবিত্র বস্তু। ইহাতে তাঁহারা কবচাদি লিখিয়া ধারণ করিয়া থাকেন। "লিখিত্বা ভূর্জ্জপত্রে চ" ইত্যাদি। ভূর্জ্জপত্র বলিলে যে কেবল পত্রই বুঝায়, তাহা নহে। হিন্দুরা

অধিকাংশ স্থলে ইহার ত্বক্ই ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা যে শুদ্ধ দৈব কার্য্যে ব্যবহার হয়, এরূপ নহে। ঔষধোর মধ্যে ইহার তৈল একটী মহোপকারী বস্তু। ব্রিটিস্ ফারমাকোপিয়া এবং মেটিরিয়া মেডিকা প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার ব্যবহার বিশেষরূপ লিখিত আছে।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার তৈল "বুরোদ্বীপে" (মলক্কস্ দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণাংশ) প্রথম আবিষ্কৃত হয়। বিক্মোর্ নামক জনৈক আমেরিকাবাসী পান্থ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বুরোদ্বীপে তিন মাস অবস্থিতিকালে দেখিয়াছিলেন যে, এই দ্বীপ হইতে সে বৎসর আট সহস্র (৮০০০) বোতল তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল। সিঙ্গাপুরের বাণিজ্যপত্রিকার তালিকায় সিলিবিস্ দ্বীপ (বুরোদ্বীপের পশ্চিমাংশ-স্থিত) হইতেই ইহার প্রধান আমদানী প্রকাশিত আছে। সিঙ্গাপুর এবং বাটেভিয়া হইতে যে তৈল আমদানী হইয়া থাকে, তাহা কাচের বোতলে প্যাক্ হইয়া আইসে।

নিম্নে ১৮৭১ সালের যে তালিকা প্রদত্ত হইতেছে, তাহা হইতে অধিকাংশ তৈল কলিকাতা, বোম্বাই এবং কোচিন-চায়নায় পাঠান হইয়াছিল।—

জবদ্বীপ	হইতে	আমদানী	৪৪৫	গ্যালন	তৈল।
মানিলা	ঐ	ঐ	২০০	ঐ	ঐ
সিলিবিস্	ঐ	ঐ	৩,৮৯৫	ঐ	ঐ
অন্যান্য স্থান	ঐ	ঐ	৩৫০	ঐ	ঐ
		মোট	৪,৮৯০	গ্যালন।	

এই তৈল অতিশয় তরল, স্বচ্ছ, সুন্দর হরিদ্রাভ বর্ণের এবং কর্পূর ও এলাচ মিশ্রিত করিলে যেরূপ একটী গন্ধ হয়; ইহাতে সেই ভাবের একটী সুন্দর গন্ধ আছে; ইহার আস্বাদ কিঞ্চিৎ উগ্র ও তীক্ষ্ণতামিশ্রিত। ইহা অগ্নিসংযোগে বিনাবলম্বনে নিঃশেষ হইয়া টার্পিন তৈলের ন্যায় জ্বলিয়া যায় এবং শীঘ্র বাষ্পান্বিত হইয়া শুকাইয়া যায়। আমাদিগের দেশীয় চিকিৎসকগণ ইহা প্রায় ব্যবহার করেন না। কিন্তু ইংরাজ চিকিৎসকগণ ইহার সবিশেষ ব্যবহার অবগত আছেন। তাঁহারা বলেন, ইহা উত্তেজক, আক্ষেপনিবারক এবং ঘর্ম্মকারক। শোথ, পুরাতন বাত, অঙ্গের অবসাদ বা পক্ষাঘাত, অপস্মার (Hysteria) বায়ুবিকৃতিজাত বেদনা, প্রভৃতি নষ্ট করিতে ইহা সুনিপুণ।

চিনির ঠুসি করিয়া ইহা ২ ফোঁটা হইতে সাত ফোঁটা পর্য্যন্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভারতীয় ভিষক্‌গণ কোন কোন স্থনে ধ্বজভঙ্গে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। পেট আঁকড়াইয়া ধরিলেও ইহা উপকারী। ডাক্তার ওয়াট্ সাহেব এসম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় লিখিয়াছেন।

এই বৃক্ষের জন্মস্থান মলকস্দ্বীপ। ইহার অঙ্গযষ্টি উর্দ্ধোন্নত অথচ কিঞ্চিৎ বক্র। ইহা স্থূলকায় নহে। পেয়ারাগাছ যেরূপ স্থূল হইয়া থাকে, ইহা প্রায় তদ্রূপ। ইহার ত্বক্ শ্বেতধূসরবিমিশ্র বর্ণের; কোমল, স্থূল ও বিলাতি স্পঞ্জের ন্যায়। ইহার পর্দা আছে, অর্থাৎ উপরিভাগের সূক্ষ্ম ত্বক্ ছাড়াইলে, তাহার পর পর আরও ত্বক্ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহা বিশ্লিষ্ট করা যাইতে পারে। ত্বকের উপরিভাগ সুন্দর মসৃণ। ইহার প্রত্যঙ্গের শাখাসকল ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম সুগোল বেষ্টনের অনুশাখা দ্বারা সুশোভিত; সেই সকল অনুশাখা নিম্নমুখী। ত্রয়োদশ-বর্ষীয় বৃক্ষের উর্দ্ধায়তন আট হাত মাত্র। ত্বক্ তিন "য" মাত্র মোটা হইয়া থাকে। পত্র সকল তিন ইঞ্চি হইতে পাঁচ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা এবং অর্দ্ধ ইঞ্চি হইতে তিন "য" পর্য্যন্ত চওড়া। এই পত্র সকল স্থূল ও গাঢ় হরিদ্বর্ণের, তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্রমুখ, পেষণ করিলে পূর্ব্বোল্লিখিত তৈলের গন্ধ পাওয়া যায় এবং ইহা হইতেই সেই তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। পত্র সকল উত্তমরূপে শুকাইয়া যাইলেও অগ্নিসংস্পর্শে প্রজ্জ্বলিত হয় ও আপনার স্নেহরসে সিক্ত থাকে। পুষ্প শ্বেতবর্ণের, তিনটী পাপ্‌ড়িযুক্ত, ক্ষুদ্র ও বিশেষ গন্ধবিহীন।

এই বৃক্ষের বীজ হইয়া থাকে। তাহার আকৃতি ক্রমসূক্ষ্মভাবে কোণবিশিষ্ট ও পাতলা কুঠারভাবাপন্ন। বর্ষাকালে এই বৃক্ষের শিকড় ছোট ছোট টুক্‌রা করিয়া পুতিয়া দিলে গাছ হইয়া থাকে। কিন্তু বীজ সকল হাতে করিয়া রোপণ করিবার অপেক্ষা বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া তন্মূলে স্বচ্ছন্দে অঙ্কুরিত হইলে, তাহা হইতে যে বৃক্ষ হয় তাহাই উৎকৃষ্ট ও দীর্ঘজীবী হয়।

১৭৯৭।৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুর বোটানিক্যাল্ গার্ডেনে এই বৃক্ষ দর্শন দিয়াছিল। অদ্যাপিও তথায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। প্যাভিলিয়নের নিকট এই বৃক্ষ দেখিয়াছি। সার-জর্জ-কিং সাহেব তাঁহার গার্ডেন-গাইডেও এই বৃক্ষের অবস্থিতি স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার কাষ্ঠ দ্বীপপ্রদেশে বা পার্ব্বত্যদেশে মশালের

কার্য্য করে। ভূর্জ্জত্বকে শুড়্গুড়ির সট্‌কা বাঁধিলে তাহা সহজে থেলে ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়।

মেটিরিয়া মেডিকা—(Myrtacea) মার্টেসি জাতীয় Mclalenca বৃক্ষের পত্র চুয়াইয়া এই তৈল (Olensu Cajuputi) প্রস্তুত করা যায়।

আময়িক প্রয়োগ—"উদরাধ্মান ও আধ্মান শূলরোগে ইহা আশু প্রতিকার লাভ হয়। ৩।৫ মিনিম্ মাত্রায় বারম্বার প্রয়োগ করিবে। ডাঃ গ্যারড্ এবং ব্যালার্ড্ কহেন যে ইহা প্রায় নিষ্ফল হয় না।"

"টাইফস্ ও টাইফইড্ জ্বররোগে উত্তেজনার্থ ব্যবহার করা যায়। বিসূ-চিকা রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। হিষ্টিরিয়ারোগে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ উপকারক। স্নানবীয় শিরঃপীড়াতে ইহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা বিলক্ষণ উপকার হয়।"

"পুরাতন বাত ও গাউট্ রোগে ইহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা বিলক্ষণ উপকার হয়। ৫।৬ মিনিম্ মাত্রায় সেবন করিবে এবং রোগস্থানে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে।"

"দন্তক্ষতে দন্তগহ্বর মধ্যে এই তৈল ১ বিন্দু প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গে এবং কোনস্থান থেৎলাইয়া বা মোচ্‌কাইয়া গেলে সেই স্থানে ইহা মর্দ্দন করিলে উপকার হয়। মাত্রা ১ মিনিম্ হইতে ৫ মিনিম্ পর্য্যন্ত।"

প্রয়োগ-রূপ।—ল্যাটিন স্পিরিটস্ ক্যাজুপট, স্পিরিট অব্ ক্যাজুপট, অয়েল অব্-ক্যাজুপট—১ ঔন্স এবং শোধিত সুরা—৯ ঔন্স্ দ্রব করিয়া লইবে। মাত্রা ১০ মিনিম্ হইতে ১ ড্রাম। (সময়)

শাক ও ডাঁটা ইত্যাদির আবাদ।

মিষ্ট ডেঙ্গ ডাঁটা।

মিষ্ট ডেঙ্গ ডাঁটার পরিচয় বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে আর বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। ইতর ভদ্র সকলেই ডেঙ্গ-ডাঁটার সহিত বিশেষরূপে পরিচিত। আমরা অদ্য এই সুপরিচিত ডেঙ্গ-ডাঁটার আবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ডেঙ্গ-ডাঁটার আবাদ প্রায় সকল স্থানে ও সকল প্রকার ক্ষেত্রেই হইতে

পারে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও দোআঁশ জমী পাইলেই ডেঙ্গোর আবাদ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। উচ্চ ও দোআঁশ ক্ষেত্রের ডেঙ্গো যেরূপ সুস্বাদু হয় অন্য ক্ষেত্রের ডাঁটা সেরূপ মিষ্ট বা সুস্বাদু হয় না।

"ডেঙ্গো" আবাদ করিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক। ডেঙ্গোর ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় ৫ মণ সরিষা বা তিসির খইল অথবা ৪ চারি মণ করিয়া রেড়ীর খইল দিলেই যথেষ্ট হয়। মাঘ মাসের শেষে কিম্বা ফাল্গুন মাসের প্রথমে ক্ষেত্রে একবার বা দুইবার চাষ দিয়া উহাতে উপরোক্ত পরিমাণে খইল ছড়ান আবশ্যক। খইল ছড়াইবার পর পুনরায় দুই তিনবার চাষ দিতে হইবে এবং ক্ষেত্র হইতে ঘাস প্রভৃতি মারিয়া ক্ষেত্রকে বীজ বপনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। অনন্তর চৈত্র মাসের শেষে কিম্বা বৈশাখ মাসের প্রথমে বৃষ্টিপাত হইতে প্রস্তুত ক্ষেত্রের উপর ডেঙ্গোর বীজ বপন করিতে হইবে। বীজ খুব সাবধানতার সহিত জমীর উপর ভাসা ভাসা ভাবে বপন করা কর্ত্তব্য। প্রতি বিঘায় ২০ কুড়ি হইতে ২৫ পঁচিশ তোলা পর্য্যন্ত বীজ বপন করিলেই যথেষ্ট হইবে। বীজ বপন করিবার পর ক্ষেত্রে আর একবার একপালা মই দেওয়া কর্ত্তব্য। বীজ বপন করিবার পর ক্ষেত্রে খুব আল্‌গা ভাবে মই দিবে, এই জন্য মইএর উপর একজন হাল্‌কা লোক চড়িয়া অতি দ্রুত গতিতে মই দেওয়া আবশ্যক।

ডেঙ্গোর বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যখন চারা হইতে দুই তিনটী করিয়া পাতা বাহির হইবে তখন ক্ষেত্রে একবার নিড়ান দিয়া উহাতে যে দুই একটী ঘাস বাহির হইবে তাহা তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। যদি বীজ বপনের পর এবং বীজ হইতে চারা বাহির হইবার পূর্ব্বে বৃষ্টিপাত হয় এবং এই বৃষ্টিপাত জন্য জমীর উপরে মৃত্তিকা জমিয়া কঠিন হইয়া যায় তাহা হইলে জমীর সমস্ত স্থান রীতিমত খুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ বৃষ্টির দ্বারা জমীর উপরের মৃত্তিকা কঠিন হইয়া যাইলে ভূমির মধ্যস্থ বীজ উপরের কঠিন জমী ভেদ করিয়া কিছুতেই অঙ্কুরিত হইতে সমর্থ হইবে না। অতএব যখনই বীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে বৃষ্টিপাত হইয়া জমীর উপরের মৃত্তিকা কঠিন হইয়া উঠিবে, তখনই সমস্ত জমী উত্তমরূপে খুসিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়।

ক্রমশঃ—

কৃষিতত্ত্ব।

(কৃষি-বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র)

১ম খণ্ড। } চৈত্র ১৩০৬ সাল। {৩য় সংখ্যা।

সম্পাদকীয় উক্তি।

রেশম ও তাতাসাহেব। বোম্বাই সহরের বিখ্যাত পার্শীবণিক মহাত্মা তাতাসাহেব রেশম ব্যবসায়ের উন্নতি কল্পে মহীসুর রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া বোম্বাই প্রত্যাগমন করিয়াছেন। দুইটী জাপানী লোকদ্বয়ের তিনি সেরিকলচার সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি ঐ পরীক্ষায় বিশেষ কৃত-কার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। পরীক্ষিত প্রণালীমত কার্য্য করিলে রেশমের যথেষ্ট উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে। তিনি এই উদ্দেশ্যে কুঠি খুলিবার জন্য ভূমি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

তাড়িৎ বৃক্ষ। নিউগিনির উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অনেকগুলি তাড়িৎ বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অদ্ভুত বৃক্ষের নিকট কম্পাস্ লইয়া যাইলে কম্পাসের কাঁটা নড়ে চড়ে না। কোনও ব্যক্তি এই বৃক্ষের কোনও অংশ স্পর্শ করিলেই বৃক্ষস্থিত তাড়িতের তেজে তখনই অচেতন হইয়া পড়ে।

বীজরক্ষার নূতন উপায়। বীজবপন করিলে তাহার অধিকাংশই পাখীতে খাইয়া যায় ইহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। সিসা হইতে যে লাল রং প্রস্তুত হয়, তাহা বীজে মাখাইয়া রোপণ করিলে আর পাখীতে খাইয়া যাইতে পারে না। ইহাতে বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তির বা উৎপন্ন বৃক্ষের তেজের কিছুই হানি হয় না। বীজগুলি একটী কড়াতে রাখিয়া অল্প পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া উহার উপর রং ছড়াইয়া দিলেই ঐ রং বীজের গাত্রে লাগিয়া যাইবে। ঐ রং পক্ষীদিগের পক্ষে বিষাক্ত এবং এই জন্যই কোনও পক্ষী ঐ রং মাখান বীজ স্পর্শ করে না।

উদ্ভিদ জগতে অদ্ভুত কাণ্ড। উদ্ভিদ জগতে কত যে অদ্ভুত বস্তু আছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? বৃক্ষের সাধারণ নিয়ম এই যে, উপযুক্ত জল, মৃত্তিকা ও আলোক না পাইলে উহা বর্দ্ধিত হয় না। কিন্তু কেবলমাত্র জলদ্বারা বৃক্ষ বৃদ্ধি পায় ও পুষ্প প্রসব করিতে থাকে, ইহা শ্রবণ করিলে কে না আশ্চর্য্যান্বিত হয়? "হায়সিন্থ্"* নামক এক প্রকার বৃক্ষের মূল আছে। উহা কেবলমাত্র একটী কাচের পাত্রে রাখিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিলে এমন কি গৃহের অভ্যন্তরে টেবিল প্রভৃতির উপর রাখিলেও ঐ মূল হইতে সুন্দর সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত করিতে পারা যায়। এই মূলের নিম্নভাগে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় থাকে কেবল তাহাই যেন জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারে এইরূপ ভাবে রাখিতে হইবে। "হায়সিন্থ্" পুষ্প দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। এই পুষ্প টবেও হইতে পারে কিন্তু ক্ষেত্রে হয় না।

চাষ সম্বন্ধে অদ্ভুত কুসংস্কার। চাষ সম্বন্ধে চাষাদিগের মধ্যে নানাবিধ অদ্ভুত কুসংস্কার সকল দেখিতে পাওয়া যায়। মেদিনীপুর জেলার কোনও কোনও স্থানের চাষীরা কুলিবেগুণের চারা নিজে রোপণ না করিয়া যে সকল স্ত্রীলোকের হাতে পেঁছা (গহনা বিশেষ) আছে তাহাদিগের দ্বারাই চারা রোপণ করাইয়া লয়। স্ত্রীলোক দ্বারা সমস্ত ক্ষেত্রে চারা রোপণ করার সুবিধা না হইলে অন্ততঃ কিছু পরিমাণ চারাও স্ত্রীলোকদ্বারা রোপণ করাইয়া লয়। এইরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই চাষাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস এই যে স্ত্রীলোকের হস্তের পেঁছার যেরূপ গড়ন এবং উহা যেরূপ ঘন গাঁথা থাকে, ক্ষেত্রস্থ বেগুণও সেইরূপ ঘন ঘন ও থলো থলো ফলিয়া থাকে। মোট কথা স্ত্রীলোকের হস্তের পেঁছার সহিত বেগুন ফলনের যে কোনও সম্বন্ধ নাই তাহা অনভিজ্ঞ কৃষককুল কিছুতেই বুঝিতে পারে না। উপযুক্ত নিয়মানুসারে আবাদ করিলেই বৃক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ ফল ফলিতে পারে, অন্য কোনও উপায়ে ফলোৎপাদন করা যায় না।

খড় হইতে কাগজ প্রস্তুত। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ধান্যের চাষ হইয়া থাকে। ধান্য কাটিয়া লইবার পর খড়গুলি কেবলমাত্র গরু প্রভৃতি জন্তুদিগকে আহার করান হয় এবং অনেক খড় ব্যব-

* এই বৃক্ষ আমাদের নর্শরিতে পাওয়া যায়।

হারে না আসিয়া নানা প্রকারে নষ্ট হইয়া যায়। খড় হইতে উত্তমরূপ কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে কাগজের কল নাই। কোনও দেশীয় ধনী ব্যক্তি বা সমিতি মান্দ্রাজে একটী কাগজের কল খুলিলে বিশেষরূপে লাভবান হইতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে ধনী ব্যক্তিদিগের এ বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ নাই।

তিল।

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

ফরিদপুর—এখানে নিম্নভূমিতে শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে তিল বুনে ও অগ্রহায়ণ কিম্বা পৌষমাসে কাটে। উচ্চ জমীতে মাঘ ও ফাল্গুনমাসে তিল বুনিয়া থাকে ও আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে কাটে।

রঙ্গপুর—এখানে শ্রাবণ, ভাদ্রে তিল বুনিয়া থাকে, অগ্রহায়ণ পৌষমাসে কাটে; উচ্চ জমীতেই ফসল ভাল হইয়া থাকে। কলাইয়ের সঙ্গে একত্রে তিল বুনিয়া থাকে। ইহারা জমীতে চারিবার চাষ ও দুইবার জালি টানিয়া দেয়। এখানে প্রতি বিঘায় প্রায় ১॥০ কি ২/০ মণ তিল জন্মে। রক্ত বা আউস তিল এখানে অতি অল্পই চাষ হইয়া থাকে।

মেদিনীপুর—এখানে কৃষ্ণতিল আষাঢ়, শ্রাবণমাসে বপন করে ও ভাদ্রমাসে কাটে।

আসাম—আসামের চাষ বাঙ্গালারই মত।

ব্রহ্ম—ব্রহ্মদেশে তিলের চাষ অত্যন্ত কম হইয়া থাকে।

মধ্যভারত—এখানে তিলের চাষ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে, শরৎ ও বসন্ত উভয়কালেই এখানে তিল হয়, শরৎকালের তিলকে ইহারা "মুঘেই" ও বসন্তের তিলকে "হাউড়ি" তিল বলে। এখানে জমীর বড় একটা পাইট করিতে হয় না, দুই একবার লাঙ্গল দিয়াই পাট শেষ করে, পরে কেবল একবার নিড়াইয়া দেয়। এখানে অতি জঙ্গলী জমীতেও চাষারা জঙ্গল সাফ্ করিয়া চাষ করে। ফসলও মন্দ হয় না, প্রতি বিঘায় প্রায় ৩/০ মণ তিল হইয়া থাকে ও প্রায় ২॥০, ৩৲ টাকায় বিক্রয় হয়, খরচাও কম, বিঘা করা

জোর এক টাকা মাত্র। এখানে /১০ সের তিলে /৩॥০ সের তৈল ও /৬॥০ সের খোল হয়। ঘানি খরচা ।৵১০ সাড়ে সাত আনার উর্দ্ধ নহে। এখানকার ঘানি হইতে তৈল ও খইল পৃথক হইয়া বাহির হইবার বন্দোবস্ত নাই। খোল ও তৈল একত্রে ঘানির ভিতর থাকে, জল দিয়া পৃথক্ করিয়া লয়, সেই জন্য এখানকার তৈল অতিশয় অপরিষ্কার হইয়া থাকে। আজকাল আমাদের দেশ হইতে অনেক ঘানি এদেশে গিয়াছে এবং সেই জন্য এক্ষণে তৈলও অনেক পরিষ্কার বাহির হইয়া থাকে।

তূদ বা তুঁত।

(২১ পৃষ্ঠার পর)

গুটীর জন্য তুঁতগাছের বিশেষ আদর হইয়া থাকে। একটু মনোযোগের সহিত চাষ করিলে তুঁতগাছ যেখানে সেখানে হইতে পারে। তবে তুঁতগাছের পাইট করা কিছু শক্ত। এই গাছের পাইট করিতে হইলে একটু বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক। এদেশে যেরূপে লাঙ্গল দেয়, তাহাতে বড় সুবিধা হয় না।

চাষ—বর্ষার শেষে, আশ্বিন, কার্ত্তিকমাসে সরস মাটিতে কোদালি দিয়া ১ ফিট কিম্বা ১॥০ দেড় ফিট আন্দাজ গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া আবর্জ্জনাদি অর্থাৎ ইট, নুড়ি যাহা থাকিবেক সমস্ত বাছিয়া ফেলিতে হইবেক। তৎপরে একবার উত্তমরূপে লাঙ্গল দিবে ও মই দিয়া জমী চৌরস করিয়া ফেলিবে। যদ্যপি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে জমীতে ভাল করিয়া জল দেওয়া আবশ্যক অর্থাৎ জমী যাহাতে শুষ্ক না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

উক্তরূপে জমী তৈয়ার করতঃ এক হাত অন্তর এক ফিট্ গভীর করিয়া সারি সারি গর্ত্ত খনন করিবে।

তৎপরে তুঁতের ডাল কাটিয়া একটী তাড়া বাঁধিয়া পুষ্করিণীর ধারে পাঁকে পুঁতিয়া রাখিবে। তুঁতের ডাল কাটিতে হইলে তীক্ষ্ণছুরীর আবশ্যক। বড় গাছ হইলে আগা হইতে কিম্বা সরু ডাল লইবে না।

ডালগুলি পাঁকেতে প্রায় একমাসকাল পুঁতিয়া রাখিতে হইবে ও মাঝে মাঝে জল ছিটা দিবে। বেশী জল লাগিয়া যাহাতে পচিয়া না যায় সে বিষয়

লক্ষ্য রাখিবে। পরে যখন দেখিবে যে ডালগুলি হইতে দুই একটী নবীন অঙ্কুরোদগম হইয়াছে তখন উহা আনিয়া এক একটী গর্ত্তে দুই তিনটী করিয়া ডাল রোপণ করিবে। রোপণ করিয়া মাটি চাপা দিয়া ঈষৎ জলসিঞ্চন করিবে। কিন্তু বিশেষ সাবধান যেন অঙ্কুরগুলি মাটির চাপে না ভাঙ্গিয়া যায়।

যতদিন পর্য্যন্ত না শিকড় গজায় ততদিন পর্য্যন্ত সপ্তাহে দুইবার করিয়া জলসিঞ্চন করিবে। পরে গাছ যখন এক হাত আন্দাজ লম্বা হইবেক, তখন সমস্ত ক্ষেত্র জলে ডুবাইয়া দিবে। সপ্তাহ পরে কোদালি দিয়া গর্ত্তের উপরের মাটি গাছের চারিদিকে বেশ করিয়া চারাইয়া দিতে হইবে। গাছ বড় হইলে আর বড় জল দিবার আবশ্যক করে না। তবে একমাস দেড়মাস অন্তর একবার করিয়া জল দিলেই চলিতে পারে। ফাল্গুন, চৈত্র নাগাদ তুঁতের পাতা ছিঁড়িতে পারিবে। প্রথম প্রথম বেশী পাতা ছেঁড়া উচিত নয়। গাছ খুব বড় হইলে তখন আর বিশেষ ক্ষতি হয় না।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠমাসে ক্ষেত এক একবার কোদলাইয়া আগাছাগুলি বাছিয়া দেওয়া আবশ্যক। পল্লব ছিড়িবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রে একবার পুষ্করিণীর পাঁক আনিয়া সার দিতে হইবে। প্রতি বিঘায় অন্ততঃ ৩০০ তিনশত মণ পাঁক দেওয়া আবশ্যক, পরে পাঁক শুকাইয়া গেলে কোদলাইবার সময় মাটির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। প্রতি তিন বৎসর অন্তর ক্ষেত্রে উক্তরূপ সার দেওয়া আবশ্যক। এক একটা গাছ দশ বার বৎসর পর্য্যন্ত থাকে, তৎপরে কাটিয়া ফেলা হয় ও তাহার শাখা প্রশাখা সকল পুঁতিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে পুনরায় নূতন গাছ জন্মায়। ৫ বৎসর পর্য্যন্ত সেগুলি রাখা হয়। তৎপরে আবার নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

*বিবিধ—চীনদেশে বহুকাল হইতে তুঁতের অংশুদ্বারা কাগজ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। "মার্কোপেলে" আপনার ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই অংশুজাত কাগজকে কাপাসজাত কাগজের মত লিখিয়া গিয়াছেন।

তুঁতের পাতা গাভীর পক্ষে অতি পুষ্টিকর জিনীষ। প্রত্যহ একটী গাভীকে দুই বেলা দুই সের করিয়া তুঁতের পাতা খাওয়াইলে গাভী দ্বিগুণ দুগ্ধ দিয়া থাকে, অথচ গাভীও বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হয়। তুঁত কাষ্ঠ বেশ শক্ত; আসামে ইহার দ্বারা নৌকার দাঁড় ও অস্বাবাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তুঁতফলে একপ্রকার

বেশ সুগন্ধ আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মতে তুঁতফলের গুণ শীতল তৃষ্ণানাশক, মৃদু-বিরেচক, জ্বরঘ্ন। ইহার ত্বক্ ক্রমিনাশক ও অতি বিরেচক। মূল—ক্রমিনাশক ও সঙ্কোচক। কণ্ঠপ্রদাহে ফলের রসে কুলী করিলে অনেকটা উপকার হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতেও ইহার অনেক গুণ আছে।

দেশ ভেদে তুঁতের ভিন্ন ভিন্ন নাম।*

বাঙ্গালায়—তুঁত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে—তুত, তুৎরি। আসামে—হুনি বা বোলা। নেপালে—কিম্বু বা ছোটা কিম্বু। পঞ্জাবে—তুত, তুতরি বা করণ। বোম্বাইয়ে—তুত, তুৎরি, আম্বর, সেতর বা তুলা-আম্বর। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে—তুৎ। কর্ণাটে—হিপ্পল-নেরলি। তৈলঙ্গে—কম্বলি বা কশ্বলি বুচি। দ্রাবিড়ে—কম্বিলিপুচ বা মহুকত্তাই। আরব্যে ও পারস্যে—তুঁত বা শহ্-তুৎ। সংস্কৃতে—তূদ।

আমেরিকান সুবৃহৎ লঙ্কা।

আমাদের দেশে লঙ্কার ব্যবহার ও রোপণ প্রণালী কাহারও অবিদিত নাই। বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই বহুল পরিমাণে লঙ্কা উৎপন্ন হইয়া থাকে। লঙ্কা

---

* বিশ্বকোষ।

আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। আমরা অদ্য দেশীয় লঙ্কার বিষয়ে কিছুই না বলিয়া আমেরিকান লঙ্কার বিষয় পাঠকবর্গের গোচরে আনিব। এ দেশে আমরা যত প্রকার লঙ্কার আবাদ করিয়া থাকি, তাহার মধ্যে এই প্রবন্ধোক্ত লঙ্কাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। লঙ্কাগুলি কিরূপ বৃহৎ আকারের হইয়া থাকে তাহা শীর্ষস্থ চিত্র দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। আমেরিকার প্রসিদ্ধ বীজবিক্রেতা "ল্যানড্রেথ্" কোম্পানির নিকট হইতে আমাদের নর্শরির জন্য আমরা প্রতি বৎসর এই লঙ্কার বীজ আনয়ন করিয়া আমাদের গ্রাহকবর্গের সন্তোষ সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আমাদের দেশে এই লঙ্কার আবাদ বিস্তারিতরূপে করিতে পারিলে উপকার হইতে পারে। দেশীয় লঙ্কাবিশেষের ন্যায় ইহা তীব্র ঝালবিশিষ্ট নহে। এই লঙ্কা দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। "বার্ডাস্‌আই" লঙ্কা, "চেরিসেপ্ট" অর্থাৎ চেরী আকারের লঙ্কা "লংরেড্" অর্থাৎ লম্বা লালবর্ণের লঙ্কা প্রভৃতি নানাবিধ লঙ্কার বীজ আমেরিকা হইতে আনীত হইয়া এদেশে উহাদের বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে।

দেশীয় লঙ্কার আবাদ প্রণালীর ন্যায় এই আমেরিকান লঙ্কার আবাদ প্রণালী। এক জমীতে অধিক দিন ধরিয়া লঙ্কার চাষ করিলে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। এই নিমিত্ত প্রতি বৎসর এক জমীতে ইহার চাষ করা অনুচিত। লঙ্কাক্ষেত্রের উর্ব্বরাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ক্ষেত্রে বৎসর বৎসর সার দেওয়া কর্ত্তব্য। যে কোনও শস্যাদির চাষ হউক না কেন ভূমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সার দিলে অধিক ফসল উৎপন্ন হয় ইহা প্রত্যেক চাষীরই সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ গোবরের সার দিলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে একটী স্থানে বীজ পাতো দিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয়। এই স্থানে মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প জলসিঞ্চন করা আবশ্যক। পাতো দিয়া চারা ৪।৫ অঙ্গুলি বড় হইলে উহা তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করা কর্ত্তব্য।

ক্ষেত্রে লঙ্কার চারা এক হস্ত অন্তর রোপণ করিলে ভাল হয়। গাছে পোকা লাগিলে ছাই দিলেই পোকা নষ্ট হইয়া যায়। পৌষমাস হইতে গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। লঙ্কাগুলি কাঁচা অবস্থায় সবুজবর্ণের থাকে কিন্তু সুপক্ক হইলে গাঢ় লালবর্ণে পরিণত হইয়া বৃক্ষের শোভা বৃদ্ধি করিতে থাকে।

শাক ও ডাঁটা ইত্যাদির আবাদ।

(৪৮ পৃষ্ঠার পর)

মিষ্ট ডেঙ্গ ডাঁটা।

ইহার পর যখন চারা হইতে আট দশটী করিয়া পাতা বাহির হইবে, তখন দেখিতে হইবে ক্ষেত্রের সকল স্থানে সমান ভাবে চারা জন্মিয়াছে কি না। অর্থাৎ কোনও স্থানে ঘন ও কোনও স্থানে পাতলা ভাবে চারা বাহির হইলে ঘন স্থান হইতে চারা তুলিয়া পাতলা স্থানে চারা বসাইয়া দিতে হইবে। মোট কথা প্রত্যেক চারা এক হস্ত অন্তর রোপণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। "ডেঙ্গোর" গাছগুলি খুব কাছাকাছি রোপণ করিলে, গাছের তেমন তেজ হয় না ও ডাঁটা তেমন মিষ্ট ও সুস্বাদু হয় না।

উপরোক্ত প্রকারে চারা সকল এক হস্ত অন্তর রোপণ করিবার পর যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে ক্ষেত্রে একবার জলসিঞ্চন করা কর্ত্তব্য। ক্ষেত্রে জল না দিলে রৌদ্রের তেজে চারাগুলি শুখাইয়া একবারে মারা যাইতে পারে। যখন চারাগুলি নূতন স্থানে বসাইবার পর জমীতে ধরিয়া যাইবে ও নূতন পাতা বাহির হইবে তখন গাছের মধ্যে মধ্যে কোদালি দ্বারা অল্প অল্প কোপাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ডেঙ্গোর ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ বৃষ্টির জল জমিলে উহা ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

ডেঙ্গো ডাঁটা অন্যান্য মূল্যবান সবজীর সহিত তুলনায় অকিঞ্চিৎকর হইলেও আমাদের দেশে কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই ইহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ভোগ করিয়া থাকেন। ডেঙ্গো ডাঁটা বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিন মাসের শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ডেঙ্গোর বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে ভাদ্র মাসের পর গাছ হইতে বাছিয়া বাছিয়া উত্তম পাকা বীজ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

করমশাক।

করমশাকের সহিত আমাদের সহৃদয় পাঠকগণ বিশেষরূপে পরিচিত আছেন কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারিলাম না; কারণ বাঙ্গালায় ইহার চলন খুব কম।

করমশাক কোপিজাতীয় একপ্রকার শাক বিশেষ; ইহার ইংরাজী নাম (Colewart) কোলওয়ার্ট এবং বৈজ্ঞানিক মতে ইহাকে (Brassica Oleracea) বলিয়া থাকে। ইহার পাতা ও ডাঁটা উভয়ই তরকারিতে ব্যবহৃত হয়। কাশ্মীর প্রদেশে ইহার বহুল পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে। করমশাক দেখিতে ঠিক্ ফুলকপির চারাগাছের ন্যায়, খাইতেও বেশ সুস্বাদু। চৈত্রমাসের শেষাশেষী কিম্বা বৈশাখমাসের প্রথমে ইহার বীজ বপন করিবার উপযুক্ত সময়; ইহার চাষ যদিও বিশেষ কিছু শক্ত নহে বটে, কিন্তু তত্রাচ শাক রোপণ করিবার জন্য সচরাচর চাষিরা যেরূপ জমী প্রস্তুত করিয়া থাকে সেইরূপ করিলেই ভাল হয়। বীজ বপন করিবার পর চারাগুলি যখন ৫।৬ ইঞ্চি আন্দাজ বড় হইবেক, তখন তাহাদিগকে তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করা আবশ্যক। দেড়মাস দুইমাসের মধ্যেই চারাগুলি বেশ উপযুক্ত হইয়া উঠে। কাশ্মীরিগণ এই সময় গাছের নিম্ন হইতে পত্র ভাঙ্গিয়া লইয়া ৭।৮টী করিয়া এক একটী তাড়া বান্ধে ও বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিয়া থাকে।

করমশাক একবার ক্ষেত্রে রোপণ করিলে আশ্বিন, কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে শাক সংগ্রহ করিতে পারা যায়। এক বিঘা জমীতে করমশাক রোপণ করিলে, প্রত্যহ প্রায় এক টাকা কিম্বা দেড়টাকার শাক বিক্রয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহার চাষে কিছু শক্তকাজ নাই, তবে চারাগুলি বসাইবার পর হইতে গোড়াগুলি দুই একবার খুঁড়িয়া দেওয়া ও জলসিঞ্চন করা আবশ্যক।

অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে শীতের প্রাদুর্ভাব বশতঃ আর পাতা নির্গত হয় না, এই কারণ তখন কৃষাণরা উহার ডাঁটাগুলি কাটিয়া বাজারে বিক্রয় করে। কাশ্মীরে অনেক গৃহস্থ লোকে ইহার চাষ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে অনেকে ঐ সময়ে ডাঁটা আদৌ কাটে না। সুতরাং ডাঁটাগুলি শীত ঋতুতে

বরফে ঢাকিয়া যায় এবং চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকে। পরে চৈত্রমাসে বরফ গলিয়া গেলে ডাটাগুলি ঠাণ্ডায় ফুলিয়া উঠে ও তখন উহা খাইতেও অধিকতর সুস্বাদু হয়।

চাঁপানটে শাক।

চাঁপানটে শাক বঙ্গীয় পাঠকবর্গের বিশেষ পরিচিত বস্তু ; সুতরাং বিস্তারিত বর্ণনার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। চাঁপানটে শাক প্রায় সকল প্রদেশের সকল প্রকার ক্ষেত্রেই উৎপন্ন হইতে পারে। চাঁপানটে শাক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম আউশ বা আসু এবং ২য় আমন। আমন শাকের বীজ কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে বপন করিতে হয় এবং আউশ শাকের বীজ ফাল্গুন, চৈত্র কিম্বা বৈশাখ মাসে বপন করিতে হয়। কিন্তু কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ বা চৈত্র, বৈশাখ মাসের আবাদ অপেক্ষা ফাল্গুন মাসের আবাদেই বেশী লাভ হইবার সম্ভাবনা। তবে বৈশাখ মাসের আবাদ অপেক্ষা ফাল্গুন মাসের আবাদে ব্যয় কিছু অধিক পড়িয়া যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বৈশাখ মাসে আবাদ করিলে ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করিয়া জল সিঞ্চন করিতে হয় না ; বৃষ্টির জলেই যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে ফাল্গুন মাসে বীজ বপন করিলে অর্থ ব্যয় করিয়া ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন না করিলে চলে না ; সুতরাং ব্যয়ও কিছু বেশী পড়িয়া যায়।

ফাল্গুন মাসের আবাদে অধিক লাভ হইবার প্রধান কারণ এই যে, ঐ সময়ে বাজারে অন্যান্য তরকারি ভালরূপ পাওয়া যায় না এবং তজ্জন্যই ঐ সময়ে চাঁপানটে শাকের বিশেষ আদর ও অধিক মূল্য হইয়া থাকে। এই সময়ে ছোট বড় মধ্যবিদ্ সকল শ্রেণীর ব্যক্তিরাই প্রায় চাঁপানটে শাক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ফাল্গুনে চাঁপানটে আবাদ করিতে হইলে বারমেসে জমী আবশ্যক। ঐ জমীতে পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস উত্তমরূপে চাষ দিয়া জমীর সমস্ত ঘাস ও আগাছা নষ্ট করিতে হইবে। পরে একবার বা দুইবার মই দিয়া ক্ষেত্রের ঢেলা মাটিগুলি গুঁড়া করা আবশ্যক। ঐরূপে জমীর পাট করিবার পর উহাতে উপযুক্ত পরিমাণ সার দিতে হইবে। ভেড়ার নাদির সার হইলে প্রতি বিঘায়

দুই গাড়ি এবং গোবরের সার হইলে প্রতি বিঘায় তিনগাড়ি দেওয়া আবশ্যক। জমীতে সার ছড়াইবার পর উহাতে দুই তিন বার লাঙ্গল দিয়া কিম্বা কোদাল দ্বারা কোপাইয়া সারগুলি ক্ষেত্রের মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে। উপরোক্ত প্রকারে সার মাটির সহিত যথাযথভাবে মিশ্রিত হইলে উহাতে দুই তিন বার মই দেওয়া আবশ্যক।

জমী এই প্রকারে মই দিয়া সমান করিবার পরই জমীর ঢালু দিক স্থির করিয়া এবং এই ঢালু দিক লম্বা দড়ি ধরিয়া প্রতি আড়াই হস্ত অন্তর এক একটী আইল প্রস্তত করিতে হইবে। আইলগুলি দীর্ঘে অর্দ্ধ হস্ত ও প্রস্থে সিকি হস্ত হইলেই চলিবে। আইল প্রস্তত হইবার পর আইলের মধ্যস্থিত জমীতে ভাসা ভাসা কোদাল দিয়া একবার কোপাইয়া পরে হস্ত দ্বারা মাটি গুলি চালিয়া সমান করা কর্ত্তব্য। দুইটী আলের মধ্যস্থিত জমিকে পটি জমী বলে। উপরোক্ত প্রকারে প্রস্তুত পটি জমীর উপর প্রতি বিঘায় ৪০ চল্লিশ তোলা হিসাবে "চাঁপা-নটের" বীজ বপন করিতে হইবে। যে পরিমাণ বীজ লইবে তাহার সহিত তাহার তিন গুণ পরিমাণ শুষ্ক মাটি লইয়া বীজের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। এই মাটি মিশ্রিত বীজই ক্ষেত্রে বপন করা কর্ত্তব্য।

শাকের বীজের সহিত মাটি মিশ্রিত করিয়া বপন করিবার কারণ এই, চাঁপানটে শাকের বীজ অতি ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ, হস্তে করিয়া বপন করিবার সময় ক্ষেত্রের কোথাও ঘন এবং কোথাও পাতলা হইয়া পড়িল বুঝিতে পারা যায় না। এইজন্য কিছু শুষ্ক গুড়া মাটি ঐ বীজের সহিত মিশ্রিত করিয়া বপন করিলে ঐ বীজ গুলি চিহ্নরূপে স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতে পারে, এবং তাহাতে ক্ষেত্রের কোন্ স্থানে ঘন এবং কোন্ স্থানে পাতলা হইতেছে তাহা বেশ বুঝা যায়। বীজ বপন করার পর নিড়ানের অগ্রভাগ দ্বারা সমস্ত ক্ষেত্র খুঁড়িয়া হস্তদ্বারা সমস্ত মাটি সমান ভাবে চারাইয়া দেওয়া আবশ্যক। মাটি যদি অত্যন্ত শুষ্ক প্রায় বোধ হয় তাহা হইলে ঐ বীজের উপর বোমাদ্বারা ও অন্য কোনও উপায়ে জলের আছড়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু উপরোক্ত প্রকারে জল দিবার পূর্ব্বেই যদি বীজ গুলি অঙ্কুরিত হয় তাহা হইলে সেই সময় একবার জলসিঞ্চন দ্বারা ক্ষেত্র ভিজা-ইয়া দেওয়া আবশ্যক।

উপরোক্ত প্রকারে চাঁপানটের আবাদ করিলে ২০।২৫ দিনের মধ্যেই শাক

গুলি খাদ্যোপযোগী হইয়া উঠে। শাকের গাছগুলি ৫।৬ ইঞ্চ লম্বা হইলে উহা উপার দিকে দুই ইঞ্চ বাদ দিয়া কাটিয়া লওয়া উচিত। যে দিন শাক কাটিয়া লইবে ঠিক সেই দিনই ক্ষেত্রে একবার জল সিঞ্চন করা বিশেষ কর্ত্তব্য। কারণ শাক কাটিয়া লইলে গাছ হইতে একপ্রকার আটা বাহির হয়, ঐ আটা জল দ্বারা ধৌত না করিয়া দিলে উহাতে একপ্রকার পোকা লাগিয়া সমস্ত গাছ নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

কদলী অর্থাৎ কলা।

উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, আবাদ প্রণালী, গুণ, দেশভেদে কতপ্রকার নাম, দেখিতে কিরূপ, কোথায় পাওয়া যায় ও তাহাদিগের বিবরণ।

ভারতবর্ষই কলার আদিস্থান। ইহার সংস্কৃত নাম কদলী, বারণবুষা, সুফলা গুচ্ছফলা, সকৃৎফলা, হস্তিবিষাণী, বারণবল্লভা, অংশুমৎফলা, ত্বক্‌পত্রী, বালকপ্রিয়া, বনলক্ষ্মী ইত্যাদি। ইহা হস্তির অতিশয় প্রিয় খাদ্য বলিয়া ইহার নাম "বারণবল্লভা", চর্ম্মের ন্যায় চওড়া পাতা বলিয়া "ত্বকপত্রী", রৌদ্র ভিন্ন আদৌ জন্মিতে পারে না বলিয়া ইহাকে "অংশুমৎফলা" বলে; বনের মধ্যে অন্যান্য বৃক্ষ সমূহের নিকট কদলীবৃক্ষ থাকিলে অতি সুন্দর দেখায় বলিয়া "বনলক্ষ্মী" বলা হয়: এইরূপ প্রত্যেক নামেরই এক একটী অর্থ আছে দেখা যায়। এদেশে কলা নানা কর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা জন্মেও অধিক, প্রায় সকল ঋতুতেই ইহার ফল দেখিতে পাওয়া যায়, তবে গ্রীষ্ম কালেই অধিক হয়, আর গ্রীষ্মকালের ফল অধিকতর কোমল ও সুস্বাদু হয়। কলা দেশভেদে অনেক প্রকার। চট্টগ্রাম প্রদেশে একপ্রকার কাঁচকলা আছে (Musa Sapientum) তাহার বীজ হয়; ঐ বীজ হইতে গাছ উৎপন্ন হয়। অন্য কোন কোন জাতীয় কলায় বীজ জন্মে বটে, কিন্তু তাহাতে গাছ হয় না। পাশ্চাত্য প্রদেশে কলা খুব কম হয়, কারণ সেখানের কঠিন মাটির রস টানিয়া নিজের পুষ্টি সাধন করিতে অক্ষম হয়।

পার্ব্বত্য কলায় তেউড় হয় না বলিয়াই ঐ সকল কলাগাছে বীজ জন্মে। বীজগুলির উপর পাতলা সরেরন্যায় একপ্রকার কোমল চটচটে পদার্থ দৃষ্ট হয়,

ঐ পদার্থ খাইবার নিমিত্ত বহুদূর হইতে পক্ষীরা আসিয়া থাকে এবং ঐ পক্ক ফল লইয়া যায়। করুণাময় জগদীশ্বরের সবই আশ্চর্য্য মহিমা! ঐ সকল পক্ক ফল লইয়া পক্ষীরা বহু দেশদেশান্তরে গমন করে ও তথায় ভক্ষণ করিয়া থাকে। এইরূপে সেই সকল স্থানে বীজ পড়িয়া গাছ উৎপন্ন হয়।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থলে কলার আবাদ হইয়া থাকে। আবাদী কলায় বীজ হয় না বলিয়া উত্তরোত্তর ফলের বৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে থাকে। আবাদের গুণে ভাল ভাল কলায় আর আদৌ বীজ হয় না। ইহাদিগের বীজোৎপাদিনী শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তত্রাপি কোন কোন স্থানে জল বায়ুর প্রভাবে আবাদ করিলেও সহজে ইহার বীজোৎপাদিনী শক্তি নষ্ট হয় না। "জবদ্বীপের" জল বায়ুতে দু একবারের আবাদে বীজ হয় না বটে, কিন্তু তৃতীয় আবাদেই বীজ হইতে দেখা যায়। বাঙ্গালায় "কাঁঠালি" কলা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু তত্রাপি এখনও ইহার বীজোৎপাদিনী শক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালায় কাঁঠালিকলার ঝাড় বেশী পুরাতন হইলেই ইহাতে প্রায় বীজ হইতে দেখা যায়, সেই নিমিত্ত তেউড়গুলি বেশী ঝাড় বাঁধিতে দিতে নাই। তেউড়গুলি লইয়া অন্য স্থানে পুঁতিয়া কলার উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য। যে কোন জাতীয় কলাগাছ হউক না কেন বেশী ঝাড় বাঁধিতে দিতে নাই কারণ তাহা হইলে গাছের তেজ শক্তির হ্রাস হয়। দুই চারিটা তেউড় হইবামাত্র অন্য স্থানে নাড়িয়া লাগান কর্ত্তব্য।

কলাগাছের বাড় অতি শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে। ভাল জমীতে কলাগাছ রোপণ করিলে ইহার বৃদ্ধি সহজেই দৃষ্টি গোচর হয়।

প্রবল ঝটিকায় কলাগাছের বড়ই অনিষ্ট উৎপাদন করে, বিশেষতঃ ফল হইলে, শীঘ্রই ফলের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই সময়ে কলাগাছ রক্ষা করিতে হইলে বাঁশের তেকাটা করিয়া গাছ রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালা দেশে জুঁয়ে নামক একপ্রকার পোকা লাগিয়া কলার বিশেষ অনিষ্ট করে। জুঁয়ে লাগিলেও গাছ শুইয়া পড়ে।

জুঁয়ের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপায় আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। ভারতবর্ষই যে কলার আদি জন্মস্থান তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে এখানে ও পাশ্চাত্য প্রদেশ ছাড়া পূর্ব্বপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যেই বেশী

জন্মে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এবং দাক্ষিণাত্যে মালাবার উপকূলে ইহার বহুল পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশভেদে কলা অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত। দেশ বিদেশে কলা সর্ব্বশুদ্ধ কত প্রকার আছে তাহা বিশেষরূপে বর্ণনা করা সাধ্যাতিত, মনুষ্যের জীবনেও পারে কিনা সন্দেহ। তবে মোটামুটী যতদুর জানিতে পারা যায় তাহারই বিবরণ অর্থাৎ কোন্ দেশে কোন্ কলা পাওয়া যায় তাহাদিগের আকার কিরূপ, গুণ, ভেদাভেদ, আবাদ প্রণালী, কোন কলার কিরূপ ব্যবসা করিলে বিশেষ লাভজনক হয় ইত্যাদি কলা সম্বন্ধীয় নানা আবশ্যকীয় বিষয় সকল ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

কদলীর চাষের বিবরণ— বাঙ্গালায় কলার চাষের বড় একটা যত্ন নাই, যেমন জমীই হউক না কেন, যে ভাবেই পুতুনা কেন ফল হইলেই হইল। কিন্তু যত্ন করিলে যে ফলের উন্নতি সাধন হয় ও ফল উৎকৃষ্ট হয় সে বিষয়ে বড় একটা কাহারও লক্ষ্য নাই। কলার আবাদের ন্যায় লাভজনক ব্যবসা আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ কলার কোন অংশই বৃথা নষ্ট হয় না। কলার কোন্ কোন্ অংশ কি কার্য্যে ব্যবহৃত হয় এবং কিরূপ লাভজনক তাহাও আমরা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিব। দেখিতে গেলে কলা প্রত্যেক শুভ কার্য্যেই আমাদের আবশ্যক। পূজা, হোম, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধাদি, বিবাহ, ষষ্টি পূজা ইত্যাদি প্রত্যেক শুভ কার্য্যেই কলা কিম্বা কলার গাছ ব্যবহৃত হয়, আবার বোম্বাইয়ের পতিব্রতা কামিনীরা কলাগাছকে ধন ও আয়ুপ্রদ জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। কলাগাছ অনেক সময়ে অনেকের জীবন রক্ষা করিয়া থাকে, বন্যাদিতে দেশ ভাসিয়া গেলে অনেকে অনেক সময় কলাগাছের সাহায্যে ভয়াবহ মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রান পায়, ইহা ছাড়া কলার আরও শত শত গুণ আছে, অতএব এহেন কলাগাছের আবাদ করিতে অলসতা করিলে দেশের ক্ষতি বৃদ্ধি বই লাভ নয়।

মাটি—কঠিন, নীরস ও কেবল বালুকাময় জমী ব্যতীত সকল স্থানেই ইহা হইতে পারে। স্যাঁতসেতে মাটি কিম্বা পুষ্করিণী কাটান মাটি হইলে ইহার পক্ষে উত্তম হয়।

সার—কলা গাছে বোদামাটির সার অতি উৎকৃষ্ট। পুষ্করিণী কাটাইলে বা খালাইলে ভিতর হইতে একপ্রকার কাল মাটি বহির্গত হয় তাহাই বহুদিনের

বৃক্ষাদি পচা বই আর কিছুই নহে, ইহাকেই চাষারা বোদামাটি বলিয়া থাকে। ছাইয়ের সার দিলেও অতি উত্তম হয়।

রোপণ—আমাদের দেশে অর্থাৎ বাঙ্গালায় সচরাচর প্রায়ই বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত কলা গাছ পুঁতিয়া থাকে, কিন্তু খনার বচনানুযায়ি ধরিতে গেলে তাহা হয় না।

১। "কি কর শ্বশুর মিছে খেটে। বেঁধে যাবে ঝাড় কি ঝাড়।
ফাল্গুনে পোত এঁটে কেটে॥ কলা বইতে ভাঙ্গবে ঘাড়॥
যদি পোত ফাল্গুনে কলা। ডাক দিয়ে বলে খনা।
কলা হ'বে মাস ফসলা॥ আষাঢ়, শ্রাবণে কলা পুঁতনা॥
কৃষি বটে খাবিনে। লেগে যাবে জুয়ে।
কলা তলায় যাবিনে॥ পড়বে কলা শুয়ে॥
সিংহ মীন বর্জ্জে। ভাদরে ক'রে কলা রোপণ।
কলা খাবি আর্জ্জে॥ সবংশে মরিল রাবণ॥"

উক্তরূপ খনার বচন দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে ফাল্গুন মাসে কলার এঁটে কাটিয়া লাগাইতে হয় এবং ঐরূপ করিলে কলা অতিশয় শীঘ্র ফলে ও কাঁদি বড় হয়। আষাঢ় মাসে নিষেধ করা হইয়াছে; কারণ আষাঢ় মাসে পুঁতিলে জুঁয়ে লাগিয়া কলা গাছ শুইয়া পড়িবার সম্ভাবনা, আবার চৈত্র ও আশ্বিন মাস বাদে সকল মাসেই লাগাইবার বিধি দেওয়া হইয়াছে, পরে আবার ভাদ্র মাসও পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু খনার আর একটী বচনে আষাঢ়, শ্রাবণ মাসেই কলা গাছ লাগাইবার বিধি দেওয়া হইয়াছে।

"ডাক দে বলে রাবণ।
কলা পুঁতগে আষাঢ় শ্রাবণ॥"

অবশ্য ফাল্গুন মাসে কলার এঁটে কাটিয়া লাগাইলে যে হয় না, তাহা নহে কিন্তু আমাদের দেশে বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত পুঁতিবার রীতি আছে বলিয়া সেইটিই প্রচলিত বেশী ও সেই জন্যই সকলে উক্ত মাসদ্বয়ের মধ্যে রোপণ করিয়া থাকে।

রোপণের নিয়ম—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে বোদামাটি অর্থাৎ পুষ্করিণীর অভ্যন্তরস্থিত কালামাটিই কলাগাছের পক্ষে উত্তম সার। এরূপ স্থলে

কলার আবাদ করিতে হইলে প্রথমে কোদাল দিয়া একহাত আন্দাজ মাটি তুলিবে, পরে কোদাল দিয়া চাপগুলি ভাঙ্গিয়া পগার ভরিয়া ক্ষেত্র সমতল করিয়া ৮ হাত অন্তর এক একটি শ্রেণী বিভাগ করিবে। তেউড় লাগাইতে হইলে প্রত্যেক তেউড়ের সঙ্গে প্রাচীন বৃক্ষের এঁটের কিয়দংশ থাকা আবশ্যক। আর এঁটে লাগাইতে হইলে এঁটেগুলি ঊর্দ্ধাধোভাবে চারি খণ্ড বা আট খণ্ড করিয়া ক্ষেত্রময় রোপণ করা কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক চারা বা এঁটে ৮ হাত অন্তর লাগাইবে। তেউড়ের গাছ এঁটের গাছ অপেক্ষা দীর্ঘ হয় বটে কিন্তু এঁটের গাছের ন্যায় ফল বড়, কোমল ও সুস্বাদু হয় না। স্থান অভাবে গাছ সারি দিয়া রোপণ করিবার তেমন সুবিধা না থাকিলে, যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে লাগাইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না বটে, কিন্তু সার দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

মাটি কোদলাইবার সময় কোদলান মাটির সহিত উপরোক্ত কিঞ্চিৎ বোদা-মাটি মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়, একান্ত অভাব হইলে অন্ততঃ গোড়ায় কিঞ্চিৎ দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে মাঝে মাঝে গোড়ায় কিছু কিছু করিয়া ছাই দিলেই চলিবে। বোদামাটির একান্ত অভাব হইলে যে হয় না এমত নহে, তবে সারই গাছের একমাত্র পুষ্টিকর পদার্থ বলিয়া সার দিলে গাছের তেজশক্তির বৃদ্ধি হয় ও তৎসঙ্গে ফলও বড়, কোমল ও সুস্বাদু হয়। তবে যাঁহারা রীতিমত কলার আবাদ করিয়া লাভ করিতে চান তাঁহাদিগকে আমরা উক্ত সার দিতে অনুরোধ করি।

কলা গাছ রোপণ সম্বন্ধেও খনার দুই একটি বচন আছে—

১। সাত হাতে, তিন বিঘাতে, কলা লাগাবে মায়ে পুতে।

২। নলেকাস্তর গজেক বাই, কলা রুয়ে খেও ভাই।

৩। সাত হাত অন্তর, সাত হাত বাই,
কলা পুতে খাও চাষা ভাই।

ইহার প্রথম নিয়মে সাত হাত অন্তর, দেড় হাত গভীর করিয়া তেউড়ের সঙ্গে প্রাচীন গাছ সমেত লাগাইতে বলা হইয়াছে, ২য় নিয়ম ৮ হাত অন্তর ২ হাত গভীর করিয়া এবং ৩য় নিয়মে সাত হাত অন্তর পোনে দুই হাত গভীর করিয়া পগার কাটিয়া লাগাইতে বলা হইয়াছে।

কলার আয়—কলাগাছের আয় সম্বন্ধে খনার একটী সুন্দর বচন আছে।

কলা পুঁতে কেটনা পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।
তিন শত ষাট ঝাড় কলা রুয়ে,
থাক্‌গে চাষা গৃহে শুয়ে।

বাস্তবিকই কলাগাছের পাতা কাটিলে যে গাছের অনিষ্ট হয় তাহার আর সন্দেহ নাই। পাতা কাটিলে গাছ ক্রমেই বলহীন হইয়া পড়ে, সুতরাং মোচা হইতে বিলম্ব হয়; আর গাছ বলহীন হইলে ফলও তদ্রূপ বড় ও কোমল হয় না। নতুবা যথা সময়ে সঠিক্ ফল হইলে যে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা তাহা খনার বচনেই স্পষ্ট প্রতিয়মান হইতেছে, কারণ ৩৬০ ঝাড় কলাগাছ রোপণ করিলে ৮।৯ মাস বাদে প্রায় সকল গুলিই ফল উৎপাদন করে, সুতরাং ৩৬০ ঝাড় কাঁদিতে খুব কম হইলেও ১৪০৲ কিম্বা ১৫০৲ টাকা অনায়াসে আয় হইতে পারে। পল্লিগ্রামে মাসে ১০।১২৲ টাকা খরচ করিলেই স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। দুই বিঘা জমিতে ৩৬০ ঝাড় কলা অনায়াসে হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

কচুর আবাদ।

ভারতবর্ষই কচুর আদি জন্মস্থান। বাঙ্গালাদেশে কচুর বিস্তর আবাদ হইয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্র মতে, দুর্গোৎসবে নবপত্রিকা মধ্যে কচু পরিগণিত। এখানে কচু অনেক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মানকচু, বাঁশপোল, ঢেঁকি-বাঁশপোল, শোলাকচু, মুখীকচু, নারিকেলীকচু, গুঁড়িকচু ও চৌমুখীকচুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মানকচু—পূর্ব্ব বাঙ্গালায় মানকচুর চাষ কিছু অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। মধ্য বাঙ্গালায় ইহার তাদৃশ যত্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বাস্তবিক ইহা যে একটী লাভের সামগ্রী তাহার আর সন্দেহ নাই। মানকচু তরকারীর জন্ম অতি আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মানকচু সংযোগে অনেকগুলি সুখাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে; আমরা তাহা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিব। ইহার অনেক গুণও আছে, যথা—শীতল, সুস্বাদু, শোথহর, কোষ্ঠপরিষ্কারক ইত্যাদি অনেক সময়ে ইহা ঔষধেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্থান এবং চাষের দোষেতে

সময়ে সময়ে মানকচু এরূপ অপকৃষ্ট হয়, যে খাইবা মাত্রই মুখ চুলকাইতে থাকে। কিন্তু উত্তম স্থানে ভালরূপ চাষ করিলে তদ্রূপ হয় না, অথচ অপেক্ষাকৃত বড় ও সুস্বাদু হয়।

ইহার চাষ দুইপ্রকার। প্রথম চাষ—কচুর চোখ কাটিয়া একরূপ আবাদ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়—ক্ষেত্র হইতে কচু উঠাইবার পর যে শিকড় থাকে এবং সেই শিকড় হইতে যে চারা উৎপন্ন হয়, সেই চারা তুলিয়া রোপণ করা হয়। কিন্তু এই দ্বিবিধ চাযের মধ্যে শেষোক্ত প্রকার চাষই উত্তম। মানকচুর চাষ করিতে হইলে শিকড়ের চারা রোপণ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু মুখকাটা চারার মান খুব বড় হয়। দোয়াঁস ও ফাস মৃত্তিকাই মানকচুর পক্ষে উৎকৃষ্ট। এঁটেল মাটি অপেক্ষা বালুকামিশ্রিত মাটিতেই ভাল হয় বটে, কিন্তু কচু অতিশয় সরু ও অধিক মিষ্টরসযুক্ত হয়; খিয়ার মাটিতে কচু আদৌ বাড়ে না; পলিমৃত্তিকাতেও তদ্রূপ সুবিধা হয় না। মানকচু রোপণ করিবার পূর্ব্বে (অর্থাৎ মুখ কাটিয়া লাগাইতে হইলে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে, আর চারা লাগাইতে হইলে চৈত্র, বৈশাখ মাসে) জমী উত্তমরূপে আবাদ করতঃ দুইবার চাষ দিতে হইবেক, পরে মই দিয়া জমীকে সমতল করিয়া মৃত্তিকা চূর্ণবৎ করিয়া ঘাস, মুথা প্রভৃতি আবর্জ্জনাদি যাহা থাকিবেক সমস্ত পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে। মানকচু চাষ করিতে হইলে ক্ষেত্র খুব গভীর করিয়া কর্ষণ করা আবশুক, কেননা ক্ষেত্র যত গভীর হইবে মানকচুও তত নিম্নে বাড়িতে থাকিবেক। এইরূপে ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষণ হইলে মানকচু অতিশয় বৃহৎ হইয়া থাকে। মানকচুর ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া চাষ করা উচিত নহে, কোদাল দিয়া কোদ্‌লাইয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ; তবে চাষারা কার্য্যের সুবিধার জন্ত লাঙ্গল দিয়া থাকে। খনার বচনে বলে—"কোদালে মান, তিলে হাল"; সুতরাং কোদাল দিয়া চাষ করাই উচিত।

মানকচু ক্ষেত্র উপরোক্তরূপে কর্ষণ হইলে পর, দুইহাত অন্তর এক একটী শ্রেণীবিভাগ করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীতে দুইহাত অন্তর এক একটী গর্ত্ত খুঁড়িবে; অর্থাৎ প্রত্যেক চারাটি পরস্পর অন্ততঃ দুইহাত অন্তর ব্যবধান থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। ছোট বড় সকল প্রকার চারাই রোপণ করা যাইতে পারে।

কচুর মুখ কাটিয়া রোপণ করিতে হইলে, রোপণের পূর্ব্বদিবস কচুর মাথা

হইতে উপরের দুইটী চক্ষু সহিত আধহাত আন্দাজ কাটিয়া উক্ত কর্ত্তিত স্থানে কিঞ্চিৎ ছাই মাখাইয়া রাখিবে এবং পরদিবস উল্লিখিতরূপে প্রত্যেক গর্ত্তে এক একটী রোপণ করিয়া যাইবে।

রোপণের পরদিবস যদ্যপি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে তৎপরদিবস অর্থাৎ রোপণের দুইদিবস পরে প্রত্যেক চারার মূলে কিঞ্চিৎ জল দিবে। তৎপরে সমস্ত মাস যদ্যপি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে মাসের শেষে একবার সমুদায় চারার গোড়ায় জল দেওয়া আবশ্যক। কচুর মুখ কাঠিয়া পুঁতিতে হইলে মাঘ মাসের শেষে লাগান আবশ্যক; আর চারা রোপণ করিতে হইলে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসই প্রশস্ত সময়। চারা হইতে যখন দুইটী সাদা পাতা নির্গত হইবে, তখন প্রত্যেক চারাটির গোড়ায় কিঞ্চিং কিঞ্চিং ছাই দেওয়া আবশ্যক। ছাইয়ের সারই মানকচুর পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট, কেননা ছাইয়ের সারে মান বাড়ে। ছাইয়ের সারের আর একটী মহৎ গুণ এই, যে কচু খারাপ জাতীয় হইলেও উত্তমরূপে ছাই দিলে মুখ চুলকান হইতে অনেকটা পরিত্রাণ পাওয়া যায়। খনার বচনে বলে—"কচুবনে যদি ছড়াস্ ছাই, খনা বলে তার সংখ্যা নাই।" "ওলে কুটী, মানে ছাই; এইরূপে কৃষি করগে ভাই"; কিন্তু পাথুরে কয়লার ছাই সারের জন্য ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ ইহার তেজে গাছের অনিষ্ট হইতে পারে। লতা, পাতা, কাষ্ঠ, ঘুঁটে প্রভৃতির ছাইই উৎকৃষ্ট। পোড়ামাটির সারও মন্দ নহে। কাঁচা গোময়ের সার দিলে কচু বড় হয় বটে, কিন্তু তাহাতে অতিশয় কুটকুটে হয়, সুতরাং সে সার দেওয়া একেবারেই অনাবশ্যক। নদী কিম্বা পুষ্করিণীর ধারে কচু পুঁতিলে খুব বড় হয়। পল্লীগ্রামে গৃহস্থেরা নদী কিম্বা পুষ্করিণীর ধারে কচু পুঁতিয়া থাকে। খনা বলে—"নদীর ধারে পুঁতলে কচু, কচু হয় তিনহাত নীচু।" গৃহস্থেরা স্ব স্ব বাড়িতে কচুগাছ করিতে ইচ্ছা করিলে একহাত গভীর ও একহাত বেড় গর্ত্ত খুঁড়িয়া, গর্ত্তগুলি ছাই ও গুঁড়া মৃত্তিকার দ্বারা ভর্ত্তি করিয়া "মানের" চারা কিম্বা পুরাতন "মানের" মোথা লাগাইয়া দিবে। এইরূপে যতগুলি ইচ্ছা ততগুলি করিতে পারেন। একটী মহৎ আবশ্যকীয় কথা বলিতে ভুল হইয়াছে। মানকচুর ক্ষেত্র সদাসর্ব্বদা উত্তমরূপে পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য ও মাঝে মাঝে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া আল্‌গা করিয়া দেওয়া উচিত। আর একটীর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে

হইবে। বর্ষার জলে ক্ষেত্রে যেন জল বসিতে না পায়। মানকচু গাছের গোড়ায় বর্ষার জল লাগিলে মানকচু অতিশয় ফুটকুটে হইয়া থাকে; এই জন্য যাহাতে বৃষ্টির জল পড়িবামাত্রই ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যায়, সে বিষয় বিশেষ বন্দোবস্ত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

দুই বৎসর পরে মানকচু তুলিতে পারা যায়। তিন চারি বৎসর হইলে বেশ বড় হয়। যশোহর জেলায় এক প্রকার মানকচু জন্মিয়া থাকে, তাহা প্রায় এক হাতের বড় হয় না; কিন্তু খাইতে অতিশয় সুস্বাদু ও আদৌ মুখ ধরে না। উক্ত জেলায় মানকচুর আবাদ বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। যশোহরের মানকচু একবৎসর হইলেই বেশ পরিপুষ্ট হয়। আমাদের মতে যাঁহারা মানকচুর আবাদ করিতে চাহেন তাঁহারা উক্ত জেলা হইতে চারা কিম্বা কচুর চোখ আনাইয়া আবাদ করিলেই ভাল হয়, কারণ যশোহরের মানকচু অতি উৎকৃষ্ট। মানকচু ক্ষেত্রে রোপণ করিয়াই ক্ষেত্রের চারিধারে উত্তমরূপ বেড়া দেওয়া আবশ্যক; কেননা তাহা হইলে শূকর ও সজারু ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

দাড়িম্ব।

(PUNICA GRANATUM)

আমাদের এদেশে দাড়িম্ব প্রায়ই রোগীর নিমিত্ত ব্যবহার হইয়া থাকে। কারণ সচরাচর গৃহস্থেরা দাড়িম্বের মূল্যের আধিক্যবশতঃ ব্যবহার করিতে সক্ষম হন না।

একটী বিদারিত দাড়িম্ব ফল দেখিতে যেমন চক্ষুর প্রীতিকর, ইহার সুন্দর মুক্তার ন্যায় দানাগুলিও তেমনি রসনার তৃপ্তিকর ও বলকারক। আমাদের এদেশের দাড়িমের অপেক্ষা পাটনাই দাড়িম দেখিতে ও খাইতে আরও সুন্দর ও সুস্বাদু, এজন্য মূল্যও অধিক। আবার পাটনাই অপেক্ষা কাবুলের বেদানা নামক দাড়িম অতি পরিপাটি; ইহার মূল্যও অত্যধিক বেশী। এইজন্য বরং দাড়িম সময়ে সময়ে গৃহস্থেরা স্ব স্ব সন্তানাদির জন্য ক্রয় করিয়া থাকেন; কিন্তু বেদানা প্রায়ই ঘটেনা। এই কয়েক জাতি ছাড়া, আর এক জাতির দাড়িম বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার ফল সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। গাছ

রক্তবর্ণ বহু দলে পরিপূর্ণ এবং কেশর নাই। ইহাকে কেহ কেহ গ্লো-আনার বলিয়া থাকেন।

সংস্কৃতে এই ফলকে রোচন, মধুবীজ ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর নামে আখ্যাত করা হয়। সংস্কৃত পর্য্যায়—করক, পর্ব্বরুক, পিণ্ডীর, পিণ্ডপুষ্প, দাড়িম্ব, স্বাদ্বম্ল, ফলশাড়ব, রক্তপুষ্প, কুট্টিম, দাড়িমীসার, শুকবল্লভ, রক্তবীজ, সুফল, মধুবীজ, দন্তবীজক, কুচফল, মণিবীজ, রেচন, কন্ধফল, নীলপত্র, সুনীল, রক্তফল।

দেশভেদে দাড়িমের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

বাঙ্গালায়—"দালিম", "দাড়িম", "ডালিম", "আনার"। পশ্চিমাঞ্চলে—"ঢালিম", "ঢারিম্ব", "অনার-কা-"পের", "বেদানা", "নাসফল"। উড়িষ্যায়—"দালিম", "দালিম্ব"। দক্ষিণে—"অনার"। দ্রাবিড়ে—"মাদলৈ", "মদলম্"। তৈলঙ্গে—"দনিম্ম", "দাদিম", "দালিম্ব"। কর্ণাটে—"দালিম্বে—গিদা"। বোম্বাই—"অনার", "দালিম্ব"। গুজরাটে—"দাডম্"। পঞ্জাবে—"দারু", "দারুণী"। পারস্যে—"নর", অপার"। আরব্যে—"রাণা" বা "রম্মন্"।

দাড়িম্ব কেবল দেখিতে বা খাইতেই সুন্দর ও সুস্বাদু নহে; ইহার আরও অনেক উপকারিতা গুণ আছে। দাড়িম্ব ফলের আবরণ অংশগুলি অর্থাৎ খোলা ও ফুলের আবরণ অংশ অনেক সময়ে অনেক উৎকট পীড়ায় আবশ্যক হয়। দাড়িম্ব ফলের উপকারিতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।

ইহার ত্বক্ অর্থাৎ খোলা উষ্ণজলে সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে কোষ্ঠবদ্ধ করণের আশ্চর্য্য ঔষধ; কিন্তু ইহার মধ্যের শাঁস বা সার অংশগুলি উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া পান করাইলে ঠিক্ উহার বিপরীত দেখা যায়, অর্থাৎ কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে। ক্রিমীনাশ করিতে দাড়িম্ব বৃক্ষের মূলের ত্বক্ যেমন উপকারক এরূপ আর কিছুই নহে। অনেক সময়ে আমরা দেখিয়াছি, যে ক্রিমিরোগীকে (Santonine) সেণ্টোনাইন্ দেওয়া গেছে, কিন্তু কোন উপকার দর্শে নাই; দাড়িম্ব বৃক্ষের মূলের ত্বক্ সে স্থলে অনেক উপকার করিয়াছে। ক্রিমীর পক্ষে দাড়িম্ব মূলের ত্বক্ যে অব্যর্থ মহৌষধ তাহার আর সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ; কারণ ইহাতে অত্যধিক (Tonic Acid) টনিক্ এসিড্ থাকা প্রযুক্ত ইহা বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিলে বিশেষ অনিষ্ট

হইবার সম্ভাবনা। অনেক সময়ে এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। দাড়িম্ব বৃক্ষের উপকারিতা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও অনেক লিখিত আছে, তাহার মধ্যে আমরা কতকগুলি কৃষি-কৌতূহলপ্রিয় সহৃদয় পাঠকবর্গের জ্ঞাতর নিমিত্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ১ মধুরাম্ল। ২ কষায়। ৩ কাশ, বাত, কফ, শ্রমপিত্তনাশক। ৪ দীপনকারী। ৫ রুচিকারী। ৬ হৃদ্য। ৭ তৃষ্ণানাশকারী। ৮ কণ্ঠশোধনকারী। ৯ শীতল গুণবিশিষ্ট। অজীর্ণ রোগে দাড়িমের রস অতিশয় হিতকর।

ফুলের কুঁড়ি বাটিয়া ৪।৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বায়ুনলী প্রদাহে (Bronchitis) উপকার হয়। দাড়িম রসভেদে তিন প্রকার মধুর, মধুরাম্ল ও কেবল অম্ল। তন্মধ্যে মধুর রসযুক্ত দাড়িমই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও বহুগুণবিশিষ্ট। এতদ্ভিন্ন আরও অনেকানেক উপকারিতা সম্বন্ধে লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে আমরা এস্থলে আর বেশী উল্লেখ করিলাম না।

এক্ষণে যে বৃক্ষ এরূপ উপকারক ও যাহার ফল এতাদৃশ দেখিতে সুন্দর ও খাইতে সুস্বাদু ও বহু গুণবিশিষ্ট, সেই বৃক্ষের ব্যবসা ও চাষ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ইহার ফুলে এক প্রকার লাল রং প্রস্তুত হয়; পশ্চিমাঞ্চলে দাড়িমের ছালে এক প্রকার কাপড় রং করিয়া থাকে, তাহাকে কক্‌রেজী বলে। এরূপ করিতে হইলে দাড়িমের খোসা জলে সিদ্ধ করিয়া বার আনা ভাগ জল মরিয়া গেলে তবে উহা লইয়া ব্যবহার করা উচিত। প্রতি বৎসর এদেশ হইতে ও কাবুল হইতে যে সমস্ত দাড়িম য়ুরোপে রপ্তানি হয়, তাহার অধিকাংশ প্রায় ঔষধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দাড়িম গাছের ত্বক্ চর্ম্মরঞ্জিত করিবার পক্ষে অতি উত্তম জিনিষ। য়ুরোপে অনেক স্থানে উক্তরূপে চর্ম্মরঞ্জিত করা হয়। বিলাত হইতে এদেশে "মরক্কো লেদার" নামক যে চামড়া আমদানি হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশ প্রায়ই দাড়িম্ব ত্বক্ দ্বারা রঞ্জিত। দাড়িম গাছের ত্বকের দ্বারা চামড়া রঞ্জিত করিলে এক দিকে দেখিতে যেমন সুন্দর হয়, অন্য দিকে কীটের হস্ত হইতেও অনেক সময় পরিত্রাণ পায়। আমাদের এদেশে উক্ত উপায়ে চামড়া রঞ্জিত করিলে কতদূর লাভজনক হয়, তাহা সহজেই অনুমিত করা যায়। বাঙ্গালায় দাড়িম বৃক্ষ অতিশয় কম; যাহা আছে তাহা প্রায়ই সমস্ত বীজ হইতে উৎপন্ন। দাড়িম বৃক্ষের কলম করিতে পারিলে অতি উত্তম হয় ও শীঘ্র সঠিক ফল উৎপাদন করে। আমরা এ বিষয় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

আমাদের "ইম্পিরিয়াল নর্শরিতে" আমরা দেশী ও পাটনাই দাড়িমের কলম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। দাড়িম্ব বৃক্ষে প্রায়ই কীট লাগিয়া থাকে তজ্জন্য ফলের বিশেষ অনিষ্ট হয়। এস্থলে কীটের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে, কাপড়ের ছোট ছোট ব্যাগ অর্থাৎ থলে প্রস্তুত করিয়া ফলগুলি আবৃত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

কৃষি সম্বন্ধে খনার-বচন।

আমাদের দেশে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে লোকপরম্পরায় কতকগুলি প্রবাদ বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। ঐ সকল প্রবাদ সমূহকে সাধারণে খনার বচন বলিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল বচনাবলী প্রকৃত পক্ষে খনার রচিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অনেক কারণ আছে। ফল কথা ঐ সকল বচনগুলি এক ব্যক্তির রচনা বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বচনগুলি যাহারই রচিত হউক না কেন, ওগুলি যে কৃষি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানপূর্ণ সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। লোকে বহুকাল ধরিয়া কৃষিকার্য্য করিয়া যে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, সেই সকল বহুকালব্যাপী জ্ঞানরাশী এই সকল বচনাবলীতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে ক্রমে ক্রমে এই সকল বচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব এবং সাধ্যমত ঐ সকল বচনের সারবত্তা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

(১) মূলার ভুঁই তুলা, কুশারের ভুঁই ধুলা।

মূলার ভূমি অর্থাৎ মূলা চাষের উপযুক্ত ভূমি তুলার ন্যায় এবং কুশার বা ইক্ষুর ভূমি ধূলার ন্যায় হওয়া কর্ত্তব্য; অর্থাৎ মূলা ও ইক্ষু চাষ করিতে হইলে ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণ চাষ দিয়া জমীকে বিশেষরূপে নরম করা কর্ত্তব্য।

(২) শ্রাবণের বার, ভাদ্রের তের, এর মধ্যে যত পার।

শ্রাবণের ১২ তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাদ্রের ১৩ দিন পর্য্যন্ত যত ইচ্ছা ধান্য রোপণ করিতে পার। মোট কথা শ্রাবণের অর্দ্ধেক দিন হইতে ভাদ্রের অর্দ্ধেক দিন পর্য্যন্ত ধান্য রোপণ করিবার উপযুক্ত সময়।

(৩) চাঁদের সভার মধ্যে তারা, বর্ষে পানী মুষলধারা।

চন্দ্রদেবের চতুর্দ্দিকে সময়ে সময়ে একটী ছায়া মণ্ডলাকারে পতিত হইয়া থাকে, ঐরূপ ছায়াকে চন্দ্রের সভা বলিয়া সাধারণ লোকে জানে। যদি ঐরূপ

ছায়ার মধ্যে তারা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে শীঘ্রই মূষলধারে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা আছে।

(৪) চৈত্রে কুয়া, বৈশাখে শীত, বর্ষা হয় কদাচিৎ।

যে বৎসর চৈত্র মাসে কুয়াসা হয় এবং বৈশাখ মাসেও শীত থাকে, সে বৎসর বেশী বৃষ্টি হইবার কিছুতেই সম্ভাবনা নাই।

(৫) আশ্বিন মাসে রুইলে সিম। পালা যোগাতে নারেন ভীম॥

আশ্বিন মাসে সিমের বীজ রোপণ করিলে সিমের গাছ এত তেজের সহিত বর্দ্ধিত হয়, যে ভীমের ন্যায় বলসম্পন্ন পুরুষও ডালপালা যোগাইয়া মাচা বাঁধিয়া দিতে সমর্থ হয় না।

(৬) পচুই মেঘে মূষল বরে, পুবে মেঘে হয় বাত।
কোদালে মেঘে পুকুর ভরে, ঘুচে যায় তাত॥

পশ্চিম দিকে মেঘ হইলে মূষলধারে বৃষ্টি হইয়া থাকে এবং পূর্ব্ব দিকে মেঘ হইলে প্রচুর পরিমাণ বায়ু ও ঝড় বহিয়া থাকে। আকাশে কোদালের ন্যায় মেঘ দৃষ্ট হইলে সে বৎসর উত্তমরূপ বৃষ্টি হয় এবং ঐ বৃষ্টির জলে পুকুর ভরিয়া যায় এবং সে বৎসর তাত অর্থাৎ সূর্য্যের উত্তাপও কম হয়।

(৭) কলা ওপ্‌ড়ায় ফুল ছাঁটে, কুল "সজানার" ডাল কাটে।
তবে গৃহস্থের সুসার ঘটে॥

প্রতি বৎসর কলাগাছের মূল বা তেউড় তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। ফুল-গাছের ডাল ছাঁটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং কুল ও সজীনার ডাল একেবারে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া আবশ্যক। উপরোক্ত নিয়মানুসারে চলিলে গৃহস্থের বেশ সুসার হইয়া থাকে।

বৃক্ষাদি সম্বন্ধে উপরোক্ত নিয়ম কয়েকটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অনেক গাছেরই নিয়ম এই যে, ঐ সকল গাছের ডালপালা না কাটিয়া দিলে উহা হইতে নূতন ডালপালা বাহির হয় না এবং ঐ সকল গাছে উত্তমরূপ ফলফুল জন্মায় না।

(৮) যদি বর্ষে আগণে, রাজা যান মাগনে।
যদি বর্ষে পৌষে, কড়ি হয় তুষে।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজা পুণ্য দেশ।
যদি বর্ষে ফাগুনে, বিনা কাউন দ্বিগুণে। (ক্রমশঃ)

কৃষিতত্ত্ব।

১ম খণ্ড। } বৈশাখ ১৩০৭ সাল। } ৪র্থ সংখ্যা।

সম্পাদকীয় উক্তি।

নারিকেলের মাখন—পাঠক শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন! যে নারিকেলের আবার মাখন কি? দুগ্ধ হইতেই ত মাখন প্রস্তুত হয়। নারিকেলের দুগ্ধ অর্থাৎ রস হইতে অতি উত্তম মাখন প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের ফল, কিন্তু আমরা জানি না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! কিছুদিন গত হইল ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরে একটী কোম্পানী কল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহাতে প্রত্যহ প্রায় ৫০ মণ মাখন প্রস্তুত হয়। এই সকল নারিকেল আফ্রিকার ফরাসী অধিকৃত দেশসমূহ হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। পাঠক বুঝিয়া দেখুন, যে মাখন প্রস্তুত করা ত দূরের কথা, যদ্যপি আমাদের এদেশ হইতে কেবলমাত্র নারিকেল রপ্তানি করা হয়, তাহা হইলে কতদূর লাভজনক হয়, কিন্তু আমাদের দেশের লোক চিরকাল যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহাই জানে, নূতন কিছু আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা একেবারেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহাদের আছে, তাঁহারা অর্থাভাবে সংসারের উৎপীড়নে কিছুই করিতে পারেন না; অতএব এ সকল কার্য্যে যতদিন পর্য্যন্ত দেশের ধনী ব্যক্তিদিগের শুভদৃষ্টি না পড়িবে, ততদিন পর্য্যন্ত দেশের দৈনদশা যে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

অদ্ভুত ধান্যবৃক্ষ—চীনদেশে এক প্রকার ধান্য বৃক্ষ আছে, উহা প্রায় ৫০।৫৫ ফিট্ উচ্চ। উহার গোড়া ৪ ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত মোটা হয়। ধান্যের চাউলও মন্দ হয় না; অধিকন্তু ইহার ত্বক্ হইতে একপ্রকার সুন্দর, অতি সূক্ষ্ম কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

নারিকেলমালার উপকারীতা—নারিকেল যে কিরূপ উপকারী সামগ্রী, তাহা সকলেই অবগত আছেন, অতএব নারিকেলের উপকারীতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা বাহুল্য। সম্প্রতি নারিকেলমালার একটী অদ্ভুত গুণ আবিষ্কার হইয়াছে। কিছুদিন গত হইল কোনও একটী অভিজ্ঞ সাহেব কৃষক তাঁহার অধীনস্থ কুলিদিগের মধ্যে নারিকেলমালার ছাই ব্যবহার করাইয়া ওলাউঠার বিস্তৃত মারীভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। সিঙ্গাপুর অঞ্চলে "কলেরার" প্রাদুর্ভাব হওয়ায় সাহেব প্রত্যেক কুলিদিগকে নারিকেল মালার ছাই প্রত্যহ ব্যবহার করিতে দিতেন; ইহাতে অতি অল্পসময়ের মধ্যে "কলেরার" প্রাদুর্ভাব একেবারেই হ্রাস হইয়া যায় এবং নারিকেলমালার ছাই ব্যবহার করিবার পর হইতে কুলিদিগকে আর উক্ত রোগগ্রস্ত হইতে হয় নাই; যাহা হউক, আজকাল বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে; অতএব যেখানে মারীভয় খুব বেশী, সেখানে নারিকেলমালার ছাই ব্যবহার করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? অবশ্য নারিকেলমালার ছাই অনিষ্টকর পদার্থ নহে, সুতরাং সেবন করিতে কেহই আপত্তি করিবেক না।

আর্দ্রক বা আদা।

(ZINGIBER)

বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই আদার আবাদ হইয়া থাকে ও প্রচুর পরিমাণে আদা জন্মিয়া থাকে। আমাদের দেশে তিন প্রকারের আদা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সাধারণতঃ যে আদা ব্যবহার করিয়া থাকি তদ্ব্যতীত আরও দুই প্রকারের আদা আছে। ১ম কৃষ্ণ আদা, ২য় আমআদা। কৃষ্ণ আদা দেখিতে সাধারণ আদার ন্যায়, তবে প্রভেদের মধ্যে এই, যে কৃষ্ণ আদার প্রান্তভাগ সাধারণ আদা অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট। আমআদা দেখিতে সাধারণ আদার ন্যায়, প্রভেদের মধ্যে ইহার গন্ধ ঠিক কাঁচা আম্রের ন্যায় হয় বলিয়া আমরা অম্ল প্রভৃতিতে আমআদার ব্যবহার করিয়া থাকি। কৃষ্ণ আদা সাধারণ আদার ন্যায় সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় না।

আদার আবাদে বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। কারণ আদা

প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক বিঘা জমীতে প্রায় চল্লিশ মণ পর্য্যন্ত আদা জন্মাইতে পারে। অতি অল্প পরিমাণ উৎপন্ন হইলেও প্রতি বিঘায় ২০ কুড়ি মণ নিশ্চয় উৎপন্ন হইয়া থাকে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে রংপুর জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আদা জন্মিয়া থাকে। প্রতি বৎসর এক রংপুর হইতেই বহু টাকার আদা বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে আদার ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আদা যে কেবল মাত্র রন্ধনকার্য্যে মসলার কার্য্য করে তাহা নহে। দেশীয় ও বিদেশীয় বিবিধ প্রকার ঔষধে প্রায়ই আদার ব্যবহার হইয়া থাকে। আমাদের দেশের কবিরাজেরা আদার ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী। অনেক কবিরাজী ঔষধই আদা সংযোগে ব্যবহার করিবার নিয়ম আছে।

একটু উচ্চ এবং বহু দিনের পতিত জমীতেই উত্তমরূপ আদার আবাদ হইতে পারে। আদার আবাদ করিতে হইলে অগ্রে জমী ঠিক করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। যে ক্ষেত্রের জমীর নিম্নদেশ বালুকাপূর্ণ এবং উপরিভাগ পলি কিম্বা হালকা মাটি দ্বারা আবৃত এরূপ ক্ষেত্রেই আদার আবাদ করিবার বিশেষরূপ সুবিধা হয়। জলা ভূমিতে অর্থাৎ যে জমী বর্ষার জলে ডুবিয়া যায় কিম্বা যে জমীর উপর দিয়া বন্যার স্রোত বহিয়া যায় সেরূপ জমীতে কখনই আদার আবাদ হইতে পারে না; দোআঁস জমীতেও বেশ হইতে পারে। ক্ষেত্র অত্যন্ত কঠিন হইলে আদার মূল ভালরূপ বিস্তৃত হইতে পারে না। সেই নিমিত্ত আলগা মাটির উপরই আদার চাষ করা কর্ত্তব্য। আদার ক্ষেত্র বহুকালের পতিত জমী হইলে উহাতে কোনও প্রকার সার দেওয়ার আবশ্যক হয় না। কারণ বহুকালের পতিত জমী সার দেওয়া জমীর ন্যায় উর্ব্বরা শক্তি সম্পন্ন। সার দিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইলে গোবরের সার দেওয়াই কর্ত্তব্য। এখানে একটী কথা প্রত্যেক চাষীরই মনে রাখা আবশ্যক। নূতন গোবর সারের পক্ষে একবারে অনুপযুক্ত। পুরাতন শুষ্ক গোবর চূর্ণ করিয়া আদার ক্ষেত্রে সার দেওয়া কর্ত্তব্য।

আদার কোনও প্রকার বীজ নাই। ইহার মূলেই বীজের কার্য্য চলে। আদার গাত্র হইতে চোখযুক্ত অংশ সকল পৃথক্‌ভাবে ভাঙ্গিয়া লইয়া রোপণ

করিতে হয়। আদার বীজ রক্ষা করিতে হইলে উক্তরূপ চোখযুক্ত অংশ সকল ভাঙ্গিয়া লইয়া এক দিবস রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিয়া গৃহমধ্যে কোনও শুষ্ক স্থানে খড় বিছাইয়া উহার উপর একফুট পর্য্যন্ত উচ্চ করিয়া গাদা দিয়া বীজ রক্ষা করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক চাষীর নিকটেই সকল প্রকার শস্য ও মূলের বীজই অত্যন্ত আদরের সামগ্রী। কারণ বীজের গুণাগুণের উপরই উৎপন্ন শস্য বা মূলের গুণাগুণ নির্ভর করে। উপরোক্ত প্রকারে আদার বীজ রক্ষা করিলে উহা কিছুতেই নষ্ট হইবে না। এই বীজ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া রোপণ করিলেই সুফল লাভের বিশেষ সম্ভাবনা।

বৈশাখ মাসই আদা রোপণ করিবার উপযুক্ত সময়। যদি কোনও কারণে বৈশাখ মাসে রোপণ না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অন্ততঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময়ে নিশ্চয় রোপণ করা কর্ত্তব্য।

আদার ক্ষেত্র মাঘ ফাল্গুন হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। মাঘ ফাল্গুন মাসে ক্ষেত্রে কোদাল দিয়া পরে বৈশাখমাসে একবার ক্ষেত্র কর্ষণ করা আবশ্যক। কর্ষণকালে ক্ষেত্রে ঘাস মুথা প্রভৃতি আবর্জ্জণাদি থাকিলে তুলিয়া ফেলা উচিত। জমীতে বড় বড় মাটির চাপ থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করা কর্ত্তব্য। এই সময়ে একবার ক্ষেত্রে মই দিয়া ক্ষেত্রের জমী সমান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে প্রস্তুত জমীতে দেড়ফুট অন্তর শ্রেণী করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীতে এক ফুট অন্তর এক একটী আদা রোপণ করা কর্ত্তব্য। আদা রোপণ কালে সাবধান হইয়া রোপণ করা কর্ত্তব্য। বীজ আদার চোখটী যেন উপরের দিকে থাকে। রোপণ করিবার পর ঐ চোখের উপর অল্প পরিমাণ চূর্ণ মৃত্তিকা চাপা দিতে হইবে।

উক্তরূপ প্রকারে আদা রোপণ করিবার অল্পদিন পরেই আদার অঙ্কুর বাহির হইবে। জ্যৈষ্ঠের শেষে কিম্বা আষাঢ়ের প্রথমে যখন চারা একটু বড় হইয়া উঠে ঐ সময় একবার ক্ষেত্র নিড়াইয়া দিলে ভাল হয়। ইহার পর আর ক্ষেত্রের অন্য কোনও রূপ পাইট করিতে হয় না। তবে ক্ষেত্রের প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা সকল চাষীরই বিশেষ কর্ত্তব্য। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টির পর ক্ষেত্রে দুই একটী আগাছা জন্মিতে পারে, ঐ সময়ে বিশেষ যত্ন করিয়া ঐ সকল আগাছা তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

ফাল্গুনমাসে ক্ষেত্র হইতে আদা তোলা কর্ত্তব্য। আদা তুলিবার সময় বিশেষ সাবধান হইয়া তুলা উচিত। যত্ন করিয়া না তুলিলে আদার চাপ সকল ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইতে পারে। আদা তুলিবার পর বীজের জন্য আদা রাখা কর্ত্তব্য। বীজের জন্য আদা রাখিয়া অবশিষ্ট আদার চোখ ছুরি দ্বারা পৃথক করিয়া ফেলিয়া আদাগুলিকে ক্ষেত্রে ফেলিয়া একবার শুষ্ক করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। জমী ও আদাতে যেন কোনও প্রকারে বৃষ্টির কিম্বা অন্য কোনও জল না লাগে। জল লাগিলে আদা বেশী দিন থাকে না পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

আম আদা ও কৃষ্ণ আদার আবাদ প্রণালীও ঠিক সাধারণ আদার ন্যায়। সকল গৃহস্থই চেষ্টা করিলে প্রত্তিগৃহে একএক ঝাড় আদাতেই সাধারণ গৃহস্থের সংকুলান হইতে পারে।

ডেল্‌ফিনিয়ম পুষ্প।

(DELPHINIUM)

উপরে যে নয়নমনোহর সুন্দর পুষ্পের প্রতিকৃতি দেখিতেছেন উহারই নাম, "ডেল্‌ফিনিয়ম"। "ডেল্‌ফিনিয়ম" পুষ্পকে সাধারণে "লার্কসপার" বলিয়া থাকে। "লার্কসপার" পুষ্প দেখিতে অতি সুন্দর। যখন উদ্যানস্থিত বৃক্ষে এই পুষ্প

প্রস্ফুটিত হয় তখন এই পুষ্পের সৌন্দর্য্যে উদ্যানভূমি যেন আলোকিত হইয়া উঠে। পুষ্প শোভিত বৃক্ষটী দেখিলে মনে হয়, যেন বৃক্ষটীকে সম্মুখে রাখিয়া অহোরাত্র উহার সুমধুর সৌন্দর্য্য উপভোগ করি। ফলতঃ পুষ্পপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট "লার্কসপার" একটী বিশেষ আদরের বস্তু। যাঁহারা ফুলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে বাসনা করেন, তাঁহাদের উদ্যানে "লার্কসপার" পুষ্পের গাছ রোপণ করা কর্ত্তব্য।

"লার্কসপারের" গাছ বারমাস জীবিত থাকে না, সুতরাং বৎসরের মধ্যে সকল সময় ঐ সুন্দর পুষ্পের শোভা উপভোগ করিতে পারা যায় না। ইহা কেবল মাত্র শীতকালে প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া ইহাকে (Annual) বা ঋতুপুষ্প বলিয়া থাকে। "জেড়ুয়া" ফুলের মধ্যে এই ফুল দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর।

"ডেলফিনিয়ম" পুষ্পের বর্ণ একপ্রকার নহে। এক একটী ফুলে নানাবিধ বর্ণ বৈচিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ফুলের দলের অগ্রভাগ কাঁকরি কাটার ন্যায়। কোনও কোনও প্রকার পুষ্পের অগ্রভাগে শাদা শাদা রেখাও থাকে। মোট কথা "ডেলফিনিয়মের" একটী নির্দ্দিষ্ট রং দেখিতে পাওয়া যায় না।

"ফরমোসাস" (Formosus) জাতীয় পুষ্পের মধ্যভাগে শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট এবং অন্যান্য অংশ সবুজবর্ণ বিশিষ্ট। এই জাতীয় পুষ্পের বৃক্ষ দুই ফুট মাত্র উচ্চ হইয়া থাকে। "ইলেটাম" (Ilatum) জাতীয় পুষ্পের বর্ণ সবুজ এবং এই পুষ্প দেখিতে অত্যন্ত মনোহর। "হেণ্ডার্সনী" জাতীয় পুষ্পের বর্ণ ফিকে সবুজ। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পুষ্প যখন এক সময়ে বাগানে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে তখন বাগানের শোভা কি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় তাহা নিজ চক্ষে না দেখিলে ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ হইতে ফাল্গুন ও চৈত্রের কিছু দিন পর্য্যন্ত এই পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। যে সময় শীত অত্যন্ত প্রবল হয় এবং যে সময় শিশির সঞ্চারিত হইতে থাকে সেই সময়ই "ডেলফিনিয়মের" অপূর্ব্ব শোভা বৃদ্ধি পায়। সেই কারণ বশতঃ পৌষ ও মাঘমাসে এই ফুলের যেরূপ সৌন্দর্য্য থাকে অন্য মাসে সেরূপ সৌন্দর্য্য থাকে না।

"ডেলফিনিয়ম" আমাদের এদেশের পুষ্প নহে। ইংরাজেরা বিলাত হইতে আমাদের দেশে এই পুষ্পের আমদানি করিয়াছেন। এক্ষণে কিন্তু বহুতর

সৌখীন দেশীয় ভদ্রলোকের বাগানে "ডেল্‌ফিনিয়ম" পুষ্প দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা প্রতি বৎসর আমাদের নর্শরির জন্য এই সুন্দর পুষ্পের বীজ বিলাত হইতে আনাইয়া থাকি।

সকল প্রকার মাটিতে "ডেল্‌ফিনিয়ম" পুষ্পের গাছ জন্মায় না। যে দোঁয়াস মাটিতে বালীর ভাগ বেশী থাকে তাহাতে এই ফুলের বীজ রোপণ করিলে অতি শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। মাটিতে বালীর অংশ অধিক থাকিলে উহা হালকা হইয়া থাকে, হালকা মাটি "জেড়ুয়া" ফুলের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই পুষ্পের ক্ষেত্রে সার দিতে হইলে পাতা পচার সারই উত্তম। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে মাটি এরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, যেন উহা বেশ ঝুরা হয়। এই ঝুরা মাটিতে টব বা গামলা পূর্ণ করিয়া তাহাতেই বীজ বপন করিতে হইবে। টবে বীজ বপন করিবার পর টব গুলিকে দিবসে বারান্দায় এবং রাত্রে বাহিরে রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। রাত্রের শিশিরে বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। যতদিন চারা একটু জোরাল না হয় ততদিন উহাতে রৌদ্র লাগান উচিত নহে। টবের মাটির অবস্থা বুঝিয়া উহাতে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করা উচিত। সরু ছিদ্রযুক্ত চোঙাতে করিয়া কিম্বা হস্তে করিয়া জল দেওয়াই কর্ত্তব্য। চারা যখন ৩।৪ তিন চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ হইবে তখন উহা টব হইতে তুলিয়া অন্য টবে বা ক্ষেত্রে রোপণ করা কর্ত্তব্য। এক একটী টবে অধিক সংখ্যক গাছ লাগান উচিত নহে। কারণ তাহাতে গাছের তেজ বেশী বৃদ্ধি হইতে পারে না। গাছ ভালরূপ বৃদ্ধি না পাইলে গাছের গোড়ার মাটি খুড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মোট কথা "ডেল্‌ফি-নিয়ম" বা "লার্কসপার" পুষ্প উপভোগ করিবার ইচ্ছা থাকিলে একটু বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। যত্নের ত্রুটি হইলে গাছ বাঁচান বড়ই কঠিন।

ফাল্গুন মাসে যখন রৌদ্র অত্যন্ত প্রবল হইতে থাকে তখন "লার্কসপার" বৃক্ষও ক্রমে ক্রমে শুখাইতে আরম্ভ করে। এ সময় গাছে প্রচুর পরিমাণে জল সিঞ্চন করিয়াও গাছ বাঁচাইতে পারা যায় না। "লার্কসপার" বৃক্ষ অধিক রৌদ্র কিম্বা অধিক বৃষ্টির উপযোগী নহে। এইজন্য আশ্বিন মাসের শেষ হইতে অগ্র-হায়ণ মাসের কয়েকদিনের মধ্যে উহার বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি আশ্বিন মাসে অধিক পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সে সময়ে বীজ বপন করা উচিত নহে। সাধারণতঃ এই নিয়মটী সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে যতদিন

পর্য্যন্ত শীত আরম্ভ না হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত শিশির সঞ্চারিত না হয় ততদিন কোনও প্রকার বীজই বপন করা কর্ত্তব্য নহে।

উদ্যান-প্রিয় ব্যক্তি মাত্রেরই "লার্কসপার" পুষ্প বড় আদরের সামগ্রী। শীত কালে উদ্যান সাজাইবার জন্য এরূপ ফুল খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সুন্দর পুষ্পের কোনপ্রকার সুগন্ধ নাই। কেবল মাত্র সৌন্দর্য্যের জন্যই এই পুষ্পের আদর।

ছোলা বা বুট।

ছোলা দুই জাতি, শ্বেত ও লোহিত। তন্মধ্যে লোহিত বর্ণই কেবল মাত্র "ছোলা" শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। শ্বেতবর্ণের ছোলাকে "কাবরি" ছোলা বলে। উভয় জাতীয় ছোলার মধ্যে বর্ণভেদ ব্যতীত আবাদ প্রভৃতি অন্য কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই।

ছোলার গাছ তিন পোয়া এক হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্বিন মাসের ১৫ই হইতে অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত ছোলা বুনানি করা চলে। ছোলার বীজ বিঘা প্রতি ✓৭॥০ সাড়ে সাতসের হারে বপন করা কর্ত্তব্য। চাষের মাটিতে বীজ বুনানির পর দুই পালা মৈ দেওয়া আবশ্যক। ছোলা ফাল্গুন মাসের প্রথমেই পাকিয়া থাকে।

ছোলার ক্ষেত্র ভেদ নাই। উপযুক্ত সময়ে যে কোনও ক্ষেত্রে ছোলা বুনিতে পারা যায়, তাহাতেই ছোলা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু বোধ হয় মেটেল মাটিই ছোলার আদি জন্মভূমি। যদিও মেটেল মাটি হইতে এক্ষণে ইহা সকল প্রকার মাটিতেই ব্যাপ্ত হইয়াছে তথাপি, বালি, পলি, লোণাফোট প্রভৃতি কয়েক জাতীয় মৃত্তিকায় ছোলার বৃক্ষ ভালরূপ জন্মে না। পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকা সকলের সহিত যদি কিয়দংশ মাত্র মেটেল মাটির যোগ থাকে, তাহা হইলেই উহাতে ছোলা জন্মিতে পারে। মোট কথা মেটেল মাটিতেই ছোলা উৎকৃষ্টরূপ জন্মাইয়া থাকে। বানচড়া ক্ষেত্র হইলে আরও ভাল হয়।

ছোলার চারা ৫।৬ পাঁচ ছয় অঙ্গুলি উচ্চ হইলেই এদেশের লোকে শাক খাইবার জন্য উহার ডগা কাটিয়া লয়। এইরূপ ভাবে ডগা কাটায় ছোলার

কোনই অনিষ্ট হয় না এবং ইহাতে উপকারই হইয়া থাকে। ডগা কাটিয়া দিলে ছোলার গাছ উত্তমরূপে ঝাড়িয়া উঠে; কিন্তু পৌষ মাসের পনেরইএর পর আর ছোলা গাছের ডগা কাটা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে।

ছোলার ক্ষেত্রে যে কএকটী বিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে কড়া পোকা ও নাট প্রধান। কড়া পোকায় ছোলার মূল ভক্ষণ করিয়া থাকে। মূলে আঘাত লাগিলে গাছ সকল মরিতে আরম্ভ করে। প্রভূত পরিমাণে জল সেচন ব্যতীত কড়া পোকা অন্য কোন উপায়ে নিবারণ করা যায় না।

দক্ষিণ বায়ুর সহিত ছোলার অত্যন্ত অপ্রিয় সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ছোলার গাছ সকল ফলে পরিপূর্ণ হইয়াছে, এমন সময়েও যদি উপর্য্যুপরি চারি পাঁচদিন ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে ছোলার গাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লম্বাকৃতি এক জাতীয় কীট জন্মিয়া সমুদায় ফল ভক্ষণ করিয়া ফেলে। "ইহাকে নাটলাগা" বলিয়া থাকে। ছোলার ক্ষেত্রে নাট লাগিলে কৃষকের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এই সময়ে পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইলে নাট কিছু কম পড়ে, কিন্তু উহা নিঃশেষিতরূপে নিবারিত হয় না।

পশ্চিম বায়ুর সহিত ছোলার সৌহার্দ্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ফুলা মুখে কিছুদিন ধরিয়া পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইলে ছোলার গাছের প্রত্যেক পত্রের সন্ধিস্থলে ফুল ফল ধরিয়া থাকে এবং ছোলার দানাও বিলক্ষণ পুষ্ট হইয়া উঠে।

কোনও কোনও বৎসরে কিছু ব্যতিক্রম হইলেও অধিকাংশ বৎসরেই দেখা যায়, এদেশে মাঘ মাসের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া ফাল্গুনের কতক দিন পর্য্যন্ত পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইবার পরে দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। আশ্বিনের পনেরই হইতে কার্ত্তিকের পনেরই পর্য্যন্ত যে সকল ছোলা বুনানি হয়, মাঘ মাসের পনেরই তাহাদের গাছে ফুল ফল ধরিয়া থাকে। সুতরাং ফুলামুখে প্রায়ই তাহাদের পশ্চিম বায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। আর কার্ত্তিকের পনেরই হইতে অগ্রহায়ণের পনেরই পর্য্যন্ত যে সকল ছোলার বুনানি হইয়া থাকে মাঘ মাসের শেষ হইতে ফাল্গুন মাসের আধা আধি ভিন্ন তাহাদের ফুল ফল ধরে না; কিন্তু অধিকাংশ বৎসরেই এই সময় দক্ষিণ বায়ু বহিতে আরম্ভ করে এবং এই জন্য অতিরিক্ত নাবি ছোলায় প্রায় নাট লাগিতে দেখা যায়। অতএব ছোলা যত অগ্রিম বুনানি হয় ততই ভাল।

সুপক্ক ছোলা কাটাই করিয়া খামারে উত্তমরূপে শুকাইতে হয়। তাহার পর মাড়িয়া কুলায় করিয়া ঝাড়িলেই ছোলা পরিষ্কার হইয়া যায়। ছোলার মাড়ন প্রাতঃকালে হয় না, কারণ ঐ সময় ছোলার গাছ অত্যন্ত নরম থাকে। একপ্রহর বেলার পর ছোলার মাড়ন আরম্ভ করা উচিত।

ছোলার আয় ব্যয়ের হিসাব।

১ বিঘা জমীতে ছোলা বুনিতে চারিখানা লাঙ্গল লাগে

তাহার মূল্য — ৸৹ আনা।

জোতালে মজুর একজন———	—৶৹
বীজ /৭॥৹ সাড়ে সাতসের—	—।/১০
কাটাই খরচ চারিজন মজুর—	—৸৹
বহনি খরচ———	—৶৹
মলাই খরচ, তিনজন মজুর———	॥/৹
খাজনা———	—৸৹
	৩॥১০

উৎপন্ন

মণ	২/৹	৪/৹	৮/৹
মূল্য	৪৲	৮৲	১৬৲
বাদ খরচ	৩॥১০	৩॥১০	৩॥১০
	লাভ ।৵১০	লাভ ৪।৵১০	লাভ ১২।৵১০

পচান জমি হইলে আর চারি খানা
লাঙ্গল লাগে তাহার মূল্য——৸৹
ও জোতালে মজুর একজন———৶৹

মোট বাদ———	৸৶৹	৸৶৹	৸৶৹
	ক্ষতি—।৵১০	লাভ ৩॥১০	লাভ ১১॥১০

শাকসবজীর আকার বড় করিবার উপায়।

পৃথিবীতে যে কোনও বিষয়েরই উন্নতি করিতে হউক না কেন সম্যক যত্ন ও প্রভূত চেষ্টা ব্যতীত কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। শাক সবজীর আবাদ ও উন্নতি এই সর্ব্বজনীন নিয়মের বহির্ভূত নহে। শাকসবজীর আকার বড় করিতে হইলে অগ্রে ক্ষেত্রের অবস্থার উন্নতি করা কর্ত্তব্য। ক্ষেত্রের অবস্থার উন্নতি না করিতে পারিলে ঐ ক্ষেত্রে যে কোনও বীজ বপন করা হউক না কেন কিছুতেই সন্তোষজনক ফললাভ করিতে পারা যাইবে না। চাষীমাত্রেই ইহা অবগত আছে যে, যে পরিমাণে ভূমির পাট করিতে পারা যায় শাকসবজীর আকারও ঠিক সেই পরিমাণে উন্নতি করিতে পারা যায়। একটু যত্নের সহিত আবাদ না করিলে কিছুতেই সুফল লাভের প্রত্যাশা করা যায় না, সুতরাং কোনও আবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে অগ্রে চাষ ও সারাদি দিয়া ক্ষেত্রের উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উর্ব্বরা ক্ষেত্র ভিন্ন শাক-সবজীর আকার কিছুতেই বড় করা যায়না। সাধারণতঃ যে সকল শাকসবজী দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের আকার তত বড় নহে। এই জন্য একটু বিশেষ মনোযোগের সহিত আবাদ না করিলে চলে না। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ক্ষেত্রে অন্ততঃ আড়াই অঙ্গুলি পুরু সার দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের দরিদ্র চাষী জীবিরা ক্ষেত্রে ঐ পরিমাণ সার দিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং সাধারণ চাষীরা শাকসবজীর আকারও তত বড় করিতে পারে না। কিম্বা ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রকারে সার দেওয়ার একটী বিশেষ গুণ আছে। একবার ক্ষেত্রে ঐ পরিমাণ সার দিলে আর দুই তিন বৎসর ঐ ক্ষেত্রে সার দেওয়ার আবশ্যক হয় না।

শাকসবজীর আকারের উন্নতি করাই চাষীর বিশেষ গুণপণা। শাকসবজীর আকার যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় উহাদের বিক্রেয় মূল্যও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। চাষের যে কয়টী অঙ্গ আছে তাহার প্রত্যেকটীতে বিশেষরূপে মনোযোগ না দিলে কিছুতেই উন্নতি করিতে পারা যায় না। অনেক সময় দেখা যায় উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজবপন করিয়াও শাকসবজীর আকার তাদৃশ বড় করা যাইতে পারা যায় না, সুতরাং কেবলমাত্র ক্ষেত্রে সার দিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে

চলিবে না। উপযুক্ত বীজ সংগ্রহ করাও চাষীর একটী প্রধান কর্ত্তব্য। ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণে চাষ ও সার দেওয়া, উত্তম বীজ সংগ্রহ করা এবং উপ-যুক্ত সময় বুঝিয়া আবাদ করাই চাষের প্রধান অঙ্গ। প্রত্যেক কৃষকেরই এই কএকটী অঙ্গের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা উচিত।

শাক সবজীর চাষে ভূমি একটু গভীর করিয়া কর্ষণ করাই আবশ্যক। ক্ষেত্র অন্ততঃ আট অঙ্গুলি পরিমাণ খনন করিলে শাকসবজীর পক্ষে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ক্ষেত্র অল্প খনন করা হইলে ক্ষেত্রের মাটি শক্ত রহিয়া যায়। ক্ষেত্রের মাটি আল্‌গা না থাকিলে ঐ ক্ষেত্রে উক্ত বৃক্ষের শিকড় সকল চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইতে পারে না। বৃক্ষের শিকড় সকল চারিদিকে বিস্তারিত হইতে না পারিলে বৃক্ষের তেজ হয় না, সুতরাং বৃক্ষ সকল উপযুক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলে উহাতে ভাল ফল ফলিতে পারে না। আমাদের দেশের লোকের কিন্তু ভূমি খনন সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যভাবই দেখিতে পাওয়া যায়।

শাক সবজীর ভালরূপ আবাদ করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রকারে ভূমি প্রস্তুত করা উচিত, ক্ষেত্রকে আট অঙ্গুলি পরিমাণ গভীর করিয়া খনন করা কর্ত্তব্য। ভূমি উক্তরূপ খনন করিবার পর, সাড়ে তিন হাত বা চারিহাত চওড়া এবং ইচ্ছানুরূপ লম্বা খণ্ডের উভয়পার্শ্ব হইতে চূর্ণ মৃত্তিকা লইয়া উহার উপর তুলিয়া পার্শ্বস্থ ভূমি অপেক্ষা আটদশ অঙ্গুলি উচ্চ চৌকা প্রস্তুত করিতে হইবে। পার্শ্বের মাটি তুলিয়া দিলে চৌকার উভয় পার্শ্বে জুলির ন্যায় গহ্বর হইবে। ঐরূপ জুলি অন্ততঃ আট অঙ্গুলি গভীর ও চারি অঙ্গুলি চওড়া হওয়া আবশ্যক।

প্রাগুক্তরূপে চৌকা প্রস্তুত করিবার পর উহার উপর বীজ বা চারা রোপণ করা কর্ত্তব্য। সবজীর ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের আবশ্যক হইলে উপরোক্ত চৌকার পার্শ্বস্থ জুলিগুলি জলপূর্ণ করিলেই চলিবে। ইহাতেই চৌকাস্থিত মৃত্তিকা বেশ সরস থাকিতে পারে। তবে জুলির জলে মৃত্তিকা সরস না হইলে বোমা দ্বারা কিম্বা অন্য কোনও প্রকারে চৌকায় জল দেওয়া আবশ্যক। জল সিঞ্চনের সময় সাবধান হইয়া জলসিঞ্চন করা কর্ত্তব্য; কারণ ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ জলসিঞ্চন করিলে অতিরিক্ত জলের জন্য ক্ষেত্রস্থ গাছের শিকড় পচিয়া

গাছ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং কোনও ক্রমেই ক্ষেত্রকে অতিরিক্ত পরিমাণে জলসিক্ত করিয়া রাখা উচিত নহে।

কপি প্রভৃতির চারা ঘন ঘন বসান হইলে তৎক্ষণাৎ উহা তুলিয়া পাতলা করিয়া বসাইয়া দিবে। প্রত্যেক চৌকার উপর চারি পাঁচ হস্ত উচ্চ করিয়া মাচা বাধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐ মাচার উপর প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় কিম্বা অত্যন্ত বৃষ্টির সময় মাদুর অথবা দরমা চাপা দিয়া গাছগুলিকে প্রচণ্ড রৌদ্র এবং বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে হইবে। অত্যন্ত রৌদ্র এবং বৃষ্টির পর মাচা হইতে আবরণ খুলিয়া দিলে চৌকাস্থিত গাছ শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

শাকসবজীর আকার বড় হইলে উহাদের মূল্যই যে কেবল মাত্র অধিক হয় তাহা নহে। শাকসবজীর আকার বড় হইলে উহা দেখিতেও অত্যন্ত নয়নতৃপ্তিকর হইয়া থাকে। যদি উপযুক্ত প্রকারে চাষ করা যায় তাহা হইলে সকল প্রকার উদ্ভিদেরই ফল মূল এবং কাণ্ড প্রভৃতির আকার নিশ্চয়ই বৃহৎ হইতে পারে। আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের বিশেষতঃ সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির মৃত্তিকার উর্ব্বরা শক্তি এত প্রবল, যে এদেশে যে কোনও প্রকার উদ্ভিদই হউক না কেন তাহার আবাদ হইতে পারে। আমাদের দেশের জমীতে সকল দেশেরই অন্ততঃ শাকসবজীর সুচারুরূপে আবাদ হইতে পারে। এই জন্য এদেশে বৎসর বৎসর বিলাত ও আমেরিকা হইতে আনীত অনেক টাকার বীজ বিক্রীত হইতে থাকে।

দোঁ-আঁস আল্‌গা মাটিতেই শাকসবজী উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, একই প্রকারের বীজ বপন করিয়া কেহ কেহ উত্তম ও বৃহৎ আকারবিশিষ্ট সবজী উৎপাদনে সমর্থ হয়েন আবার কেহ কেহ বা তাদৃশ উত্তম ও বৃহৎ সবজী উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয়েন না। অনেকে ইহার কারণ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া নর্শরী হইতে আনীত বীজের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা ঠিক নহে। আবাদ করিবার উপযুক্ত প্রণালী না জানায় এবং উপযুক্ত সময়ে আবাদ না করিতে পারাতেই উত্তমরূপ ফল লাভ করিতে সমর্থ না হইবার প্রধান কারন।

কেহ কেহ শাকসবজীর আকার বৃহৎ করিবার অভিলাষে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ও অযথা পরিমাণে সার দিয়া থাকেন; কিন্তু এ পদ্ধতি নিতান্ত ভ্রান্তি-

মূলক। ক্ষেত্রে যে কোনও প্রকার সার যে কোনও পরিমাণে দিলেই যে উত্তমরূপ আবাদ হইবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই। বরং অন্যায়রূপ এবং অযথা পরিমাণে সার দিলে বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে। ভূমির অবস্থা এবং যে দ্রব্যের চাষ করিতে হইবে তাহার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জমীতে এবং ভিন্ন ভিন্ন বীজ বপনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সার দেওয়া কর্ত্তব্য। যে প্রকার সার যে বীজের পক্ষে উপযুক্ত সেই প্রকার সার যে অন্য বীজের পক্ষে উপযুক্ত হইবেই এমন কোনও নিয়ম নাই। সুতরাং সার দিবার সময় কোন্ কোন্ আবাদে কি কি প্রকার সার কত পরিমাণে দেওয়া আবশ্যক তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া ক্ষেত্রে সার দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের চাষীদিগের প্রধান দোষ এই যে, উহারা শস্যের এবং শাকসবজীর উন্নতি কল্পে কিছুই চেষ্টা করে না। সেই জন্য আমাদের দেশীয় শস্যাদির উন্নতি না হইয়া বরং অবনতিই হইতেছে। উত্তমরূপ বীজ সংগ্রহ করা, জমীতে উপযুক্ত পরিমাণ সার দিয়া উহার উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করা, সময় বুঝিয়া আবাদ করা এবং বৃক্ষ জন্মাইলে উহাদের যথোপযুক্তরূপ তত্ত্বাবধান করা প্রত্যেক চাষীরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

অহিফেন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩ পৃষ্ঠার পর)

অহিফেনের চাষ।—অহিফেন চাষ করিতে হইলে, চাষারা প্রথমতঃ বর্ষাকালে জমীতে উত্তমরূপে সার দিয়া একবার চষিয়া রাখে, পরে আশ্বিন মাসের শেষাশেষী কিম্বা কার্ত্তিক মাসের প্রথমে পুনরায় চষিয়া মই দিয়া ক্ষেত্র সমতল করতঃ বীজ ছড়াইয়া দেয়। বীজ ছড়াইবার পর পুনর্ব্বার একবার চষিতে হয়, তৎপরে ৬।৭ হাত লম্বা এক একটী চৌক ভিলী বাঁধিয়া চৌকার ধারে ধারে জল ছেঁচিবার জন্য নালা প্রস্তুত করিয়া থাকে। ১৫।১৬ দিনের মধ্যে বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। চারাগুলি ৫।৭ অঙ্গুলি বড় হইলে কৃষকেরা গোড়া খুঁড়িয়া ঘাস, মুথা ইত্যাদি উত্তমরূপে বাছিয়া ফেলে। মাঘ মাসের শেষাশেষী গাছে ফুল ধরিয়া থাকে, এই সময়ে ফুলের পাপড়ীগুলি তলায় ঝরিয়া পড়িলে কৃষকপত্নীরা ও তাহাদিগের বালক বালি-

কারা কুড়াইয়া আনিয়া মাটির খোলায় ঈষৎ উষ্ণ করিয়া রুটী* প্রস্তুত করিয়া রাখে। ফুল ফুটিবার প্রায় দুই পক্ষ পরেই পোস্তের ঢেঁড়ী সকল বড় হইয়া উঠে, তখন কৃষাণরা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ঢেঁড়ীগুলির গায়ে লম্বালম্বি আঁচড় দিয়া শ্বেতবর্ণ একরূপ আটা বাহির করিয়া থাকে, সেই আটার দ্বারাই আফিম প্রস্তুত হইয়া থাকে। সূর্য্য উঠিবার পর অর্থাৎ রৌদ্র হইলে, আঁচড় দিলে আর আটা বাহির হয় না। বেশী বৃষ্টি হইলেও আটা ধুইয়া যায়। পরদিবস প্রাতঃকালে কৃষকেরা 'সিতুহা' দিয়া আটা চাঁচিয়া করাসীতে† রাখিয়া দেয়।

সমস্ত আটা চাঁচা হইলে, কৃষকেরা একটী কাঁসার থালায় সেই আটা রাখিয়া দেয়; কিয়ৎক্ষণ পরে আটা হইতে জল বাহির হইয়া আইসে। ঐ জল বাহির না করিলে আফিম খারাপ হইয়া যায়। প্রতিদিন ঐ আটা একবার করিয়া নাড়িয়া থাকে; ঐরূপ নাড়িতে নাড়িতে আটা ঘন হইয়া যায়। ঘন হইতে প্রায় একমাস লাগে, কখন কখন একমাসের অধিকও লাগিয়া থাকে। আফিম ঘন হইলে, মাটির পাত্রে রাখিয়া দেয়। আফিম প্রস্তুত হইলে কৃষকেরা তাহা সরকারি অর্থাৎ গভর্ণমেন্টের গুদামে আনিয়া থাকে, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে গভর্মেণ্টের ইহা একচেটিয়া ব্যবসা। সরকারী গুদামে আফিম ওজন হইয়া থাকে; ওজন হইবার পর কুলিরা একটা চৌবাচ্ছার মধ্যে আফিম জমা করিয়া রাখে, পরে উহা বারকোসে ফেলিয়া চটকাইয়া তাল বাঁধিয়া থাকে। সেই তালের উপরে আফিমের পাতার রুটী চাপা দিয়া লেওয়া‡ মাখাইয়া দেয়। তৎপরে ঐ সকল তাল টিন্ পাত্রে রাখিয়া দেয়। ঐ সকল টিন্পাত্রের নাম "তগর"; তগর গুলি র‍্যাকের উপরে তুলিয়া রাখে ও সেইখানে বালকেরা উহা নাড়াচাড়া করিয়া থাকে, এইরূপে আফিম ক্রমশঃ বায়ুতে শুষ্ক হইয়া যায়। বাঙ্গালায় প্রায় সমস্ত লোকই পোস্তর বীজের বড়া ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। বাস্তবিক পোস্তের বীজের বড়া অতি

* রুটী—খাইবার নহে, এই রুটীর দ্বারা চাষারা আফিম মোড়ক করিয়া থাকে।

† করাসী—ইহা সরার ন্যায় একরূপ মৃতপাত্র বিশেষ।

‡ লেওয়া—একরূপ আটা, নিকৃষ্ট আফিম দিয়া ইহা প্রস্তুত হয়।

উপাদেয় সামগ্রী। মটর কিম্বা মুগের ডাল ভিজাইয়া রাখিয়া তৎপরে উহার সহিত পোস্ত বাটিয়া ঘৃত সংযোগে বড়া প্রস্তুত করিলে অতি উত্তম হয়।

আফিমের গুণ—মাদক; মস্তিষ্কের উত্তেজক; ধারক; বেদনা নিবারক; নিদ্রাকারক; স্বেদজনক; স্পর্শহারক ও পর্য্যায় নিবারক। শিশু ও স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে আফিম ঘটিত ঔষধ প্রশস্ত নহে। স্ত্রীলোকদিগকে বরং অতি সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিতে দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শিশুদিগের কোমলধাতে আফিমঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করা একেবারেই অবিধেয়।

আফিমের প্রধান বীর্য্যের নাম "মর্ফিয়া" এবং এই জন্যই আফিম খাইলে নেশা হইয়া থাকে।

স্থলপদ্ম।

স্থলপদ্ম একটী উৎকৃষ্ট ফুল, ইহা বৎসরে দুইবার ফুটিয়া থাকে, একবার চৈত্র মাসে ও একবার আশ্বিন মাসে ফুটে, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্বিন মাসেই খুব বেশী পরিমাণ ফুটিয়া থাকে, ফুলগুলি দেখিতে খুব সুন্দর হয়।

স্থলপদ্মের ছাল ও পাতা সময় সময় ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহার ফুল দ্বারা তরকারী হয়, তবে তরকারীর মধ্যে ইহার বড়া, খাইতে বেশী সুস্বাদু।

স্থলপদ্মের গাছ জন্মাইতেও বড় কষ্ট হয় না। গাছে মাসে মাসে বীজ হইয়া থাকে। সেই বীজ রোপণ করিলেই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, বীজ রোপণ করিবার সময় কিছু গোবর দিয়া মাটীতে সার করিয়া লইতে হয়। কিন্তু বীজ অপেক্ষা গাছ রোপণ করিয়া ও গাছের ডাল কলম করিয়া রোপণ করাই শ্রেষ্ঠ প্রক্রিয়া। যদি ডাল রোপণ করিয়া গাছ (চারা) করিতে হয়। তবে এক-হাত পরিমাণ একটী গর্ত্ত করিয়া ১৫।২০ দিবস পূর্ব্বে গোবর দিয়া রাখিতে হয়। গোবর একটু পচিয়া গেলে সেখানে ডাল রোপণ করিয়া দিতে হয়। পরে কয়েক দিন জল দিতে হয়। তাহা হইলে ডাল দিয়া অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। বর্ষার প্রারম্ভেই ডাল রোপণ করা শ্রেয়ঃ। গাছের ডাল কলম করিয়া চারা রোপণ করিতে হইলে ফাল্গুনের শেষে কিম্বা চৈত্রের প্রথমে ডাল কাটিয়া গোবরের

মধ্যে অর্দ্ধভাসা রকম রাখিতে হয়। দুইধারে যাহাতে চোকগুলি থাকে (আখের চারা করিবার মত) সেবিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে অথবা ডালের একধার গোবরে পুতিয়া অন্যধারে একটু গোবর ডেলার মত করিয়া রাখিতে হয়। তাহা হইলেই প্রত্যেক চোক দিয়া চারা বাহির হইবে। চারাগুলি একটু বড় হইলেই অন্যস্থানে লইয়া রোপণ করা কর্ত্তব্য। রোপণ করিবার পূর্ব্বে কিছু গোময় দিতে হয়, এবং রোপণের পরে কয়েক দিন জল দেওয়া আবশ্যক। গবাদি পশুতে যাহাতে খাইয়া ফেলিতে না পারে এজন্য বেড়া দেওয়া উচিত।

হাজারি কাঁটাল।

হাজারি কাঁটাল নামে একরূপ কাঁটালগাছ সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। ইহাতে খুব ছোট গাছেই খুব বেশী কাঁটাল ধরে, কিন্তু কাঁটালগুলি তদ্রূপ বড় হয় না। হাজারি কাঁটালগাছ করিবার প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল।

একটা আস্ত কাঁটাল ডাটা উপরদিকে করিয়া মাটির সমানে কোনও স্থানে রোপণ করিতে হইবে। উপরের মুখের উপরে যেন মাটি না থাকে। কাঁটালটী শিয়াল কুকুরে খাইতে না পারে এইজন্য বিশেষ সাবধানে থাকিতে হয়। কয়েক দিন পরে আস্তে আস্তে ডাঁটাটি নাড়িয়া দেখিবে, যদি নরম হইয়া যায়, ও ডাঁটাটি উঠিয়া আসে, তবে তাহা আস্তে আস্তে তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। কয়েক দিন পরে এই ডাঁটার ছিদ্র দিয়া এক ঝোঁপ কাঁটালের চারা উঠিবে। এই চারা গুলির গুঁড়িতে একটু গোময় দিয়া বাঁধিয়া দিবে। একটু বড় হইলেও বাঁধিবে, তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে সকল চারার কাণ্ড (গুঁড়ি) মিলিয়া একটী গাছ হইয়া যাইবে। ইহাই হাজারি কাঁটাল গাছ করিবার একটী সহজ উপায়।

শ্রীবঙ্কুবিহারী দাস,
কাজলধারা।

রুটা বাগা।

(RUTA BAGA.)
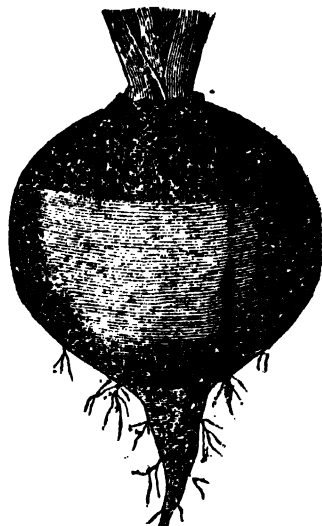
রুটাবাগা এক প্রকার শালগাম্। শালগাম্ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত, এই দুই ভাগের মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে অনেকে শালগামের চাষ করিতে জানিত না, এমন কি শালগামের নাম পর্য্যন্তও জানিত না। এক্ষণে সকলেই প্রায় ইহার চাষ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু ইহার সঠিক বপন ও রোপণ প্রণালী অবগত না থাকায় অনেকেই অনেক সময় বিফল মনোরথ হন। আজকাল বাঙ্গালীর মধ্যে প্রায় সকলেই শালগাম্ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার নিয়মিত রূপ রন্ধন-প্রণালী না জানায় খাইতে তত সুস্বাদু হয় না। বাস্তবিক যদ্যপি ইহা নিয়মিত রূপে রন্ধন করা যায় তাহা হইলে ইহা যে একটী উপাদেয় সামগ্রীতে পরিণত হয় তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহার রন্ধন প্রণালী আমরা সময়ান্তরে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিব।

ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ইহার বিজ আনীত হইয়া থাকে। আমেরিকার বীজই আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক,

কারণ আমেরিকার জলবায়ুর সহিত আমাদের ভারতবর্ষের জলবায়ুর অনেকটা সমভাব লক্ষিত হয়। আমেরিকায় অনেক বীজওয়ালা আছে, তন্মধ্যে "ল্যানড্রেথ কোম্পানিই" ("Landreth and Sons")* সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে শালগাম্ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, সেই সকল শ্রেণীর মধ্যে রুটাবাগা নামক উপরে চিত্রিত ঐ শালগাম্‌টী অতি সুখাদ্য শালগাম্। শালগামের মূলই প্রধান তরকারী, ইহা মৃত্তিকার ভিতর জন্মিয়া থাকে, কতক পরিমাণ বাহিরে দৃষ্ট হয়। ওলকপির ন্যায় ইহার ছোট ছোট গাছ হইয়া থাকে, গাছগুলি প্রায় এক হাত পরিমাণ হয়। শালগামের আকার ও আস্বাদনের বিভিন্নতানুসারে শালগামের শ্রেণী ও মূল্য হইয়া থাকে। সকল শালগামের গঠন প্রায় একই রকম দেখিতে, তবে সার ও জমীর উর্ব্বরতাগুণে কোনটী বৃহৎ ও কোনটী অপেক্ষাকৃত ছোট হইয়া থাকে। শালগাম্ গাছের পাতার রং সব একরকম নহে, ঈষৎ লাল, শাদা, সবুজ প্রভৃতি আভাযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার পাতা কতকগুলি অসমান ও কতকগুলি চৌরস হইয়া থাকে। শালগামের একটী বিশেষ গুণ এই যে, উহা বেশ পুষ্টিকর। চাষারা আজকাল ইহার চাষ করিয়া বিলক্ষণ দু'পয়সা লাভ করে। কলিকাতায় বড়দিনে (X'mas day) ইহা অনেক বিক্রয় হইয়া থাকে, মূল্যও কিঞ্চিৎ চড়িয়া যায়, কারণ সেই দিনে অনেক বাঙ্গালীরা সাহেবদিগকে ভেট দিয়া থাকেন। সাহেবেরা অতিশয় শালগাম্ প্রিয়।

আমাদের দেশে ভাদ্রমাসের শেষ হইতে আশ্বিনমাসের শেষ পর্য্যন্ত শালগামের বীজ বপন করা উচিত, বিলম্বে পুঁতিলে গাছ জন্মিয়া থাকে বটে কিন্তু অকালে গাছ পাকিয়া গিয়া শালগাম্ তদ্রূপ বড় হইতে পায় না অথচ ফসলও বিলম্বে হইয়া থাকে। চাষে লাভ করিতে হইলে অগ্রে ফসল তৈয়ার করাই শ্রেয়ঃ, কারণ যত আগে হইবে, লাভের সম্ভাবনা ততই অধিক। শালগাম্, কপি প্রভৃতি সবৃজি বিলম্বে বপন করার আরও একটী অসুবিধা এই যে, ইহাতে গাছে পোকা লাগিবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে ও মূল সহজে সিদ্ধ হয় না। অতএব যে কোন ফসল হউক না কেন সময় বুঝিয়া চাষ করা

* আমাদের "ইম্পিরিয়াল নর্শরীতে" প্রতিবৎসর (Landreth and Son's) ল্যানড্রেথ কোম্পানির নিকট হইতে প্রচুর বীজ আমদানী হইয়া থাকে।

অবশ্য কর্ত্তব্য। সময় বুঝিয়া চাষ করা যেমন আবশ্যক, ফসলের ঠিক অবস্থা বুঝিয়া ব্যবহার করাও সেইরূপ কর্ত্তব্য, কারণ মূল অধিক দিন মাটির ভিতর থাকিলে শক্ত হইয়া যায় এবং খাইতেও তত সুস্বাদু হয় না।

"রুটা বাগা" বা যে কোন জাতীয় শালগাম্ হউক না কেন, দো-আসলা মাটিই ইহাদের পক্ষে উত্তম। মূল প্রধান গাছের পক্ষে আল্গা মাটিই বিশেষ উপযোগী কারণ মাটি যে পরিমাণে আল্গা হইবে মূলও সেই পরিমাণে বাড়িবে। মাটি যত আল্গা হইবে মূলের পক্ষে ততই উত্তম, সেই নিমিত্ত অগ্রে ভাল করিয়া মৃত্তিকার পাইট্ করা আবশ্যক।

"রুটা বাগার" বীজ প্রথমতঃ চৌকায় বপন করিলে ভাল হয়। (কিম্বা সার দেওয়া ক্ষেতে বীজ ছড়াইয়া চাষ করিলেও চলিতে পারে।) চৌকায় চারাগুলি যখন ২৷৷০ আড়াই কিম্বা তিন ইঞ্চি আন্দাজ লম্বা হইবে অর্থাৎ ৫।৬টী পাতা বাহির হইবে, তখন তাহা তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করা আবশ্যক। চারা অধিক ঘন করিয়া রোপণ করা অনুচিত, প্রত্যেক চারাটী আন্দাজ ১০।১২ আঙ্গুল অন্তর রোপণ করা উচিত। গাছ ঘন করিয়া রোপণ করিলে, পরস্পর সংলগ্ন থাকায়, মূল ভাল করিয়া বাড়িতে পারে না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মাটি খুব আল্গা অর্থাৎ ঝুরা হওয়া আবশ্যক; মাটি আল্গা হইলে মূল গা মেলিয়া বাড়িতে পারে। কঠিন মাটি হইলে ইহা তদ্রূপ বাড়িতে পারে না, সুতরাং ইহার আকারও ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে; এইরূপে মূলের আকার ক্ষুদ্র হইলে অনেকে অযথা বীজের উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। বীজের দোষে অনেক স্থলে ঐরূপ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু চাষের অযত্ন হইলে বীজ ভাল হইলেও উক্তরূপ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং মৃত্তিকার পাইটের ও সারের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। "রুটা বাগার" মাটি মূলার ন্যায় অধিক গভীর না করিলে চলে বটে, কিন্তু আশ-পাশের মাটি মূলার ন্যায় ফাঁপা হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়, এই জন্য ক্ষেত্রে চারা লাগান হইতে সর্ব্বদা মৃত্তিকার পাইট্ ও গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়।

সন্তান প্রতিপালন কার্য্যে যেমন পিতামাতার একটু যত্নের ত্রুটী হইলে সন্তানের নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে এবং তাহাদের শারীরিক উন্নতির

পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে, সেইরূপ চাষী ব্যক্তিদিগের চাষ, আবাদ ও গাছ পলার প্রতি অযত্ন হইলে ফসলাদির পক্ষেও ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। এইজন্য সর্ব্বদাই স্বয়ং ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধারণ করা আবশ্যক। নিজে না দেখিলে কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। "রুটা বাগার" গোড়ায় যদ্যপি ঘাস মূথা প্রভৃতি কোন বুনো গাছ জন্মায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। জলসিঞ্চনাদি মাটির অবস্থা বুঝিয়া করা আবশ্যক; খুব অধিক জল দেওয়া খারাপ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চাষের দোষে বীজ ভাল হইলেও ফসল খারাপ হইয়া থাকে আবার তেমনি চাষের গুণে বীজ খারাপ হইলেও ফসল তদপেক্ষা উত্তম হইয়াছে ইহা দেখা গিয়াছে।

চাষীরা একত্রে সকল রকম শালগামের বীজ বপন করে বলিয়া তাহারা এক রকম ফসল পায় না; কোনটী ছোট, কোনটী তাহার মধ্যে বড়, কোনটী মাঝারি ইত্যাদি পাঁচ রকমের পাইয়া থাকে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় শালগাম ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চাষ করিলে তাহাদের আকৃতিগত পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় ও কোন বীজের কিরূপ ফসল হইল তাহারও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এদেশে শালগামের গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইতে ভালরূপ শালগাম্ জন্মায় না এবং মূল আমেরিকার বীজের ন্যায় তত উৎকৃষ্ট হয় না। অন্য অন্য জাতীয় শালগামের চাষ ও তাহাদিগের বিস্তৃত বিবরণ বারান্তরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

তামাকের চাষ।

বঙ্গদেশে তামাকের বিলক্ষণ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। তাম্রকূট সেবনে আরাম বোধ করেন না, এরূপ বাঙ্গালী অত্যন্ত বিরল। আমরা অদ্য এই সর্ব্বজনপ্রিয় তামাকের আবাদের বিষয় আমাদের পাঠকবর্গের গোচরে আনিব।

কোনও জলাশয়স্থ ভূমির নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রেই তামাকের আবাদ করা কর্ত্তব্য। তামাকের ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত উচ্চ হওয়া আবশ্যক, কারণ ক্ষেত্রে

বর্ষায় জল আটকাইয়া থাকিলে তামাকের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্ট হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের মাটি দো-আঁশ হইলেই ভাল হয়।

উপরোক্ত রূপ ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া উহাতে কার্ত্তিক মাসের প্রথম হইতে চাষ দেওয়া আবশ্যক। কার্ত্তিকমাসের প্রথম সপ্তাহে একবার চাষ দিয়া পুনরায় ঐ মাসের শেষে একবার কি দুইবার চাষ দিতে হইবে। তৎপরে প্রতি পক্ষে অর্থাৎ পনর দিন অন্তর জমীতে একবার করিয়া চাষ দিলেই চলিবে। জমীতে কোনও প্রকার ঘাস বা আগাছা থাকিলে তাহা যত্নের সহিত উঠাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। এইরূপ চাষ দিয়া ফাল্গুনমাসে জমীতে সার দিতে হইবে। তামাকের জমীতে তিন প্রকার সার দেওয়া যাইতে পারে—

(১) গৃহস্থ গৃহের ঝাঁট দেওয়া ওঁচলা মাটি প্রভৃতি। এই সার তামাকের পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট। এইরূপ সার প্রতি বিঘায় দশ গাড়ী পরিমাণ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই সার না হইলে—

(২) পচা গোবরের সার দেওয়া যাইতে পারে। ইহা প্রতি বিঘায় পাঁচ গাড়ী পরিমাণ দিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। এতদ্ভাবে—

(৩) পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের পঙ্কদ্বারা ক্ষেত্র আবৃত করিয়া দিলেও চলিতে পারে।

উপরোক্ত তিন প্রকার সার ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার সার তামাকের ক্ষেত্রে প্রদান করা উচিত নহে। কেহ কেহ তামাকের ক্ষেত্রে খইলের সার প্রদান করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের বিবে-চনায় তামাকের ক্ষেত্রে খইলের সার দিলে অনেক অনিষ্ট হইতে পারে। খইলের সারে অতি শীঘ্র শীঘ্র তামাকের গাছগুলি বড় হইয়া উঠে সুতরাং উহার পাতাগুলি তত পরিপুষ্ট হইতে পারে না। অপুষ্ট তামাকের পাতা শুষ্ক হইলে তিক্ত আস্বাদনযুক্ত হয়। এই নিমিত্ত তামাকের ক্ষেত্রে খইলের সার দেওয়া কোনও প্রকারেই উচিত নহে।

ক্ষেত্রে সার দেওয়ার পর মই দিয়া সারের সহিত ক্ষেত্রের মাটি যথারীতি মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে বিশেষ সাবধান হইয়া ক্ষেত্র রক্ষা করা কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে ক্ষেত্রের জল জমী হইতে একেবারে বাহির হইয়া গেলে জমীর উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। চৈত্র হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত ছয়মাসের

মধ্যে প্রতিমাসে একবার করিয়া দোয়ায় চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐরূপে চাষ দিলে ক্ষেত্রে ঘাস ও অন্য কোনও রূপ আগাছা উৎপন্ন হইতে পারে না। বর্ষাকালে চাষ দিবার বড়ই অসুবিধা। বর্ষার জলে মাটি নরম হইয়া কাদায় পরিণত হইলে জমীতে চাষ দেওয়ায় কোনই ফল নাই। বরং উহাতে অনিষ্ঠ হইতে পারে। বর্ষাকালে যে দিন মাটি শুষ্ক অবস্থায় থাকে সেই দিনই চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য।

উপরোক্ত প্রকারে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার পর ভাদ্রমাসের প্রথমে তামাকের চাষ করিয়া বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। যে ক্ষেত্রে তামাকের বীজের তলাফেলা করা হইবে, উহা একটু উচ্চ হইলেই ভাল হয়। ঐ জমীতে বৈশাখ মাসে কাঠা প্রতি ১০।১২ দশবার সের ৩।৪ তিন চারি বৎসরের পুরাতন গোময় গুঁড়া করিয়া উহা মাটির সহিত রীতিমত মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। এই সময়ে ঐ জমীতে পুরাতন জলাশয়ের পাঁক কিছু পরিমাণ দিতে পারিলে খুব ভাল হয়। পরে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে সাবধান হইয়া হাপর হইতে ঘাস ও আগাছা প্রভৃতি তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। হাপরে একবার মই দিয়া সমস্ত মাটি সমান করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ইহার পর ভাদ্রমাসের প্রথমে যখন বৃষ্টি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই দেখিবে সেই সময়ে বীজ পাতা দেওয়া আবশ্যক। বীজ পাতা দিবার সময় যদি হাপরের মাটি শুষ্ক ও ঝরঝরে থাকে, তাহা হইলে উহাতে একবার লাঙ্গল বা কোদাল দ্বারা উত্তমরূপে চাষ দিয়া এবং চাষ দিবার পর উহাকে একবার মই দিয়া সমস্ত মাটি সমান করা কর্ত্তব্য। যদি উপরোক্ত প্রকারে চাষ ও মই দিবার পরও হাপরের মাটি সমান না হয়, তাহা হইলে হস্তদ্বারা ডেলা প্রভৃতি গুঁড়া করিয়া দিয়া হাপরের মাটি সমান করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

উপরোক্ত প্রকারে হাপর প্রস্তুত হইলে উহাতে তামাকের বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

গেই-লার্ডিয়া।

(GAI LARDIA)
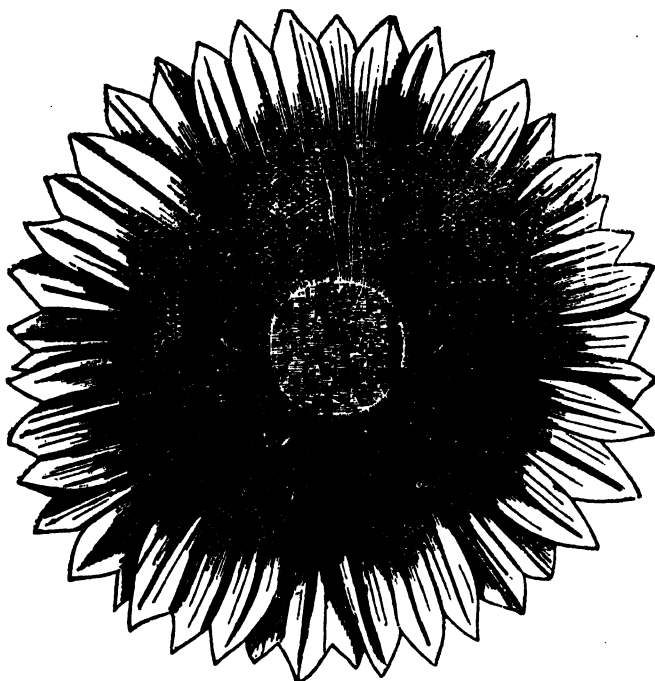
উপরে যে নয়ন মনোহর পুষ্পের সুন্দর প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল উহাই "গেই-লার্ডিয়া" পুষ্পের প্রতিকৃতি। উদ্যানপ্রিয় ব্যক্তিগণ "গেই-লার্ডিয়া" পুষ্পের বড়ই আদর করিয়া থাকেন। পুষ্পের প্রতিকৃতি দেখিলে হটাৎ আমাদের দেশস্থ সূর্য্যমুখী পুষ্প বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। "গেই-লার্ডিয়া" বিদেশস্থ ঋতুপুষ্প বিশেষ। তবে আমাদের দেশস্থ সূর্য্যমুখী পুষ্পের আকারের সহিত ইহার আকারের কিছু সৌসাদৃশ্য আছে মাত্র। এই পুষ্প দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। যখন উদ্যানে এই পুষ্প প্রচুর পরিমাণে প্রস্ফুটিত হয়, তখন যেন উদ্যানভূমি একবারে আলো করিয়া থাকে। উপরে যেরূপ প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, এদেশে সাধারণতঃ "গেই-লার্ডিয়ার" আকার তত বড় হয় না;

তবে বিশেষরূপ পাইট করিলে কোন কোনও সময় ঐ আকারের ফুলও প্রস্ফুটিত হইতে দেখা যায়।

বর্ণ ভেদে গেইলার্ডিয়া পুষ্প তিন প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। কমলা-নেবুর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, লালবর্ণ বিশিষ্ট এবং বেগুণে বর্ণ বিশিষ্ট যে সকল পুষ্পের মধ্যস্থল বেগুণে বর্ণ বিশিষ্ট এবং দল সমূহ স্বুবর্ণ বর্ণ বিশিষ্ট এবং দলের প্রান্তভাগ লালবর্ণ বিশিষ্ট তাহাকে পিক্টা (Picta) কহে।

যে সকল পুষ্পের দলসমূহ লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট এবং দলের প্রান্তভাগ শ্বেতবর্ণ রেখান্বিত তাহাকে য়্যালবা মার্জিনেটা (Alba marginata) কহে। যে সকল পুষ্পের মধ্যভাগ বেগুণে বর্ণ বিশিষ্ট দলসমূহ লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট এবং দলের প্রান্তভাগ হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট তাহাকে হাইব্রিডা গ্রেণ্ডিফ্লোরা (Hybrida grandiflora) কহিয়া থাকে। উপরে যে তিন শ্রেণীর গেইলার্ডিয়া পুষ্পের কথা বলা হইল উহাদের প্রত্যেকের সৌন্দর্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এই তিন শ্রেণীর পুষ্পই দেখিতে অত্যন্ত মনোহর; পুষ্পের আকৃতি ও সৌন্দর্য্য প্রতিকৃতি দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। স্বচক্ষে না দেখিলে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কেবলমাত্র বর্ণনা পাঠ করিয়া কিম্বা প্রতিকৃতি দেখিয়া সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, গেইলার্ডিয়া এক প্রকার ঋতুপুষ্প। কিন্তু অন্যান্য ঋতুপুষ্প হইতে ইহার প্রকৃতিগত কিছু বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য ঋতুপুষ্পের গাছ যেমন শীঘ্র শীঘ্র মরিয়া যায়, গেইলার্ডিয়ার গাছ সেরূপ নহে। কোনও কোনও প্রকার ঋতুপুষ্পের বৃক্ষ শীতের শেষ হইলেই শুকাইয়া মরিয়া যায়। গেইলার্ডিয়া বৃক্ষে বর্ষাকাল হইতে শীত পর্য্যন্ত প্রচুর ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। গেইলার্ডিয়া বৃক্ষ তত কোমল প্রকৃতির বৃক্ষ নহে, ইহা একরূপ আগাছা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গেইলার্ডিয়া ক্ষেত্রে ও টবে উভয় স্থানেই জন্মিতে পারে। তবে টব অপেক্ষা ভূমিতে বৃক্ষ রোপণ করিলেই ভাল হয়। গাছ প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে টবে চারা প্রস্তুত করিয়া তাহার পর স্থানান্তরে রোপণ করাই কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ টব দোঁ-আস মাটির দ্বারা পূর্ণ করা আবশ্যক। এই পুষ্পের পক্ষে মাটি গোবর কিম্বা পাতার সারই প্রশস্ত। ঋতুপুষ্পের পক্ষে মাটি এবং গোবর অপেক্ষা পাতার সারই অধিকতর উপযোগী। যে সারই হউক না,

উহার টাট্‌কা অবস্থা বৃক্ষের পক্ষে উপকারী নহে। টাট্‌কা সারে গাছের তেজ নষ্ট হইয়া যায় এবং উহাতে গাছে পোকা লাগিতেও পারে। গাছে পোকা লাগিলে গাছ রক্ষা করা বড়ই কঠিন। পোকার পক্ষে ছাই, হুকার জল প্রভৃতি উত্তম ঔষধ। সময়ে সময়ে হস্তে করিয়া মারাও আবশ্যক হইয়া উঠে। পিপীলিকা লাগিয়াও অনেক সময় গাছের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। গাছে পিপীলিকা লাগিলে হরিদ্রার জলসিঞ্চন দ্বারা পিপীলিকা দূরিভূত হইতে পারে।

গেইলার্ডিয়ার বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকারের হয়। এজন্য অত্যন্ত সাবধানতার সহিত এই বীজরক্ষা করা ও বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করা কর্ত্তব্য। অত্যন্ত ক্ষুদ্র বীজের উৎপাদিকাশক্তি অতি সহজেই বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বীজবপনের পর জলসিঞ্চনের সময় খুব অল্প অল্প করিয়া মৃদুভাবে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ বীজে অত্যন্ত তেজের সহিত জল পতিত হইলে জলের ভারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজগুলি মাটির নিম্নদেশে যাইয়া পড়িতে পারে কিম্বা বীজ সকল একত্রে জমাট হইয়া যাইতে পারে। ইহাতে বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। সুতরাং বীজের উপর জলসিঞ্চন করিতে হইলে ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত বোমার দ্বারা ধীরে ধীরে জলসিঞ্চন করাই কর্ত্তব্য।

টবের মাটি উত্তমরূপে গুঁড়া করা আবশ্যক। মাটির যত পাইট হইবে বৃক্ষও তত তেজস্কর হইবে। টবে মাটি পুরিবার পূর্ব্বে উহা হইতে ঘাস মূথা ও ইটের কুচি প্রভৃতি আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। মাটি এরূপ হওয়া আবশ্যক যেন উহা অঙ্গুলি স্পর্শে বসিয়া যায় এবং অল্প পরিমাণ জলদ্বারাই সমুদয় মাটি সমান ভাবে ভিজিয়া যায়।

উপরোক্ত প্রকারে টবে মাটি ছড়াইয়া উহাতে গেইলার্ডিয়ার বীজগুলি খুব পাতলা করিয়া ছড়ান আবশ্যক। সাবধান হইয়া ছড়াইতে হইবে, যেন অনেক বীজ একত্রে দলবদ্ধ হইয়া না পড়ে। বীজ ছড়াইবার পর টবের উপর পুনরায় গুঁড়া মাটি ছড়াইতে হইবে। মাটি ছড়াইবার সময়েও বিশেষ সাবধান হইয়া মাটি ছড়ান আবশ্যক। যেন মাটির চাপে বীজগুলি চাপা না পড়ে। টবে বীজ রোপণ করিবার পর ঐ টব রৌদ্রে রাখা উচিত নহে। রাত্রের শিশির ও প্রাতঃকালের সামান্যরূপ রৌদ্র লাগান উচিত। মধ্যাহ্ন-

কালের প্রচণ্ড রৌদ্র হইতে টবগুলি যেন দূরে থাকে। এইরূপ ভাবে বীজ বপন করিলে ৫।৭ পাঁচ সাত দিবসের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। বীজ হইতে উৎপন্ন চারা যখন ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে তখন উহাকে ক্রমে ক্রমে রৌদ্র সহ্য করান কর্ত্তব্য। টবের চারা ৪।৫ চারি পাঁচ অঙ্গুলি বড় হইলে উহাদিগকে টব হইতে তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করা কর্ত্তব্য। টবের মাটির যেরূপ পাইটের কথা বলিয়াছি চারা রোপণের ক্ষেত্রের মাটিরও সেইরূপ পাইট করা আবশ্যক। বীজ বপনের পর দিবস হইতে টবে সর্ব্বদা জলসিঞ্চন করা কর্ত্তব্য। অতিরিক্ত জলসিঞ্চন করাও উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে টবস্থ বীজ ও অঙ্কুর বা গাছ পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। গাছের গোড়ায় মাটি কঠিন হইলে তাহা মধ্যে মধ্যে খুসকাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গাছের গোড়া আল্‌গা না থাকিলে গাছ তেজের সহিত বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

গেইলার্ডিয়ার চারা প্রথমে আমরুল গাছের ন্যায় ক্ষুদ্রায়তনের হয়। পরে ঐ চারা হইতে অনেকগুলি ডগা বা ডাল বাহির হইয়া একটী ঝাড় বাঁধিয়া উঠে। এইরূপ ঝাড়ের প্রায় প্রত্যেক ডগাতেই এক একটী পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। যখন ঝাড়ের প্রত্যেক ডগাতে এক একটী গেইলার্ডিয়ার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তখন গাছের শোভা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ইচ্ছা করিলে সকলেই গেইলার্ডিয়া বৃক্ষ রোপণ করিয়া উহার পুষ্পের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারেন। ইহা টবে রোপণ করিয়া বারাণ্ডায় রাখিলে অতি সুন্দর দেখায়।

গেইলার্ডিয়ার ফুলে কোনও প্রকার গন্ধ নাই। কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের জন্যই পুষ্পপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিকট ইহার এত আদর ও যত্ন।

এই সুন্দর পুষ্পের বীজ এদেশেও উৎপন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু এদেশী বীজে বৃক্ষ ভালরূপ তেজস্কর হয় না এবং উহার পুষ্পও তাদৃশ বৃহদাকারের হয় না। এই জন্য দেশী বীজ বপন না করিয়া বিলাত হইতে আনীত বীজই বপন করা কর্ত্তব্য।

আমাদের নর্শরিতে এই সুন্দর পুষ্পের বীজ পাওয়া যায়।

ডায়ন্থস্।

(DIANTHUS)

নানাবিধ মনোহর ঋতুপুষ্পের মধ্যে "ডায়ন্থস্" দেখিতে অতি সুন্দর। "ডায়ন্থস্" পুষ্প শীত ঋতুতেই প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। যখন উদ্যানে একত্রে বহু সংখ্যক "ডায়ন্থস্" পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তখন উদ্যান এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। নিজচক্ষে না দেখিলে ইহার সৌন্দর্য্য কেবল মাত্র বর্ণনা দ্বারা বুঝান যায় না। এই ফুল ক্ষেত্র ও টবে উভয় স্থানেই রোপণ করা যাইতে পারে। তবে টব অপেক্ষা উদ্যানে রোপণ করিলে ইহার এক অপূর্ব্ব শ্রী হয়। উদ্যানভূমির সমতল ক্ষেত্র হইতে কতক জায়গায় ৯।১০ নয় দশ ইঞ্চ মাটি তুলিয়া ফেলিয়া গর্ত্ত করিয়া ঐ গর্ত্তে "ডায়ন্থসের" বীজ বপন করিলে এক আশ্চর্য্যজনক শোভা হইয়া থাকে। "ডায়ন্থসের" গাছ প্রায় ৯।১০ নয় দশ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে এবং গাছের মস্তকে ফুল ফুটিয়া থাকে। সুতরাং যখন পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তখন উহারা উদ্যান ভূমির সমতল ক্ষেত্রের সহিত সমান ভাবে বিরাজ করিতে থাকে। এই সময় দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন উদ্যান ভূমির সমতল ক্ষেত্রের উপর একখানি গালিচা পাতা রহিয়াছে। "ডায়ন্থসের" নানাবিধ বর্ণ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও ফুল ঘোর লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট, কোনও ফুল ঈষৎ লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট এবং কোনও ফুল অল্প কাল আভাযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বর্ণ বৈচিত্র্য নিবন্ধন দূর হইতে দেখিলে "ডায়ন্থস্" পুষ্পরাশিকে প্রকৃতই একখানি নানা বর্ণ বিশিষ্ট গালিচা বলিয়া ভ্রম হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"ডায়ন্থস্" পুষ্প নানা প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রস্তাবের

শিরোভাগে যে দুইটী চিত্র প্রদত্ত হইল, উহা দুই প্রকার পুষ্প; দুইই স্বতন্ত্র শ্রেণী। "ডায়ন্থস্" সিঙ্গেল বা একদল বিশিষ্ট এবং ডবল বা দ্বিদল বিশিষ্ট হইয়া থাকে। সিঙ্গেল অপেক্ষা ডবলের সৌন্দর্য্য অধিক।

"ডায়ন্থসের" গাছ প্রস্তুত করিয়া পুষ্প উপভোগ করা কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। অন্যান্য ঋতুপুষ্প যে প্রকারে রোপণ করিতে হয় এই পুষ্পের রোপণ প্রণালীও ঠিক সেইরূপ। বালিযুক্ত মাটিতেই "ডায়ন্থস্" পুষ্পের বৃক্ষ ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। ক্ষেত্রে পাতার সার দিলেই যথেষ্ট। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্র পরিষ্কার করা আবশ্যক। মাটি যত ঝুরা হয় ততই ভাল। কারণ মাটি শক্ত থাকিলে "ডায়ন্থসের" কোমল শিকড় উহা ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারে না সুতরাং শিকড় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া না পড়িলে গাছও ভালরূপ জন্মে না। বীজ বপনের পর ক্ষেত্রের মাটি সর্ব্বদা ভিজাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। মাটি শুষ্ক হইয়া গেলে বীজ অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। ক্ষেত্রে জলসিঞ্চন যেরূপ আবশ্যক আবার অতিধীরে নিড়ান দ্বারা ক্ষেত্র খুসিয়া দেওয়াও সেইরূপ আবশ্যক। গাছ ভালরূপ বর্দ্ধিত হইলে ফুলও উত্তম হয় এবং কিছু অধিক দিন ধরিয়া পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে আশ্বিন মাসের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত "ডায়ন্থসের" বীজ বপন করা যাইতে পারে। যে বৎসর ভালরূপ শীত হয় না, সে বৎসর "ডায়ন্থসের" বৃক্ষ ভালরূপ জন্মায় না। কারণ উপযুক্ত পরিমাণ শিশির পাইলেই "ডায়ন্থসের" বৃক্ষ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। সমস্ত শীত কালই ইহার ফুল উপভোগ করিতে পারা যায়, গ্রীষ্মাগমে অত্যন্ত রৌদ্রের তেজে "ডায়ন্থসের" গাছ সকল শুকাইয়া মরিয়া যায়।

"ডায়ন্থসের" বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে যে সকল গাছ বেশ তেজাল, সেই সকল গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। আমরা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এদেশে সংগৃহীত বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ বিলাতী বীজোৎপন্ন বৃক্ষের ন্যায় তেজাল হইয়া থাকে। তবে এদেশে সংগৃহীত বীজ হইতে দুই তিন বৎসর চারা উৎপন্ন করিবার পর আর ঐ বীজের তত তেজ থাকে না। সুতরাং সেই সময় দেশীয় বীজ পরিত্যাগ করিয়া বিলাতী বীজ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

আমরা প্রতি বৎসর এই সুন্দর ঋতু পুষ্পের বীজ বিলাত ও আমেরিকা হইতে আনাইয়া থাকি। এই বীজের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র, সুতরাং উহা অত্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক কাঁচের শিশির মধ্যে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

যত্ন ও চেষ্টা করিলে বর্ষাকালেও "ডায়ন্থস" পুষ্প প্রস্ফুটিত করিতে পারা যায়। টবেতে বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়া উহাতে বরাবর জলসিঞ্চন করিতে পারিলে যদিও শীতান্তে গাছ শুকাইয়া যায়, কিন্তু জল সিঞ্চনের গুণে উহার মূল নষ্ট না হওয়ায়, বর্ষাকালে উহা হইতে আবার নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। ইচ্ছা করিলে এই অঙ্কুর তুলিয়া অন্য ক্ষেত্রে রোপণ করাও যাইতে পারে। যদিও এত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া বর্ষাকালে ফুল ফুটান যায়, কিন্তু ইহা শীতঋতুর পুষ্প বলিয়া শীতকালেই উত্তমরূপ প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

সাচিকুমড়ার আবাদ।

আমাদের বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রেই সাচিকুমড়ার আবাদ পরিলক্ষিত হয়। সাচি-কুমড়া, দেশী ও চালকুমড়া নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে এক একটী সাচিকুমড়া ৫।৭ পাঁচ সাত টাকা মূল্যেও বিক্রীত হইতে দেখা যায়। সাচিকুমড়া কেবল মাত্র যে ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত কুমড়ার কথনই ৫।৭ পাঁচ সাত টাকা মূল্য হইতে পারে না। উহা ৫১০ অর্দ্ধ আনা হইতে ১০ এক আনা বা বড় অধিক হয় ত ৵০ দুই আনায় বিক্রীত হইতে পারে। সাচিকুমড়া নানাবিধ কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত হয়। কুমড়া যত পুরাতন হইবে উহার মূল্যও তত অধিক হইবার সম্ভাবনা। যদি এক বৎসরের পুরাতন কুমড়া ১৲ এক টাকায় বিক্রয় হয় তাহা হইলে ৭ বৎসরের পুরাতন কুমড়া নিশ্চয়ই সাত টাকায় বিক্রয় হইতে পারে। শুনিয়াছি এক একটী কুমড়া ১০৲ দশ টাকা মূল্যেও কখন কখন বিক্রীত হইয়াছে। ব্যঞ্জন ও ঔষধাদি প্রস্তুত করণ ব্যতীত অন্য প্রকারেও সাচিকুমড়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে মিষ্টান্নের দোকানে সাচিকুমড়ার মোরব্বা ও বরফি যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে।

সাচিকুমড়ার আবাদের কোনও নির্দ্দিষ্ট জমী নাই। উহা সকল প্রদেশে,

সকল প্রকার জমীতে এমন কি বন, জঙ্গলে, গৃহস্থের চালে ও ছাদে সকল স্থানেই সাচিকুমড়ার গাছ জন্মিতে পারে। তবে ইহার রোপণ প্রণালী বীজানুসারে নানা প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

যে সকল সাচিকুমড়া ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত করিতে হয়, তাহার বৃক্ষ রোপণ করিতে হইলে এক বৎসর রক্ষিত কুমড়ার বীজ রোপণ করা কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে যদি কুমড়াকে বেশীদিন রাখিয়া অধিকমূল্যে বিক্রয় করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বহুবৎসর রক্ষিত পুরাতন কুমড়ার বীজই রোপণ করা উচিত। এক বা দুই বৎসর রক্ষিত কুমড়ার বীজে যে কুমড়া উৎপন্ন হয় তাহা বেশীদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে না।

যে জমীতে সাচিকুমড়ার আবাদ করা স্থির হইবে, সেই জমীতে চৈত্র মাসে ১৷৷৹ দেড়হস্ত প্রস্থ ও দেড়হস্ত গভীর একটী গর্ত্ত খনন করিয়া উহা খড়কুটা ও মাটির দ্বারা পূর্ণ করা আবশ্যক। পরে ঐ গর্ত্তে জলসিঞ্চন দ্বারা গর্ত্তস্থ মাটি পচাইয়া ফেলা উচিত। বৈশাখ মাসের প্রারম্ভেই গর্ত্তের মাটি খুঁড়িয়া উত্তমরূপে গুঁড়া করতঃ উহাতে ৪।৫টী বীজ রোপণ করা কর্ত্তব্য। বীজ রোপণ করিবার পর চারি পাঁচ দিন প্রাতঃ ও সন্ধ্যা কালে উহাতে জলসিঞ্চন করা আবশ্যক। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হইলে আর উহাতে প্রত্যহ জল দিবার প্রয়োজন হয় না। এই সময়ে তোলাজল অপেক্ষা বৃষ্টির জলই অধিকতর উপকারী, সুতরাং এই সময়ে কুমড়ার গাছে তোলা জল না দিয়া বৃষ্টির জলের জন্য অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য।

কুমড়ার গাছে যখন ২।৩ দুই তিনটী পাতা উৎপন্ন হয়, তখন গাছে এক প্রকার পোকা লাগিয়া গাছের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। ছাইচূর্ণ, হুকার জল কিম্বা তামাকের পাতা ভিজান জল দ্বারা এই সকল পোকা বিনষ্ট হইতে পারে। পরে কুমড়ার গাছ যখন প্রায় একহস্ত পরিমাণ দীর্ঘ হইবে তখন উহাকে কোনও দণ্ডের (যথা, কাটী, কঞ্চি বা বাখারী) সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

পরে একটী মাচান করিয়া উহারই উপর সাচিকুমড়ার গাছগুলি তুলিয়া দিবে। মাচান অপেক্ষা খড়ো ঘরের চালের উপর এই কুমড়ার গাছ তুলিয়া দিতে পারিলে উহাতে অধিক সংখ্যক ফল ফলিতে পারে। চালের উপর

এই কুমড়া তালরূপ জন্মায় বলিয়া ইহাকে "চালকুমড়া" বলিয়া থাকে। ভূমি ও ছাদ অপেক্ষা চালের উপর উত্তমরূপ কুমড়া জন্মিবার অনেক কারণ আছে। জমীর মাটি লাগিয়া কুমড়ার জালিগুলি অনেক সময় নষ্ট হইয়া যায় ছাদের গরমেও উহাদের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। খড়োচালে কিন্তু মাটি ও গরম কিছুরই ভয় নাই। অধিকন্তু চালের আর একটী বিশেষত্ব আছে। কুমড়ার গাছ হইতে সূত্রের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ বাহির হইয়া থাকে, উহাকে "আঁকড়ী" বলিয়া থাকে। ঐ আঁকড়ী কোনও অবলম্বন পাইলে শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া বহুসংখ্যক ফলপ্রদান করিয়া থাকে। জমীতে ও ছাদে কোনও প্রকার অবলম্বনই নাই, কিন্তু খড়োচালে এইরূপ অবলম্বনের অভাব না থাকায় চালেই কুমড়া উত্তমরূপ ফলিয়া থাকে।

বীজ রোপণ করিবার তিন চারিমাস মধ্যেই গাছ হইতে ফল পাওয়া যায়। কুমড়া বেশীদিন রাখিবার আবশ্যক হইলে উহা তুলিয়া জমীতে না রাখিয়া স্বতন্ত্র মাচাতে তুলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যদি ৫।৭ বৎসর কুমড়া রাখিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সুপক্ক কুমড়া গাছ হইতে তুলিয়া আলোকহীন কোনও ঘরে দড়ির সিকা প্রস্তুত করিয়া উহাতে সাচিকুমড়া ঝুলাইয়া রাখা কর্ত্তব্য।

অরহড়।

অরহড়ের বৃক্ষ চারি পাঁচ হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কাণ্ড শাখাপ্রশাখা ও অন্যান্য অংশ সমুদয় নিতান্ত অসার ও ভগ্নপ্রবণ। অরহড় বৃক্ষের পুষ্প দেখিতে হরিদ্রাবর্ণের ও কিছু বক্রভাবের হইয়া থাকে। ইহার ফলগুলি সীম জাতীয়। লম্বাকৃতি একএকটী সুঁটির মধ্যে পাঁচ ছয়টী পর্য্যন্ত অরহড়ের দানা পাওয়া যায়। অরহড়ের দানা বর্ণানুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণভেদে দুইপ্রকারের অরহড় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতির অরহড় আবার মাঘি ও চৈতালি ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উভয় জাতির ও উভয় শ্রেণীর অরহড় একক্ষেত্রে ও এক মৃত্তিকায় উৎপন্ন হয় এবং আবাদেরও কোনও প্রকার পার্থক্য নাই।

বিলান ও কুড়ী জমীভিন্ন, সমতল শীষেটান ও ক্রমনিম্ন ক্ষেত্রে এবং দোআ-

ফোটা ভিন্ন অন্য সকলপ্রকার মৃত্তিকাতেই অরহড় বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ মাত্রও জলবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে সে ক্ষেত্রে অরহড়ের আবাদ করা কর্ত্তব্য নহে। অরহড় প্রায় পৃথকরূপে বুনানি হয় না। লাল চিটে মারা জমী যে বৎসর ধান্যের সময় পতিত ফেলিয়া রাখা হয়, তাহারই পূর্ব্ব বৎসর ধান্য বুনানির সময় আশু ধান্যের সহিত একযোগে ও একক্ষেত্রে অরহড় বুনানি হইয়া থাকে। আবার অনেক সময়ে চেটো জমীতে ধান্য বুনানি না করিয়া তেপেখে কলাই ও অরহড় একসঙ্গে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বুনানি করা হয়।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ পর্য্যন্ত অরহড় বুনানি হইয়া থাকে এবং উহা মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রমাসে পাকিয়া উঠে। অরহড়ের বীজ প্রতি বিঘায় /১ একসের হিসাবে বুনানি করা আবশ্যক। কখনও কখনও পলি মাটি সংযুক্ত পতিত ক্ষেত্রেও দুই তিনবার চাষ দিয়া অরহড় বুনানি করা হইয়া থাকে।

অরহড় সুপক হইলে, গাছ কাটিয়া বৃহৎ পরিমাণে বোঝা বাঁধিয়া সেই সকল বোঝা উর্দ্ধমুখ করিয়া গায়ে গায়ে সাজাইয়া রাখা হয়। এইরূপ করিয়া রাখিবার প্রায় দশ বার দিন বাদে বৃক্ষগুলি শুষ্ক হইয়া উঠে। এই সময়ে দুই তিনটী অরহড়ের গাছ একত্র ধরিয়া মৃত্তিকায় আঘাত করিলেই গাছ হইতে শস্য সকল সহজে পৃথক হইয়া ঝরিয়া পড়ে। একবার কুলার দ্বারা ঝাড়িয়া লইলেই পরিষ্কৃত অরহড় পাওয়া যায়।

আর একজাতীয় অরহড় আছে তাহাকে "টুমুর" কহে। টুমুর দেখিতে পূর্ব্বোক্ত শ্বেতবর্ণের অরহড়ের ন্যায়। টুমুরের গাছ একবার জন্মিয়া বহু বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে এবং উহাতে প্রতিবৎসর শস্য ফলিয়া থাকে। টুমুরের সুঁটিগুলি অপেক্ষাকৃত বদোয়তনের হইয়া থাকে। এই টুমুরের সুঁটি সীমের ন্যায় আস্ত রাখিয়া অন্যান্য তরকারীর ন্যায় পাক করা যাইতে পারে।

আর একজাতীয় লতা অরহড় দেখিতে পাওয়া যায়; এই জাতীয় অরহড় উদ্যান মধ্যেই প্রায় লাগান হইয়া থাকে। লতা অরহড় মাচা বা বেড়ার গায়ে প্রায়ই বেষ্টিত হইয়া থাকিতে দেখা যায়।

অড়হর চাষের আয় ব্যয়।

লাঙ্গল ২ খান	।৶০
বীজ /১ একসের	৵১৫
কাটাই খরচ	৷৷৶০
মলাই খরচ	।/০
ঢোলাই খরচ	৵১০
খাজনা	৸০
মোট খরচা	২।৫

উৎপন্ন।

মণ	১/০	২/০	৩/০
মূল্য	১৸০	৩৷৷০	৫।০
বাদ খরচ	২।৫	২।৫	২।৫
	ক্ষতি ৷৷৫	লাভ ১৶১০	লাভ ২৸৶১০

ধান্তের সহিত একযোগে হইলে পৃথক রূপে লাঙ্গল লাগে না, অতএব লাঙ্গলের খরচ কম পড়িয়া থাকে

লাঙ্গলের খরচ*	।৶০	।৶০	।৶০
	ক্ষতি ৵৭	লাভ ১৷৷/১০	লাভ ৩।/১০

শাঁকআলুর আবাদ।

শাঁকআলুর আবাদ অতি সহজেই হইতে পারে। দোআঁস মাটিতেই শাঁক-আলুর আবাদ করা কর্ত্তব্য। বালুকাময় মাটিতেও শাঁকআলুর আবাদ হইতে পারে বটে, কিন্তু বালীমাটিতে উৎপন্ন শাঁকআলু আকারে তত বড় হয় না। বালীমাটির শাঁকআলুর আস্বাদন কিন্তু অন্য মাটিতে উৎপন্ন শাঁকআলু অপেক্ষা মিষ্ট হইয়া থাকে।

* এই ছয় আনা লাভের মধ্যে আসিয়া পড়ে, সুতরাং এই ছয় আনা উপরোক্ত লাভের সহিত যোগ দেওয়া গেল।

শাঁকআলুর জমীতে মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রমাস পর্য্যন্ত চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেক মাসে দুইবার করিয়া চাষ দিতে হয় অর্থাৎ তিনমাসে মোটের উপর ছয় বার চাষ দিলেই হইবে। ছয় বার চাষ দিবার পর জমীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া বৈশাখ মাসে ক্ষেত্র হইতে ঘাস মুথা প্রভৃতি আবর্জ্জনাদি তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ইহার পর জমীতে মই দিয়া জমীর ঢালু স্থির করা কর্ত্তব্য। যে দিকে জমী ঢালু থাকিবে সেই দিকে লম্বা করিয়া দুই হস্ত প্রস্থ ও অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ এক-একটী পটি প্রস্তুত করিতে হইবে। দুইটী পটির মধ্যে যেন এক হস্ত পরিমাণ একটী করিয়া নালা থাকে। নালার মাটি লইয়া পটির উপর চাপাইয়া দিলেই চলিতে পারিবে। মোট কথা পটিগুলি নালা হইতে যেন একহস্ত উচ্চ হয়। পটি গুলিকে পার্শ্বের দিকে একটু ঢালু করিয়াই প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য, কারণ পার্শ্বের দিকে ঢালু থাকিলে পটির জল সহজেই গড়াইয়া নালায় পড়িতে পারিবে।

বৈশাখ মাসের শেষে কিম্বা জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথমে শাঁকআলুর বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। দুই প্রকারে শাঁকআলুর বীজ বপন করা যাইতে পারে।

অন্যান্য শাকের বীজ বপনের ন্যায় শাঁকআলুর বীজ ছড়াইয়া দিলেই চলিতে পারে, কিম্বা এক একটী বীজ লইয়া মাটিতে টিপিয়া বসাইলেও হইতে পারে। যদি বীজ ছড়াইয়া বপন করা হয় তাহা হইলে বিঘা প্রতি /৩॥০ সাড়ে তিন সের বীজের আবশ্যক হয়, কিন্তু বীজ এক একটী টিপিয়া বসাইলে প্রতি বিঘায় /২॥০ আড়াই সের বীজ রপন করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। বীজ বপন করিবার সময় যদি বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় তাহা হইলে বীজ ছড়াইয়া বপন করাই কর্ত্তব্য। কারণ বীজ ছড়াইয়া বপন করিলে বৃষ্টির জলের তেজে বীজগুলি মাটির ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। শুষ্ক মাটিতে বীজ টিপিয়া বপন করাই কর্ত্তব্য, কারণ শুষ্ক মাটিতে বীজ ছড়াইয়া বপন করিলে বীজ গুলি মাটির উপর জাগিয়া থাকে সুতরাং পক্ষী কীট প্রভৃতিতে উহা সহজেই নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

জমীতে বীজ বপন করিবার পর একবার লাঙ্গল কিম্বা কোদাল দ্বারা ভাসা ভাসা চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। বীজগুলি জমীর উপর ভাসিয়া না থাকিয়া মাটির ভিতর প্রবেশ করানই এই চাষ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইলে এবং এক একটী চারাতে তিন চারিটী করিয়া পাতা বাহির হইলে

ক্ষেত্রে আর একবার চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। অত্যন্ত সাবধান হইয়া কোদাল দ্বারা ভাসা ভাসা কোপাইয়া জমীর মাটিগুলি গুঁড়া করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মাটি গুঁড়া না করিয়া দিলে চারার গোড়ায় মাটি শক্ত ও চাপ বাঁধিয়া যায়, ঐ চাপ বাঁধা মাটি রৌদ্রের তেজে গরম হইয়া চারার অনিষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে চারার গোড়ায় মাটি বেশ আল্‌গা থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

শাঁকআলুর চারাগুলি ৫।৬ পাঁচ ছয় অঙ্গুলি বড় হইলে ক্ষেত্রের মাটি নিড়ান দ্বারা খুড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সময় যদি ক্ষেত্রে ঘাস জঙ্গল প্রভৃতি কিছু উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা সাবধান পূর্ব্বক তুলিয়া ফেলা উচিত। বর্ষার শেষে গাছের অবস্থা কিরূপ থাকে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। যদি গাছগুলি তাদৃশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে অন্য কোনও উপায় অবলম্বন না করিয়া কেবলমাত্র গাছের গোড়া খুড়িয়া দিলেই চলিবে। কিন্তু গাছগুলি যদি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে গাছের গোড়ার দিকে একহস্ত পরিমাণ রাখিয়া সমস্তই কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। এরূপ করিয়া গাছ কাটিয়া ফেলিবার কারণ এই যে, সকল গাছের মূল বৃদ্ধির প্রয়োজন; সেই সকল গাছের শাখাপ্রশাখা অযথা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে প্রয়োজনীয় মূল তাদৃশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না।

অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে শাঁকআলুর গাছে ফুল ধরে। এই সময়ে ক্ষেত্রে কন্‌চি প্রভৃতি দিয়া গাছগুলি তাহার উপর তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মাটিতে ফুল পড়িয়া থাকিলে ইন্দুর প্রভৃতিতে উহা নষ্ট করিতে পারে। শাঁকআলুর ক্ষেত্রে অধিক জলসিঞ্চন করিলে মূল কিছু বড় হয় বটে, কিন্তু উহাতে আলুর আস্বাদন কমিয়া যায়। শাঁকআলুর গাছ সকল নিস্তেজ ও হরিদ্রাবর্ণের হইলে কোনও যন্ত্র দ্বারা আলু বাহির করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

একএকটী শাঁকআলু একপোয়া হইতে /৫ পাঁচ সের পর্য্যন্ত বড় হইতে দেখা গিয়াছে। প্রতি বিঘায় ৫০।৬০ পঞ্চাশ ষাইট মণ হইতে ১০০/ একশত মণ পর্য্যন্ত শাঁকআলু উৎপন্ন হইতে পারে।

লাউ বৃহৎ করিবার একটী সহজ উপায়।

আমাদের সহৃদয় পাঠকগণ সকলেই বোধ হয় লাউয়ের সহিত বিশেষ রূপে পরিচিত আছেন; অতএব লাউ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে লাউ অতিশয় বৃহৎ হইতে পারে তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। নিম্নলিখিত উপায়টী অবলম্বন করিলে অতি সহজেই লাউ বৃহৎ হইয়া থাকে, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে।

প্রথমে যে স্থানে লাউ আজ্জাইবে মনন করিয়াছ, সেই স্থানটী উত্তমরূপে কোদালি কিম্বা লাঙ্গল দিয়া দেড় হস্ত পরিমাণ গভীর করিয়া কর্ষণ কর; খনন কার্য্য সমাধা হইলে কর্ষিত মাটি সমুদায় উঠাইয়া স্বতন্ত্র স্থানে ফেলিয়া দাও, কারণ উক্ত মাটির আর কোন আবশ্যক করে না। পরে নদীর তীরস্থ বালি-মাটি সংগ্রহ কর। উক্তরূপে কর্ষিত স্থানটী বালি-মাটির দ্বারা পরিপূর্ণ কর, তৎপরে গো-ময় (গো-মূত্র নহে) খৈল এবং মহিষ শৃঙ্গ চূর্ণের* সার এই তিন পদার্থ একত্র জলে মিশ্রিত করিয়া কর্ষিত স্থানের উপরিভাগে অতি সাবধানতার সহিত ছড়াইয়া সমস্ত মাটি কোদালি দিয়া একবার উল্টাইয়া কাদা করিয়া দিতে হইবে।

তৎপরে রৌদ্রে মাটি শুকাইয়া গেলে পুনর্ব্বার কোদালি দিয়া মাটি উল্টাইয়া দিয়া এবং তাহার সহিত পুরাতন দেয়ালের মাটি এবং গো-ময় ভস্ম (ছাই বা পাশ) মিশ্রিত করিয়া জল ঢালিয়া কাদা করিয়া মাটিকে লেপিয়া পুঁচিয়া সমতল করিতে হইবে। এই মাটি শুকাইয়া গেলে স্থানে, স্থানে গর্ত্ত খনন করিয়া বীজ বপন করতঃ মাঝে মাঝে অল্প অল্প জল দিবে। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া লতা একটু বড় হইলেই ঠিক্ তাহার পার্শ্বে কঞ্চির মাচা করিয়া দেওয়া আবশ্যক; সাবধান লতা যেন ভূমে না গড়াতে পায়। মাচা যত ঊর্দ্ধ হইবে ততই সুবিধা, কারণ গাছ যত ঊর্দ্ধে উঠিবে লাউও তত বড় হইবে। জালি ধরিবার সময় যেন কচি ডাঁটা কেহ ভাঙ্গিয়া না দেয়, সে বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। এইরূপ করিতে পারিলে লাউ যে অতিশয় বৃহৎ হয় তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা এবিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি; এইরূপ উপায় অবলম্বনে

* মহিষ শৃঙ্গ চূর্ণ আমাদের ইম্পিরিয়াল নর্শরীতে পাওয়া যায়।

আমাদের প্রায় একমণ পর্য্যন্ত লাউ জন্মিয়াছে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে! ১২৯১ সালে ৬ষ্ঠ খণ্ড ৩য় সংখ্যা কৃষিতত্ত্বে একবার এ বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছিল, কিন্তু বহু দিবস গত হওয়ায় সকলের স্মরণ আছে কি না, না জানায় এক্ষণে পুনরুল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

ইক্ষু।

জমীর অবস্থা।—দো-আঁস বেলে মাটি ইক্ষু ক্ষেত্রের উপযুক্ত ভূমি। নদী কিম্বা খালের ধারের উচ্চ ভূমিতে যথেষ্ট ইক্ষু জন্মে। জলসিঞ্চনের সুবিধা থাকে অথবা সহজে জল দেওয়া যাইতে পারে এরূপ স্থান মনোনীত করিয়া ইক্ষু আবাদের স্থান নিরূপণ করা আবশ্যক। নতুবা যথা সময়ে বৃষ্টি না হইলে রৌদ্র লাগিয়া চারা মরিয়া যাওয়ার সম্ভব।

যে ভূমি বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া না যায় অথবা যাহাতে বৃষ্টির জল আটকাইবার কোন সম্ভাবনা নাই এরূপ স্থানেও ইক্ষুর চাষ হইতে পারে। পার্ব্বতীয় প্রদেশে টিলা (ছোট ছোট মেটে পাহাড়) জমীতেও ইক্ষুর আবাদ হয় বটে, কিন্তু সমতল জমী অপেক্ষা টিলা জমীতে ইক্ষু কিছু কম জন্মে। সুতরাং সমতল জমীই ইক্ষু চাষের উপযুক্ত।

চাষের বিবরণ।—যে জমীতে ইক্ষুর চাষ করিতে হইবে তাহা কিছু দিনের পতিত হওয়া আবশ্যক। পৌষ মাসের শেষে কিম্বা মাঘ মাসের প্রথমে সেই জমী কোদাল দিয়া উত্তমরূপে কোপাইতে হইবে। তাহার পর ফাল্গুন মাসের মধ্যভাগে উহা দো-কোপানী করিয়া লাঙ্গল দ্বারা চসিয়া সমুদায় মাটি ধূলার মত করিয়া রাখিতে হইবে। জমী সমান করিবার জন্য প্রত্যেক বার লাঙ্গল দেওয়ার পর মৈ দিতে হইবে। যদি জমীর উর্ব্বরতা শক্তি কম থাকে তাহা হইলে প্রথম বার কোপাইবার পর উহাতে গোবরের সার দিতে হইবে। প্রতি বিঘায় ৭০।৮০ মণ সার দিলেই জমীর উর্ব্বরতা শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। চারা রোপণের পূর্ব্বে অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথমে এইরূপে জমী প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তৎপরে বৃষ্টি হইলে "হাপর" হইতে

চারা উঠাইয়া ঐ জমীতে রোপণ করিতে হইবে। বৈশাখ মাসই চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

চারা রাখিবার প্রণালী।—মাঘ মাসের শেষে কিম্বা ফাল্গুন মাসের প্রথমে যে ইক্ষু কর্ত্তন করা যায় তাহার ডগাই চারা করিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট। চারার জন্য ইক্ষুদণ্ডের অগ্রভাগ হইতে ১ একহাত কি ১॥• দেড়হাত আন্দাজ ডগা কাটিয়া রাখিতে হয়। সেই ডগার মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত মোটা মোটা ডগাগুলি বাছিয়া পৃথক করতঃ তাহা ছোট ছোট বোঝা বাঁধিয়া কোন বৃক্ষের ছায়ায় অথবা ডগার পরিমাণ বুঝিয়া যথাসম্ভব দীর্ঘ প্রস্থ এবং একহাত গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার ভিতর রাখিতে হইবে। বৃক্ষের ছায়াই হউক আর গর্ত্তের ভিতরেই হউক ডগা গুলি উচু করিয়া একটু হেলাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। (ডগার কর্ত্তিত অংশ মাটিতে সংলগ্ন করিয়া রাখিতে হইবে।) তৎপরে হাপরে দিবার সময় ঐ সমস্ত ডগাগুলির খোলা ছাড়াইয়া তাহাতে দুই তিনটী চোক থাকে এরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া হাপরে দিতে হইবে।

হাপর প্রস্তুত প্রণালী।—যে স্থানে হাপর প্রস্তুত করিতে হইবে তথাকার মৃত্তিকা আধহাত গভীর করিয়া খনন করতঃ মাটিগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হইবে। তাহার পর সেই মাটির উপর জল দিয়া অল্প অল্প কাদা করিতে হয়। পরে সেই কাদার উপরে শ্রেণীবদ্ধরূপে এক এক অঙ্গুল ব্যবধানে ঐ খোলা ছাড়ান ডগাগুলি এড়ো করিয়া বিছাইয়া দিতে হইবে। এরূপ ভাবে বিছাইয়া দিতে হইবে যেন উহার চোকগুলি পাশাপাশি থাকে। চোকগুলি উপর নীচ করিয়া দিলে চারা বাহির হয় না, সুতরাং পচিয়া যায়। ডগাগুলি হাপরের কাদার মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে পুতিয়া দিতে হয়না। অর্দ্ধেক কাদার মধ্যে ও অর্দ্ধেক কাদার উপরে রাখিতে হয়। হাপরে ডগাগুলি বসান হইলে তাহার উপর পোয়াল কিম্বা খড় দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। হাপরের উপরে কোন একটা আবরণ করিয়া দিলে আরও ভাল হয়। হাপরের ডগাগুলি ঢাকিয়া অথবা আবরণ করিয়া না দিলে রৌদ্রের তেজ লাগিয়া চারা জন্মানর পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে। এইরূপে ডগা বসানর দুই তিন দিন পর হইতে প্রত্যহ বৈকালে তাহার উপর অল্প অল্প জল দিতে হয়। চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে হাপরে ডগা বসান উচিত। চারাগুলি ৬।৭ অঙ্গুল বড় হইলে উপরের আবরণ ও চারার উপরের

পোয়াল কি খড় ফেলিয়া দিতে হয়। ইহার পর মাটি গুঁড়া করিয়া সমুদায় চারার গোড়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। চারাগুলি যখন একহাত পরিমিত উচ্চ হইবে তখন হাপর হইতে উঠাইয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। হাপর ইক্ষু ক্ষেত্রের নিকটেই প্রস্তুত করা আবশ্যক।

রোপণ প্রণালী।—চারা রোপণের জন্য যে জমী প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে তাহার এক পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সরল রেখা ক্রমে দীর্ঘ প্রস্থ সমানে দেড় হাত ব্যবধানে আধ হাত গভীর গর্ত্ত খনন করতঃ তাহার মধ্যে দুই তিনটী করিয়া চারা পুতিয়া দিতে হইবে। চারা পুতিবার পর তাহার গোড়ায় মাটি ঠাসিয়া দিয়া গর্ত্তটী কিছু খালি রাখিয়া দেওয়া আবশ্যক। বৃষ্টির সময় কিম্বা বৃষ্টি হইবার সম্ভব আছে এইরূপ সময় দেখিয়া চারা রোপণ করিতে হয়। রোপণের পর বৃষ্টি না হইলে চারাগুলি বাঁচাইবার জন্য তাহাদের গোড়ায় জলসিঞ্চন করা কর্ত্তব্য। জলসিঞ্চনের নিতান্ত অসুবিধা হইলে অন্ততঃ জল দিয়াও চারার গোড়া ভিজাইয়া দিতে হইবে। প্রত্যহ চারায় জল দিবার আবশ্যক নাই, দুই তিন দিন অন্তর জল দিলেই যথেষ্ট হয়। চারাগুলি বাঁচিয়া উঠিলে ১৫।২০ দিন পর তাহার গোড়া খুড়িয়া দিতে হইবে। ঐ সময় গর্ত্তের খালি অংশ টুকু পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। হাপরে চারা না করিয়া অন্য এক প্রকারেও চারা করা যাইতে পারে তাহাকে “আঁধা রোপণ” বলে। আঁধা রোপণ করিলে হাপর করিতে হয় না, একবারেই ক্ষেত্র মধ্যে ইক্ষু জন্মাইতে পারা যায়।

আঁধা রোপণ প্রণালী।—হাপরে ডগা বসাইবার সময় যেরূপে ডগা কাটিতে হয় সেইরূপে ডগাগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহাতে ঘন করিয়া গোবর গোলা দিয়া মাখাইতে হয়। পরে ডগার পরিমাণ বুঝিয়া দুই হাত গভীর এক বা ততোধিক গোলাকার গর্ত্ত খনন করতঃ তাহার মধ্যে সেই গোবরগোলা মাখান ডগাগুলি যথেচ্ছ ভাবে ছিটাইয়া দিয়া তাহার উপর জল করিয়া পোয়াল চাপা দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। এইরূপে ১০।১২ দিন রাখিয়া দিলে তাহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে সরু সরু শিকড় ও চোক দিয়া ছোট ছোট “ফেকড়ি” বাহির হইবে। তৎপর সেই ডগাগুলি গর্ত্ত হইতে তুলিয়া হাপরের চারা রোপণের নিয়মানুসারে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। আঁধা চারা রোপণ করিয়া তাহার উপরে আন্দা করিয়া তিন অঙ্গুল মাটি চাপা দিয়া দিতে হয় নতুবা চারা

বাহির হইবার ব্যাঘাত জন্মে। যতদিন চারাগুলি মাটি ভেদ করিয়া না উঠিবে ততদিন তাহার উপর প্রত্যহ কিম্বা একদিন অন্তর জল দিয়া উপরের মাটি ভিজাইয়া দিতে হইবে। হাপরের চারা অপেক্ষা "আঁধা রোপণের" চারা প্রথম হইতেই সতেজ হইয়া উঠে। হাপরের চারা প্রথম প্রথম কিছু নিস্তেজ হয়।

যেরূপেই চারা রোপণ করা হউক না কেন, চারাগুলি এক হাত কি সওয়া হাত বাড়িয়া উঠিলে তাহাদের গোড়ায় কিছু কিছু গোবরের সার অথবা কিঞ্চিৎ খৈলের গুঁড়া দিয়া মাটি খুসিয়া দিতে হয়। তাহার পর যখন চারাগুলি সতেজ হইয়া ৮।৯টী করিয়া পাতা বাহির হইবে, সেই সময় সমুদায় জমী আল করিয়া খুঁড়িয়া দুই শ্রেণীর মধ্য হইতে মাটি তুলিয়া চারার গোড়ায় দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। দাঁড়া বাঁধিয়া দিবার পর প্রত্যেক চারার গোড়া হইতে ৮।১০টী করিয়া কোঁড়ক বাহির হইয়া ঝাড় বাঁধিতে আরম্ভ হইবে। কোঁড়কগুলি বড় হইয়া যখন ৩।৪টী করিয়া পাঁপ ছাড়িবে, সেই সময় তাহার গোড়ার পাতা ভাঙ্গিয়া দিয়া ৩।৪ গাছি ইক্ষু একত্র করিয়া উপরের পাতা দিয়া জড়াইয়া দিতে হয়। ইক্ষু যতই বাড়িবে পাতা দিয়া ততই জড়াইতে হইবে। ইহার পর আর কোন পাইট্ করিতে হয় না। তবে ক্ষেত্রে জল বাঁধিয়া গাছ মরিয়া না যায় এজন্য দাঁড়ার মধ্যস্থ নালাগুলি পরিষ্কার করিয়া দিতে হয় এবং দাঁড়ায় বেশী ঘাস জন্মিলে তাহা নিড়ানি দিয়া তুলিয়া দিতে হয়। (ক্রমশঃ)

কাঞ্চন ফুল।

ইহা একটী পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে।

সংস্কৃত—"কুদ্দাল" "কান্তপুষ্প" "তাম্রপুষ্প" "রক্তকাঞ্চন" "করক" ইত্যাদি।

হিন্দী—"কচনার," সোনা।

মহারাষ্ট্রী—"কাঞ্চন"।

উড়িয়া—"বোরধা"।

তামিল—"সেগাছ মন্থরী"।

মলয়—"চোবন সুন্দরী"।

ব্রহ্ম—"মহাহিল পণি।"

ইংরাজি—Mountain Ebony. (মাউন্টেন্ এবণি)। এইবৃক্ষ দেখিতে অতীব সুন্দর, ইহার নানাবর্ণের ফুলগুলিও দেখিতে বড়ই নয়ন তৃপ্তিকর বিশেষতঃ ইহার বেগুণি ফুলগুলির উপর মাঝে মাঝে রক্তের বিন্দুর ন্যায় থাকায় আরও সুন্দর দেখায়; ইহার কাষ্ঠও বেশ মজবুত। ইহাতে খাট, পালং ইত্যাদি তৈয়ার হইয়া থাকে। এই বৃক্ষ সম্পূর্ণ বড় হইলে ইহা হইতে প্রায় ৮।১০ ইঞ্চি চওড়া তক্তা পাওয়া যায়। বাঙ্গালায়, বেহারে, ব্রহ্মদেশে, বোম্বায়ে, পঞ্জাবে, উড়িষ্যায় এই গাছ বিস্তর জন্মিয়া থাকে। পঞ্জাবের লোকেরা ইহার ফুলের কুঁড়ি রন্ধন করিয়া খাইতে বড় ভালবাসে।

ভাবপ্রকাশ নামক বৈদ্যক গ্রন্থে এই গাছের এইরূপ গুণ লিখিত হইয়াছে। যথা—কষায়, শ্লেষ্মাপিত্তনাশক এবং কৃমি, কুষ্ঠ ও গণ্ডমালা রোগনাশক। এই বৃক্ষের আরও বিশেষ বিশেষ বিবরণ সময়ান্তরে প্রকাশ্য।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু।

কৃষি সম্বন্ধে খনার বচন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৭১ পৃষ্ঠার পর।)

অগ্রহায়ণ মাসে বর্ষা হইলে রাজাকে মাগিয়া অর্থাৎ ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়। অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি হইলে ধান্যে পোকা জন্মিয়া ধান্য সকল নষ্ট করিয়া ফেলে সুতরাং প্রজাদের কষ্ট হওয়ায় উহারা রাজকর দিতে সমর্থ হয় না এবং সেইজন্য রাজারও অর্থের টানাটানি হইয়া থাকে। পৌষ মাসে বৃষ্টি হইলে সেই বর্ষণে ধান্য সকল ঝরিয়া পড়িয়া যায় এবং সেইজন্য ধান্য অত্যন্ত মাহার্ঘ্য হইয়া পড়ে। মাঘমাসে বৃষ্টি হইলে ঐ বৃষ্টির জলে প্রচুর পরিমাণ রবিশস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সেই কারণ রাজা ও প্রজা উভয়েরই সুখের সীমা থাকে না; ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইলে ঐ বৃষ্টির দ্বারা চিনা ও কাউন দ্বিগুণ পরিমাণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৯) আগে পুঁতে কলা।
বাগবাগিচে ফলা॥

শোনরে বলি চাষার পো।
পরে নারিকেল ক্রমে গুও॥
নারিকেল বার স্থপারি আট।
এরসন তখনি কাট॥

ফলের আবাদ করিতে হইলে প্রথমে ক্ষেত্রে কলার আবাদ করা কর্ত্তব্য। কলার আবাদ করিলে ক্ষেত্র বেশ সরস হয়। আম কাঁঠাল ফলিতে যে সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে কলার পাতা, থোড়, মোচা এবং কলা বিক্রয় করিয়া লাভবান হওয়া যাইতে পারে।

নারিকেল বৃক্ষ সকল বারহাত অন্তর এবং স্থপারি বৃক্ষ সকল আটহাত অন্তর রোপণ করা কর্ত্তব্য। ইহার অপেক্ষা ঘন ঘন বৃক্ষ বসাইয়া থাকিলে উহা তখনই কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। বৃক্ষ সকল ঘন ঘন বসাইলে উহাদের শিকড় ও ডাল সকল পরস্পর সংলগ্ন থাকায় কোন বৃক্ষই ভালরূপ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। স্থতরাং ঐ সকল বৃক্ষ ভালরূপ ফলোৎপাদন করে না। সেইজন্ম বৃক্ষ সকল কখনই ঘন ঘন রোপণ করা উচিত নহে। (ক্রমশঃ)

গ্রাম্য প্রবাদ অনুযায়ী জল বায়ুর লক্ষণ।*

কৃষকদিগের মধ্যে কতকগুলি গ্রাম্য প্রবাদ প্রচলিত আছে, যাহার নৈসর্গিক লক্ষণ দর্শনে জল বায়ুর লক্ষণ অনেকটা স্থীর করা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আজকাল নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে সেগুলি আদৌ বিশ্বাস করেন না। কয়েক বৎসর গত হইল ইউরোপীয় পণ্ডিত লক্ সাহেব তাঁহার বিলাতী সংবাদ পত্রে এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন ও তদ্দর্শনে "বৈষয়িকতত্ত্ব" নামক মাসিক পত্রেও কয়েকটী গ্রাম্য প্রবাদ বাক্য প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা পাঠকবৃন্দের বিশ্বাসের নিমিত্ত কতকগুলি প্রবাদ বাক্য সংগ্রহ করিয়া নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। বিলাতের কৃষকদিগের মধ্যে একটী

* জলবায়ুর সহিত কৃষির বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এই প্রবন্ধটী দেওয়া গেল।

প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, তাহার অনুবাদ পাঠকগণের জ্ঞাতর নিমিত্ত নিম্নে প্রকাশিত করা হইল।

"রামধনু দেখলে পুবে,
ফরসা আকাশ জানবে সবে।
উঠ্‌লে ধনু পশ্চিমাকাশে,
ক্ষেতের জমী জলে ভাসে॥"

ইহার অর্থ এই যে, পূর্ব্বদিকে রামধনু উঠিলে বৃষ্টি হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না; পশ্চিমদিকে রামধনু উঠিলে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে। সূর্য্যের বিপরীত দিকে অধিক বাষ্পপূর্ণ মেঘ অথবা বৃষ্টি হইতেছে এরূপ মেঘ থাকিলেই রামধনু দেখা যায়, আর বিলাতে প্রায়ই পশ্চিম দিকের মেঘেই বৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহা হইতেই উপরোক্ত প্রবাদের অর্থ বুঝা যাইতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিহার অঞ্চলে* কৃষকদিগের মধ্যে এইরূপ একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে।

"পুবে হোয় রামধনু;
তব্ পাণিকাওয়াস্তে মাট্টি খণু।"

ইহার অর্থ এই যে, পূর্ব্বদিকে রামধনু উঠিলে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং জলের নিমিত্ত মৃত্তিকা খনন কর।

"পশ্চিমে হোয় তরবরা,
তব জল হোয় ভর পুখরা॥"

ইহার অর্থ এইরূপ, পশ্চিমে "তরবরা" অর্থাৎ রামধনু উঠিলে খুব বৃষ্টি হয়, এত বৃষ্টি হয় যে পুষ্করিণী একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

"বৈষয়িকতত্ত্বে" কোনও এক ইংরাজী পত্রিকা হইতে, বিলাতের কৃষকদিগের আর একটী সুন্দর যুক্তি উদ্ধৃত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে তাহা প্রকটিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বিলাতের কৃষকেরা বলিয়া থাকে—

"When swallows fly high, fine weather is near, when they fly low, rain is almost surely approching."

---

* "বৈষয়িকতত্ত্ব।"

অর্থাৎ পাখীরা যখন অতিশয় উচ্চে উড়িতে থাকে, তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে অর্থাৎ বৃষ্টি হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু যখন তাহারা বেশী উচ্চে না উঠিয়া নিম্নেই উড়িতে থাকে, তখন নিশ্চই বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা।

ইহার যুক্তি সেই পত্রিকায় এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে যে,—

"Swallow follow the flies and flies usually delight in warm strata of air; and as warm air is lighter and usually moister than cold air, when the warm strata of air are high there is less chance of moister being thrown down from them by the mixture with cold air; but when the warm and moist air is close to the surface it is almost certain that as the cold air flows down into it a diposition of water will take place.

পক্ষীরা কীট পতঙ্গ আহারের উদ্দেশে, যেখানে কীট পতঙ্গ থাকে সেই স্থানেই যে গমন করে এবং শীতোষ্ণের সহিত কীট পতঙ্গাদির যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়; কারণ বৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে পিপীলিকা-গণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমনাগমন করে ও আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গাদির পক্ষ বিশিষ্ট অবস্থায় উড্ডীয়মান হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল নৈসর্গিক লক্ষণ দর্শনে এদেশের কৃষকেরাও বৃষ্টি হইবে কিনা অনুমান করিয়া থাকে।

পশ্চিম প্রদেশীয় কৃষকদিগের মধ্যে একটী উক্তি আছে যথা—

"বাচ্চা বুচ্চি নিকলকে চিউটি অন্ বিহরমে যায়।
ঝটিত বর্ষণ হোগা ডাকে ইয়াবাৎ বাৎলায়॥"

অর্থাৎ পিপীলিকাগণ যখন সন্তান সন্ততি লইয়া বাহির হইয়া এক গর্ত্ত হইতে অন্য গর্ত্তে যায়, তখন শীঘ্রই যে বৃষ্টি হইবে ইহা "ডাকের বচনে" বলিয়া দিতেছে। আমাদের এদেশে যেরূপ "খনার বচন" নামক কতকগুলি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, পশ্চিম প্রদেশেও তদ্রূপ "ডাকের বচন" নামে উপরোক্ত বচনের ন্যায় কতকগুলি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

বিলাতের ধীবরেরা নদীযাত্রা করিবার সময় যদ্যপি একজোড়া মাছরাঙ্গা পাখী দেখে তাহা হইলে তাহারা যাত্রা শুভ বিবেচনা করে; কিন্তু একটী মাছরাঙ্গা পাখী

দেখিলে যাত্রা অশুভ বলিয়া গণ্য করে ; সে যাত্রায় তাহারা যে আর ভালরূপ মাছ পাইবে না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করে। ইহার যুক্তি লক্ সাহেব এইরূপ দিয়াছেন।

And the reason is, that in cold and stormy weather one Magpie alone leaves the nest in search of food, the other remaining sitting upon the eggs or the young ones ; but when the two go out together, it is only when the weather is warm and mild. Warm and mild weather are favourable for fishing.

অর্থাৎ ঝড় বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে ডিম্ব কিম্বা শিশু-শাবকগুলির রক্ষার জন্ত একটী না একটী পাখী বাসায় থাকিবেই থাকিবে, কিন্তু যখন আকাশ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তখন ডিম্ব কিম্বা শিশু শাবক রক্ষা করিবার নিমিত্ত আর বাসায় থাকিবার আবশুক করে না, সুতরাং দুইটাই খাদ্য অন্বেষণে বহির্গত হয় ; আর ঝড় বৃষ্টির সময় মৎস্ত অধিক জলের নিচে থাকে, সুতরাং সে সময় মাছ ধরিবার সুবিধা হয় না।

পশ্চিম প্রদেশেও ধীবরদিগের মধ্যে এইরূপ একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"টন্‌কি জোড়া আঁথমে গিরা তব্ গড়িকা খেল।
আউর ছোড়া টন্‌কি দেখ্‌কে কভি টাপি নাহি ফেল॥"

টন্‌কি শব্দের অর্থ মাছরাঙ্গা পাখী অর্থাৎ একজোড়া মাছরাঙ্গা পাখী দেখিলে তবেই গোড়িকার (অর্থাৎ জেলেদের) আনন্দের আর সীমা থাকে না, আর একটী মাছরাঙ্গা পাখী দেখিলে কখনই টাপি অর্থাৎ জাল ফেলিবে না।

চেষ্টা করিতে পারিলে ঐরূপ অনেক প্রবাদ বাক্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এইরূপ ধরণের প্রবাদ বাক্যগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে যে বিশেষ উপকার হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, কারণ জল, বায়ু ও সার এই তিন পদার্থই উদ্ভিদের একমাত্র জীবন ; অতএব জল ও বায়ু কখন কিরূপ হইবে জানিতে পারিলে শস্যাদির বীজ বপন কালে আর ভাবিতে হয় না, যদিচ ইহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে স্থির করা না যাইতে পারে, তত্রাচ কতক পরিমাণ স্থির করিতে পারিলেই যথেষ্ঠ। বহুদর্শী লক্ সাহেব যেরূপ স্বদেশের কৃষকদিগের মধ্যে প্রবাদ বাক্যগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহার গূঢ়ার্থ অনুসন্ধান করিতে যত্নবান

হইয়াছেন; আশাকরি আমাদের দেশের নব্য শিক্ষিত মহাত্মাগণ এইরূপ ধরণের প্রবাদ বাক্যগুলি অগাধ সলিল মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া দেশের কৃষকদিগের মধ্যে পুনঃ প্রচলিত করতঃ দেশের ও দশজনের উপকার সাধন করেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু।

পেঁপের মোহনভোগ।

(রন্ধন-প্রণালী)

আমরা সাধারণতঃ সুজির মোহনভোগই প্রস্তুত করিয়া থাকি এবং ভক্ষণে অভ্যস্থ আছি। কিন্তু সুপক্ক পেঁপে হইতে অতি উপাদেয় ও মুখপ্রিয় মোহন-ভোগ প্রস্তুত হইতে পারে তাহা বোধ হয় সাধারণে অবগত নহেন। আমরা অতি সংক্ষেপে এই উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী বিবৃত করিতেছি।

বেশ সুপক্ক পেঁপে না হইলে উহা হইতে মোহনভোগ প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। বেশ ভাল ও বড় দেখিয়া সুপক্ক পেঁপে লইয়া উহার খোসা ছাড়াইয়া ফালি ফালি করিয়া চিরিয়া ফেলিতে হইবে এবং উহার বীজগুলি ফেলিয়া দিতে হইবে। পরে উহা বেশ করিয়া চটকাইয়া উহার সূক্ষ্ম শীরাগুলি বাছিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। সুবিধা হইলে কাপড় দ্বারা একবার উহা ছাঁকিয়া ফেলিতে পারিলেই ভাল হয়। যে প্রকারেই হউক পেঁপেটীকে চটকাইয়া মণ্ডের আকারে পরিণত করিতে হইবে। পরে কড়াতে অল্পপরিমাণ মাখন বা ঘৃত চড়াইয়া উহাতে পেঁপের মণ্ড নিক্ষেপ করিয়া খুন্তিদ্বারা নাড়িতে হইবে। কিছুক্ষণ এইরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া উহাতে পরিমাণ মত দুগ্ধ এবং মিশ্রি বা চিনি মিশ্রিত করিয়া লইয়া বেশ মাখামাখা হইলে নামাইতে হইবে। উহা ঠাণ্ডা হইলেই সুন্দর পেঁপের মোহনভোগ হইল।

এই মোহনভোগ বেশ সুমিষ্ট ও সুস্বাদু এবং শরীরের পক্ষেও বেশ উপকারী; রোগীকেও এই মোহনভোগ অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে।

শুভ-বৈশাখ।

(অঞ্জলি)

হে ! শুভ-বৈশাখ,

ভারতের দুরবস্থা করিয়া স্মরণ,

ও রাঙা চরণে

দিতেছি অঞ্জলি আজি, লহ কৃপা করি

আদরের "কৃষিতত্ত্ব" অমূল্য রতণ ॥

আশীষ হে ! রুদ্রদেব,

যেন তব কৃপাবলে দীনহীন "কৃষিতত্ত্ব"

সাধিতে উদ্দেশ্য মহৎ করে প্রাণপণ।

রাখিতে অটুট যথা কৃষক সম্মান ॥

শ্রীধীরেন্দ্র—

কৃষিতত্ত্ব

১ম খণ্ড। } আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩০৭। { ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

সম্পাদকীয় উক্তি।

বঙ্গে খর্জ্জুর চাষ—আমাদের দেশে খর্জ্জুরের চাষ হয় বটে, কিন্তু উহা হইতে রস বাহির করিয়া তাহাতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিয়াই আমরা ক্ষান্ত থাকি। খর্জ্জুর বৃক্ষে উত্তমরূপ খর্জ্জুর প্রস্তুত করিতে পারি না। আমাদের দেশে যে খেজুর উৎপন্ন হয় তাহা অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির এবং নিতান্ত আস্বাদন বিহীন। বিদেশ হইতে আনীত কলসী ও চেটাইএর খেজুর খাইতে কেমন সুস্বাদু। আমাদের দেশে কি ঐ প্রকার খেজুর উৎপন্ন করা যায় না। আমাদের বোধ হয় চেষ্টা ও যত্ন করিলে নিশ্চয়ই আমাদের দেশে উৎকৃষ্টতর খেজুর উৎপন্ন করিতে পারা যায়। পারস্য উপসাগরের কূলে প্রচুর পরিমাণে খেজুরের আবাদ হইয়া থাকে। তথায় অসংখ্য সুদক্ষ সিউলি নিয়ত এই কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। ঐ স্থান হইতে সুদক্ষ সিউলিগণকে এদেশে আনয়ন করিয়া উহাদের নিকট হইতে খেজুরের আবাদ প্রণালী শিক্ষা করিলেই আমাদের দেশীয় কৃষকগণও রীতিমত খেজুরের আবাদ প্রণালী অবগত হইতে পারিবে ও এদেশেও বিদেশ হইতে আনীত খেজুরের ন্যায় সুপুষ্ট ও সুমিষ্ট খেজুর উৎপাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

বিলাতে বোম্বাই আম্র—এবৎসর এদেশ হইতে লণ্ডন নগরে বোম্বাই আম্র প্রেরিত হইয়াছিল। তথায় এবৎসর এক একটী আম্র পাঁচ শিলিং অর্থাৎ প্রায় চারি টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। এত অধিক মূল্য দিয়া সাধারণ লোকে অবশ্যই বোম্বাই আম্রের রসাস্বাদনে সমর্থ হয় নাই।

এই জন্য পর বৎসর যাহাতে প্রচুর পরিমাণ বোম্বাই আম্র লণ্ডনের বাজারে আমদানী হয় তাহার চেষ্টা করা হইবে। প্রচুর পরিমাণে আম্র আমদানী হইলে এক একটী আম্র ৮।৯ পেনি মূল্যেও পাওয়া যাইতে পারিবে এবং ইহাতে লণ্ডনবাসী মধ্যবিত্ত লোকেও বোম্বাই ফলের সুস্বাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন।

কুঙ্কুমিত মেষমাংস—কাশ্মীর প্রদেশে কুঙ্কুম বা জাফরাণের প্রচুর পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে। জাফরাণ বৃক্ষের এমনই সুগন্ধ যে, যে সকল মেষ এই বৃক্ষের পত্রাদি ভোজন করে তাহাদের মাংস পর্য্যন্ত জাফরাণের সুগন্ধ বিশিষ্ট হইয়া যায়। যে সকল গাভী এই সুরভি তৃণের আস্বাদনগ্রহণ করে তাহাদেরও দুগ্ধ পর্য্যন্ত জাফরাণের গন্ধে সুগন্ধযুক্ত হয়।

টমেটোর গুণ—টমেটো একপ্রকার বিলাতী বেগুণ। ইহার আবাদ আজকাল এদেশেও বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই বেগুণের অম্ল রন্ধন করিলে অত্যন্ত মুখরোচক হইয়া থাকে। সম্প্রতি বিলাতী ডাক্তারেরা বলিতেছেন যে, টমেটোর নানাবিধ গুণ আছে। ইহা ভক্ষণে যকৃতের সমস্ত দোষ নিবারিত হয় ও উদরের অন্যান্য রোগেরও শান্তি হইতে পারে। এদেশে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

ভারতের দূরবস্থার প্রধান কারণ কি?

(কৃষিকার্য্যে অবহেলাই একমাত্র ভারতের দূরবস্থার প্রধান কারণ।)

হায়রে! ভারত-ভূমি কি কহিব আর,
সোণার ভারত তুমি সুবর্ণের হার।
রত্নের আকর তুমি, রত্নগর্ভা নাম;
আজি সে' ভারত কেন শশ্মান সমান॥

ভারতবর্ষই যে কৃষির সর্ব্বোচ্চ স্থান তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে ও করিয়া থাকেন। একসময়ে এই স্বর্ণপ্রসবিনী সর্ব্বসুখদায়িনী ভারত-ভূমি যে বিজ্ঞার সুবিমল কিরণে সমুজ্জ্বলা ছিল তাহা কোন আধুনিক

সভ্যগণ না স্বীকার করিবেন। কি সঙ্গীত বিদ্যা, কি যুদ্ধবিদ্যা, কি শারীর বিদ্যা, কি কৃষিবিদ্যা, কি পদার্থবিদ্যা সকল বিদ্যাতেই আদিম ভারতবাসিগণের সুচারুরূপ পটুতা ছিল। বিগত যবন ঝটিকায় আমাদের অধিকাংশ গ্রন্থ বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহারই উচ্ছিষ্টের উচ্ছিষ্টাংশ লইয়া অধুনা অতীব সভ্যতম জনগণ আপনাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করেন।

আদিম ভারতবাসিদিগের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে কত শত অদ্ভুত ব্যাপার যে স্মৃতিপথে আরূঢ় হয় তাহা বর্ণনা করা সুদূরপরাহত। যখন সমুদায় মেদিনীমণ্ডল ঘোরতর তিমির জালে আচ্ছাদিত ছিল, তখন ইহার ভাব একরূপ ছিল, কিন্তু এক্ষণে নিরন্তর জ্যোতিঃ পরম্পরায় পরিশোভিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতের এরূপ দুরবস্থা সংলক্ষিত হয় কেন? আদিম অধিবাসীরা ত সর্ব্বদাই বিদ্যার সুস্বাদ মধুময় ফল ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতেন। আদিম আর্য্য-জাতিরা পৃথিবীর সকল সুখই ত ভোগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে আমরা সুখ কোথা তাহা খুঁজিয়া পাইনা। তাঁহারা অভাব কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না, কিন্তু এক্ষণে যেখানে যাও সেইখানেই দেখিবে অভাবের ভ্রূকুটি; উচ্চ রাজপ্রাসাদ হইতে কৃষিজীবির পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সকল স্থানেই দেখিবে অভাবের দীর্ঘনিশ্বাসের বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। হীরকখচিত দ্বিরদরদনির্ম্মিত পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত ধনী ব্যক্তি হইতে মৃৎশয্যায় শায়িত কাঙ্গালের হৃদয় পর্য্যন্ত অভাবের বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতেছে।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, "ভারতবর্ষ আজ উন্নত হইয়াছে"; ভারতবর্ষ যে উন্নতি লাভ করিয়াছে ইহা আমরা অস্বীকার করিনা, কারণ এক্ষণে দেশে দেশে অসংখ্য সুরম্য অট্টালিকা মস্তক উত্তোলন করিয়া নগরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে; দূরপ্রসারিত সুন্দর রাজপথেরও অভাব নাই। গো, অশ্ব, মহিষ, শকট, প্রভৃতি যানবাহনাদিরও অভাব নাই; সামান্য অর্থ ব্যয় করিলেই সুদূর দেশদেশান্তরের সংবাদ ঘরে বসিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। সামান্য অর্থ ব্যয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাওয়া যায়, পূর্ব্বের মতন আর আত্মীয় স্বজনদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাইতে হয় না। পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থান বিজন অরণ্যে আবৃত ছিল, এক্ষণে সেসমস্ত স্থান কত শত

সুন্দর নগর-নগরী দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছে; কিন্তু সে সকল সত্ত্বেও আমাদের এরূপ দুরবস্থা কেন? তাহা কে বলিবে! যদি পদানত অবস্থাকে সমুন্নত অবস্থা বলা হয়, যদি অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ রোগীকে নধর কান্তি বলা হয়, যদি মৃতব্যক্তিকে জীবিত বলা হয়, তাহা হইলে ভারত আজ উন্নত বটে! অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ শরীরকে সুবর্ণালঙ্কারেভূষিত করিলে যেরূপ সৌন্দর্য্য হয়, ভারতের আজ ঠিক সেইরূপ শোভা হইয়াছে। বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে ভারত আজ উন্নত বটে, কিন্তু একটু অন্তপ্রবিষ্ট হইয়া দর্শন করিলে দেখিতে পাইবে যে, ভারত আজ কিরূপ দৈন্যদশায় উপস্থিত। স্থূল দৃষ্টিতে অনেকে উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাইবেন সত্য, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দর্শন করিলে দেশের সহস্র দুর্গতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইবে। এরূপ অবস্থাকে উন্নত কি অবনত বলা যায়? তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন।

ভারত চিরকালই "রত্নগর্ভা" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে; বাস্তবিক শস্য যে রত্ন অপেক্ষাও মূল্যবান দ্রব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। এই জন্যই মহামুনি পরাশর বলিয়া গিয়াছেন,—

"কণ্ঠে হস্তে চ কর্ণে চ সুবর্ণং যদি বিদ্যতে।
উপবাসস্তথাপিস্যাৎ অন্নাভাবেন দেহিনাং॥

* * *

তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য কৃষিং যত্নেন কারয়েৎ॥

ভারতের পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিতে গেলে কাহার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়। যে ভারত দুর্ভিক্ষ, অকালমরণ কিরূপ তাহা জানিত না, অদ্য সেই ভারত ভীষণ দুর্ভিক্ষ্য ভয়ে সদাই শশঙ্কিত; দুর্ভিক্ষ্য রাক্ষসী যেন করালবদন-ব্যাদানপূর্ব্বক ভারতকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। যে দিকে চাও সেইদিকেই দেখিবে দুর্ভিক্ষ্য অনল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। ভারতের যেন আর সেরূপ উর্ব্বরা শক্তি নাই; ভারতের যে মৃত্তিকা স্বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইত, অদ্য সেই মৃত্তিকা যেন পাষাণবৎ হইয়া উঠিয়াছে। তবে কি ভারত আজ শস্য দানে পরাঙ্মুখ? না ভারত যে ভারত সেই ভারতই আছে, ভারতের কোন পরিবর্ত্তনই ঘটে নাই; পরিবর্ত্তন কালের ও তাহার কুটিল চক্রের সহিত আমাদেরই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

আমরা সর্ব্বসমক্ষে ভারত সন্তান, আর্য্য-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, কিন্তু যে আর্য্য মহাত্মাগণ কৃষিকার্য্যকে ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, আমরা অদ্য সেই কৃষিকার্য্যকে সামান্য নীচ ব্যবসা জ্ঞানে সদাই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি। যে সকল শ্রমজীবি চাষা কৃষিকার্য্য করে, যাহাদের দ্বারা আমরা চর্ব্ব-চষ্য করিয়া উদর পূরণ করিয়া থাকি, তাহাদিগকে সামান্য "চাষা" নামে অভিহিত করিয়া আমরা সর্ব্বদাই অবজ্ঞা করিয়া থাকি; কেননা তাহারা পরাধীনতা চায় না। আমরা সভ্য হইতে শিখিয়াছি, চাকুরী করিতে শিখিয়াছি, পরের অধীনতা করিতে শিখিয়াছি, আমরা শিক্ষিত আর তাহারা অশিক্ষিত।

যে আর্য্যজাতি কখন কাহারও অধীনতা স্বীকার করেন নাই, যে আর্য্য-জাতি নিজের জীবন উৎসর্গ করা প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন, যে আর্য্যজাতি স্বার্থ কেমন তাহা জানিতেন না, যে আর্য্যজাতি সমুদায় পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বোপরি প্রধান হইয়া আপনাদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও আধিপত্য স্থাপনপূর্ব্বক, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শীতা প্রকাশ করিয়া এই অসীম অনন্ত অবনীমণ্ডলে কীর্ত্তিকলাপ বিস্তারিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই তীব্র বীর্য্যোৎপন্ন হইয়া আধুনিক আর্য্যগণকে যে এতাদৃশ নিস্তেজ, নির্বীর্য্য ও সাহস পরিশূন্যাবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতে হইতেছে এবং পরপদ-দলিত হইয়া তাঁহাদিগের চরণ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক দীনের ন্যায় কালক্ষেপ করতঃ স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!

স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রথমতঃ চিত্রপটে উদিত হয় যে, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু কখন এককালে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই; কোনটী বা অগ্রে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ হইয়া শেষে তাহার অবনতি হইয়াছে আবার কোনটী বা দৈন্যদশা হইতে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে, ইহাই প্রকৃতির অখণ্ড নিয়ম। আমাদের ভারতের আজ প্রথমোক্ত প্রকার অবস্থা। কিন্তু তা'বলে কি ভারতের ভাগ্য চিরকালই তিমিরাচ্ছন্ন থাকিবে? এমত কখনই নহে। যদ্যপি ভারত সন্তানগণ পুনরায় আদিম আর্য্যমহাত্মা-দিগের ন্যায় স্বাবলম্বন দ্বারা জিবীকানির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা করেন তবেই ভারতের ভাগ্য আবার সুপ্রসন্ন হইবে।

যতদিন পর্য্যন্ত আমরা কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ না করিব, ততদিন ভারতের উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। মহামুনি পরাশর বলিয়া গিয়াছেন যে, "সামান্য মানব হইতে এক সময়ে ইন্দ্রাদি দেব পর্য্যন্তেরও অর্থের অভাব হইয়া থাকে, অতএব অর্থের অভাব হইলে অগত্যা তাঁহাকে পরের নিকট প্রার্থনা করিতে হয় সুতরাং প্রার্থনা জন্য লঘুতা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু যিনি কৃষিকর্ম্ম করেন তাঁহার কখনও অভাব হয় না, সুতরাং তাঁহাকে কাহারও নিকট আর লঘুতা স্বীকার করিতে হয় না।"

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু।

দেশী লঙ্কার আবাদ।

লঙ্কার আবাদ বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুচবিহার, রংপুর, জলপাইগুড়ী, বাখরগঞ্জ, যশোহর প্রভৃতি জেলায় ইহার বহুল পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে।

উচ্চভূমিতে লঙ্কার আবাদ করিতে পারিলে, লঙ্কার ফলন খুব অধিক হইয়া থাকে, সুতরাং লাভেরও সম্ভাবনা অধিক। অতি অল্পদিনের মধ্যেই লঙ্কাগাছ ফল প্রসব করিয়া থাকে। দো-আঁস পলি মৃত্তিকাই লঙ্কার চাষের পক্ষে উপযুক্ত। বৈশাখ মাস হইতে লঙ্কা রোপণ করিবার জমী নির্দ্ধারণ করিয়া রাখা আবশ্যক। লঙ্কাক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে যেন অন্য কোনও বৃক্ষাদি না থাকে। প্রথমে জমীতে উত্তমরূপে দুইবার লাঙ্গল দিয়া জমীকে সমতল করিয়া ঘাস, মুথা ইত্যাদি যে-সমস্ত আবর্জ্জনাদি থাকিবে, তৎসমুদায় উত্তমরূপে বাছিয়া ফেলিবে; পরে তাহাতে গোময় মিশ্রিত করিয়া বর্ষার জলের নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া থাকা উচিত। তৎপরে বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া জমী উত্তমরূপ ভিজিয়া গেলে বীজবপনের উপযুক্ত হয়। জমী বেশ সরস হইয়া উঠিলে, জমীর পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র কূপ খনন করতঃ তাহাতে বীজগুলি লইয়া অতি সাবধানতার সহিত বপন করিবে। বর্ষাকালেই কূপের ভিতর বীজ ছড়াইতে হয়, কিন্তু সাবধান! যেন কূপটি বৃষ্টির জলে পূর্ণ হইয়া না যায়; এই জন্য যাহাতে কূপের ভিতর জল থাকিতে না পায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

কূপের ভিতর চারাগুলি ৫।৬ ইঞ্চি আন্দাজ বড় হইলে তুলিয়া তাহা ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। একহাত অন্তর ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লঙ্কাচারা রোপণ করা উচিত। বৃক্ষের নিম্নে যাহাতে ঘাস, মুথাদি জন্মিতে না পারে তদ্বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ঘাস, মুথা ইত্যাদি অন্য গাছ জন্মাইতে দেখিলেই তাহা তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিবে; মধ্যে মধ্যে লঙ্কাবৃক্ষের মূলস্থ মৃত্তিকা খুসকাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

আষাঢ় মাসে বীজবপন করিতে হয়, ভাদ্র, আশ্বিন মাসে বৃক্ষ হয়। কার্ত্তিক মাসে ক্ষেত্রে তুলিয়া রোপণ করিবার উপযুক্ত সময় হয়। অগ্রহায়ণ মাস হইলে লঙ্কা গাছ ফুল ফলে পরিশোভিত হয়। লঙ্কা পাকিলে ক্ষেত্র যে কি অপূর্ব্ব শোভাধারণ করে তাহা এক মুখে বলা যায় না।

অগ্রহায়ণ মাসে যদিও প্রায় সমস্ত বৃক্ষেই কাঁচা লঙ্কা থাকে ও কাঁচা লঙ্কা কম মূল্যে বিক্রয় হয় তথাপি একবার সমস্ত লঙ্কা ভাঙ্গিয়া ফেলা আবশ্যক; কারণ গাছের প্রথম ফলন ছিঁড়িয়া দিলে দ্বিতীয় ফলন প্রথম ফলন অপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়া থাকে, ইহা আমাদের বিশেষ পরিক্ষীত। তিন মাস কাল যাবৎ লঙ্কাগাছ বেশ ফল প্রদান করিয়া থাকে। এ বৃক্ষের এই একটী গুণ যে, প্রত্যেক মাসেই নূতন ফল প্রসব করে। চাষীরা লঙ্কাক্ষেত্র হইতে অপরির্য্যাপ্তরূপে ফল পাইয়া থাকে।

লঙ্কা পাকিলে, গাছ হইতে তুলিয়া সমস্ত লঙ্কা রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিতে হয় এবং রাত্রিকালে লঙ্কাগুলি ফাঁকা জায়গায় ছড়াইয়া শিশির খাওয়াইয়া, লঙ্কাগুলিকে থলেতে উত্তমরূপে আবদ্ধ করিয়া জাঁত দিয়া রাখিতে হয়। জাঁত দিয়া রাখিলে লঙ্কাগুলি সমুজ্জল ও ঘোর লোহিতবর্ণ থাকে। যদ্যপি উক্তরূপ জাঁত দেওয়া না হয়, তাহা হইলে লঙ্কার বর্ণের অতিশয় তারতম্য ঘটিয়া থাকে। লঙ্কাচাষে লাভ মন্দ নহে। অনেক ভদ্র সন্তান ১০।১২ টাকার চাকুরীর জন্য লালাইত; তাঁহারা যদি একবার এই স্বাধীন উপজীবিকার উপর লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে আর বৃথা তাঁহাদের ১০।১২ টাকার চাকুরীর জন্য পরের অধীনতা স্বীকার করিয়া সমস্ত জীবনটা কষ্টে অতিবাহিত করিতে হয় না। লঙ্কাচাষের লাভালাভের একটী ক্ষুদ্র তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

লঙ্কা রাখিবার নিয়ম।

খরচের তালিকা—

জমীর কর	...	...	৪৲ টাকা।
দুই জন কৃষকের বেতন	...	...	১০৲ "
দুই সপ্তাহ লাঙ্গল দিবার খরচ	...	...	৬৲ "
শুকাইতে ও অন্যান্য বাঃ	...	...	৭॥০ "
			মোট ২৭॥০ টাকা।

এক বিঘা জমীতে তিন মাসে খুব কম হইলেও দশগণের নিচে হইবেক না।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু।

তামাকের আবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯৩ পৃষ্ঠার পর।)

প্রতি বিঘায় তামাকের বীজ প্রায় ১০।১২ দশ বার তোলা হিসাবে বপন করিতে হয়। তামাক আকৃতিগত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক প্রকার "ছোটনা" অর্থাৎ ক্ষুদ্র আকৃতির এবং অপর প্রকার "বড়না" অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকৃতির। ছোট তামাকের বীজ প্রতি বিঘায় ১২ তোলা এবং বড় তামাকের বীজ প্রতি বিঘায় ১০ দশ তোলা বপন করিলেই ভাল হয়।

একহস্ত প্রস্থ ও দশ হস্ত দীর্ঘ জমীর উপর তামাকের বীজের তলা-ফেলা আবশ্যক। উক্ত স্থানটী মাপমত স্থির করিয়া লইয়া উহার চতুর্দ্দিকে কোদাল দ্বারা অর্দ্ধহস্ত চৌড়া ও ৫।৬ অঙ্গুলি গভীর একটী নর্দ্দমার ন্যায় খানা কাটা আবশ্যক। হাপরে বীজ বপন করিবার পর হস্তদ্বারা হাপরের মাটি ভালরূপ চারাইয়া দিতে হইবে। কেবল মাত্র চারাইয়া দিলেই চলিবে না, মাটি হাপরের উপর চাপিয়া দেওয়া আবশ্যক। উপরোক্ত প্রকারে হস্তদ্বারা মাটি চাপিয়া দেওয়ার পর পুনরায় পদদ্বারা ভাল করিয়া মাটি চাপিয়া দেওয়া উচিত। ইহার পর হাপরের উপর ঘুঁটের ছাইএর গুঁড়া ছড়ান আবশ্যক। ছাই ছড়াইয়া দিয়া উহা হস্তদ্বারা চাপিয়া ক্ষেত্র সমান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্যান্য বীজ অপেক্ষা আমাদের বীজ বপন করিবার সময় সাবধানতা অবলম্বন

করা কর্ত্তব্য। কারণ তামাকের বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকৃতির, উহা সামান্য বাতাস লাগিলেই উড়িয়া বা সরিয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে যে সকল বীজে তৈলের অংশ বর্ত্তমান আছে সেই সকল বীজ বপন করিবার পর বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। তৈলাক্ত বীজ পাইলেই পীপিলিকা প্রভৃতি কীটেরা উহা নষ্ট করিয়া ফেলে এইজন্য হাপরে ঘুটের ছাই ছড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। উপরোক্ত প্রকারে ক্ষেত্রে ছাই দেওয়ায় যেমন উপকার হয় সময়ে সময়ে তেমনি অপকারও হইতে পারে। ছাই দেওয়ায় প্রধান উপকার এই যে ছাইএর তেজে পীপিলিকা প্রভৃতি কীট অবিলম্বে ক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করে। অপর উপকার এই যে, ক্ষেত্রে যদি ছাই চাপা না দেওয়া হয় তাহা হইলে অধিক বৃষ্টিপাত হইলে বৃষ্টির তেজে ক্ষেত্রের মাটি চটিয়া ফাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যতই কেন বৃষ্টি হউক না, উপরে ছাই থাকিলে ঐ ছাইএর সহিত মাটি কামড়াইয়া বসিয়া যায়, সুতরাং ক্ষেত্রের মাটি চটিতে বা ফাটিতে পারে না। ক্ষেত্রে ছাই দেওয়ায় অনিষ্ট এই যে, অত্যন্ত উত্তাপের সময় হাপরের ভিতর সহজে জল প্রবেশ করিতে পারে না সুতরাং জলাভাবে হাপরের চারা সকল নিতান্ত দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া মরিয়া যায়।

তামাকের বীজ বপন করিবার পর যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে বীজ বপন করিবার পর তৃতীয় দিবসে অপরাহ্নে হাপরের উপর খুব সরুধারে জলসিঞ্চন করা কর্ত্তব্য। এরূপভাবে জলসিঞ্চন করা আবশ্যক যেন সমস্ত বীজগুলা ভিজিয়া জল বাহিরে গড়াইয়া আসে। উপরোক্ত প্রকারে জল দেওয়া হইলে দুই তিন দিন পরে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া উহা হইতে চারা উৎপন্ন হয়। প্রায় পাঁচ ছয়দিন পরে সমস্ত চারা বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু চারা বাহির হইলেই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। তখনও প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল হাপরের কার্য্যে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সময়ে হাপরে যে সকল খোলা কাঁকর থাকে বা যে সকল ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হয় সে সমস্ত নিড়ান দ্বারা খুসিয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ ঐ সকল ঘাস জঙ্গল প্রভৃতির জল তামাকের চারার গাত্রে লাগিলে উহার পাতা পচিয়া যাইতে পারে। এই সময়ে গাছের চতুর্দ্দিকে ঘুরঘুরে পোকা লাগিয়া গাছ সকল নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। সুতরাং যাহাতে ঘুরঘুরে পোকা না লাগিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। (ক্রমশঃ)

প্রবাদ বাক্য।

মূলার ভুঁই তুলা।
আকের ভুঁই ধূলা॥

অর্থাৎ আকের জমি উত্তম রূপে পাইট করিয়া তাহা ধূলার মত করিতে হয়। কিন্তু এই প্রবাদ বাক্য সকল স্থানে খাটেনা। ঘোর জঙ্গল জায়গায় ইক্ষু লাগাইলে সেই জঙ্গল কাটিয়া তাহা পোড়াইয়া দিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে আকের ডগা লাগাইয়া দিলেই যথেষ্ট আক জন্মে। কোন প্রকার চাস বাসের আবশ্যক হয় না।

(যদি থাকে) বার নাতি তের পুতি।
তবে কর কুশার ক্ষেতি॥

ইক্ষু কর্ত্তন ও পিড়াইবার সময় লোক জনের বেশী দরকার হয়। নিজের লোকজন না থাকিলে অপরের সাহায্যে কাজ করাইতে হইলে ব্যয় বাহুল্য হয় বলিয়া এই প্রবাদের সৃষ্টি। বাস্তবিক নিজের লোক না থাকিলে অপরের দ্বারা কাজ করাইলে কিছু কিছু লোকসান হয়।

পৌষের শেষ হইতে ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত আক পিড়াইবার প্রকৃত সময়। এই সময় যে রস হয় তাহাতে গুড় ভাল হয় কিন্তু বোম্বাই আকের গুড় করিতে হইলে তাহা মাঘ মাসের শেষে পিড়াইতে আরম্ভ করিয়া ফাল্গুন মাসের মধ্যে কার্য্য শেষ করা উচিত।

অন্যান্য কৃষি অপেক্ষা আকের চাসে লাভ অধিক কিন্তু পরিশ্রমও অত্যন্ত। ভাল আক জন্মিলে খরচ খরচা বাদে প্রতি বিঘায় ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে।

শ্রীহরিপ্রসন্ন মৈত্র।

দেশী মূলার আবাদ-প্রণালী।

দেশীয় তরকারীর মধ্যে মূলা প্রসিদ্ধ। কিন্তু মূলার আবাদ-প্রণালী নিতান্ত সহজ নহে। বিশেষ সাবধানতার সহিত আবাদ না করিলে মূলার চাষে কৃত-

কার্য্য হওয়া সুকঠিন। প্রতি বিঘায় ৵৷৹ অর্দ্ধ সের পরিমাণ বীজ হইলেই চলিতে পারে। মূলার আবাদের জমি বারমেসে এবং দোআঁশ ও পলিযুক্ত হইলেই ভাল হয়।

মাঘ মাসের প্রথম হইতে মূলার জমিতে প্রতি মাসে তিন চারি বার করিয়া লাঙ্গল দ্বারা এক বা দেড় হস্ত পরিমাণ গভীর করিয়া চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে চাষ দিয়া ক্ষেত্রের ঘাস জঙ্গল প্রভৃতি নষ্ট হইলে চৈত্র বা বৈশাখ মাসে ঐ ক্ষেত্রে পঞ্চাশ মণ পচা গোময় সার দিয়া পুনরায় প্রতি মাসে তিন চারি বার করিয়া চাষ দিতে হইবে। কিন্তু শ্রাবণ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত প্রায়ই বৃষ্টির আধিক্য হইয়া থাকে; সুতরাং এই সময়ে আর জমিতে চাষ দেওয়া প্রয়োজন হয় না, তবে শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যে যদি কোনও সময়ে একযোগে দশ পনর দিবস বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে ক্ষেত্রে একবার চাষ দিলে বরং উপকারই হইয়া থাকে, যদি কখনও এইরূপে জমিতে চাষ দেওয়া হয় তাহা হইলে উহাতে দুই এক পালা মই দিবারও আবশ্যক হয়, কারণ জমিতে চাষ দিয়া যদি মই না দেওয়া হয় তাহা হইলে সমস্ত বৃষ্টির জলই জমিতে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। বেশী বৃষ্টির জলে জমি অতি-রিক্ত পরিমাণে আর্দ্র থাকিলে কার্ত্তিক মাসে ঐ জমির মাটি ঝরঝরে থাকেনা, সুতরাং মূলার বীজ বপনেরও সুবিধা হয় না। মূলার বীজ বপন কালে জমি অধিক পরিমাণে রসযুক্ত থাকিলে, বীজগুলি অতি শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। এদিকে যেমন শীঘ্র শীঘ্র বীজ অঙ্কুরিত হইল অপর দিকে সেইরূপ হৈমন্তিক বায়ুর প্রভাবে ক্ষেত্রের জমিও টানিয়া যাইতে লাগিল। ফলে এই দাঁড়াইল যে চারাগুলি হরিদ্রাবর্ণের হইয়া একবারে মারা পড়িল, মোট কথা মূলার জমি বেশ নরম মাটিযুক্ত হওয়া আবশ্যক, আমাদের দেশের চাষীরা বলিয়া থাকে, "মূলার জমি তুলা," অর্থাৎ মূলার জমি তুলার ন্যায় কোমল হওয়া আবশ্যক।

উপরোক্ত প্রকারে জমি প্রস্তুত হইলে, উহাতে আর একবার লাঙ্গল দিয়া চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে উহাতে বীজ বপন করিয়া আর একবার ভাসা ভাসাভাবে ঐ জমিতে চাষ দিয়া দুই পালা মই দেওয়া আবশ্যক।

প্রাগুক্ত প্রকারে বীজ বপন করিবার পাঁচ সাত দিন বাদে বীজ অঙ্কুরিত

হইয়া চারা বাহির হয়, যখন প্রতি চারাতে দুই তিনটী পাতা দেখা যাইবে ঐ সময় ক্ষেত্রে ঘাস প্রভৃতি যে কোনও আগাছা জন্মিয়াছে তাহা নিড়ান দ্বারা পরিস্কার করা কর্ত্তব্য। মূলার ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে কোনও প্রকার পতিত জমি থাকা উচিত নহে। কারণ পতিত জমিতে এক প্রকার পতঙ্গ জন্মিয়া থাকে, উহারা মূলার গন্ধ পাইলেই মূলাক্ষেত্রে পড়িয়া সমস্ত মূলা নষ্ট করিয়া ফেলে, ক্রমে যখন চারা হইতে ৫,৭,৮ পাতা বাহির হয় ও চারাগুলি থোবাযুক্ত বোধ হয় তখন নিড়ানি দ্বারা জমি পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। যদি জমির নিম্নের মৃত্তিকা শুষ্ক থাকে তাহা হইলে উহাতে একবার জলসিঞ্চন করা উচিত, হেমন্তের সময় শুষ্ক মাটিতে মূলার আবাদ করিলেই ভাল হয়। মূলার ক্ষেত্রে পারতপক্ষে জল সিঞ্চন করা উচিত নহে, মধ্যে মধ্যে জল সিঞ্চন করিলে মূলার আকার বড় হয় বটে কিন্তু উহার আস্বাদন কিছুই থাকে না, মূলার ক্ষেত্রে অসময়ে বৃষ্টিপাত হইলে সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে।

মূলার আবাদের কিঞ্চিৎ আভাষ উপরে প্রদত্ত হইল। কিন্তু মূলার বীজ সংগ্রহ সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না, মূলার বীজ সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, আমরা বারান্তরে মূলার বীজ সংগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ইক্ষুর জাতি ভেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১০ পৃষ্ঠার পর।)

আমাদের দেশে বোম্বাই, সাম্সাড়া বা সম্সের, কাজলী, বলী, কামরাঙ্গা ও খাগড়ী এই কয়জাতির ইক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বোম্বাই, সাম্সাড়া ও কামরাঙ্গা জাতীয় ইক্ষুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই তিন জাতীয় ইক্ষুর চাসে বিঘ্নও যথেষ্ট। নিম্নে একে একে এই সমুদায় ইক্ষুর বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইল।

বোম্বাই। এই আকের রস অত্যন্ত বেশী হয় বটে কিন্তু পাতলা। ইহার এক সের রসে আধপোয়ার অধিক গুড় হয় না। ফাল্গুন মাসের প্রথমে পিড়াইলে তিন ছটাক পর্য্যন্ত হয়। ইহার রসে গুড় কম হইলেও সর্ব্ব প্রকার ইক্ষু হইতে ইহার চাসে অধিক লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার একটী প্রধান

দোষ এই যে কি একটী পীড়া হইয়া সময় সময় সমুদায় ক্ষেতের চারা মরিয়া যায়। এপর্য্যন্ত আমরা এই পীড়ার কারণ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই রোগ প্রতিকারের অনেক চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। যদি ইহার রোগ হইয়া চারা মরিয়া না যায় তবে প্রতি বিঘায় ৫০।৬০ মণ পর্য্যন্ত গুড় হইতে পারে। রোপণ-প্রণালী পূর্ব্বোক্ত প্রকার। ইহা জড়াইয়া দিতে হয় না। যত পাঁপ ছাড়ে ততই পাতা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। ইহার ক্ষেত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া রক্ষা করিতে হয় নতুবা শিয়ালে খাইয়া সমুদায় নষ্ট করিয়া ফেলে। মুড়ী (গোড়া) রাখিলে দুইবার ফসল পাওয়া যায়। প্রথম বার অপেক্ষা দ্বিতীয় বারে অধিক ফসল জন্মে। ইহার রসে গুড় বেশ পরিষ্কার হয়।

সাম্‌সাড়া। ইহার বিবরণ অবিকল বোম্বাই-আকের ন্যায় কিন্তু বোম্বাই আকের মত অধিক গুড় হয় না ও মরিয়াও যায় না। ভাল আক জন্মিলে প্রতি বিঘায় ২৫।২৬ মণ গুড় হইতে পারে।

কাজলী ও ধনী। এই দুই জাতীয় ইক্ষু হইতে অধিক রস পাওয়া যায় না। ভালরূপে জন্মিলে প্রতি বিঘায় ২০ মণের অধিক গুড় হয় না। ইহাদের পাতা জড়াইয়া দিতে হয়। রস খুব ঘন হয় বলিয়া গুড়েরও ফলন বেশী। ধনী আকের গুড় পরিষ্কার হয় কিন্তু কাজলী আকের রসে কিছু লবণের অংশ আছে বলিয়া গুড় কিছু লালচে রঙ্গের হইয়া থাকে। কাজলী আকের প্রধান দোষ এই যে ইহার দণ্ডগুলি রৌদ্র লাগিয়া প্রায়ই ফাটিয়া যায় এজন্য রসও অধিক হয় না। রোপণ-প্রণালী পূর্ব্ববৎ দুই বৎসর মুড়ী রাখা যাইতে পারে। প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরে ফসল বেশী হয়।

কামরাঙ্গা। ইহার পাতা জড়াইয়া দিতে হয় না, ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। এই আকের উপর শক্ত কিন্তু ভিতর বড় নরম। বেশী দিনের পতিত জমিতে ইহা খুব ভাল জন্মে। আক ভাল হইলে প্রতি বিঘায় ২৫।২৬ মণ গুড় হইতে পারে। একবার রোপণ করিলে দুই বৎসর ফসল পাওয়া যায়। প্রথম বার অপেক্ষা দ্বিতীয় বারে মুড়ী হইতে অধিক চারা জন্মিয়া থাকে। ইহার গুড় বড় পরিষ্কার হয় না একটু লাল হয়।

খাগড়ী। ইহাকে জঙ্গলী বা নটা আক বলে। ইহা অত্যন্ত শক্ত হয় বলিয়া গোরু বাছুরে বেশী লোকসান করিতে পারে না। রস অত্যন্ত ঘন হয়

ফাল্গুন মাসের প্রথমে পিড়াইলে চারিসের রসে একসের গুড় হইয়া থাকে। ইহার গুড় তীব্র মিষ্ট অধিক খাওয়া যায় না। ইহা একবার রোপণ করিলে ৫।৬ বৎসর থাকে। বেশী যত্ন ও পরিশ্রম না করিলেও ইহার কোন অনিষ্ট হয় না। এই আকের গোড়ায় দাঁড়া ধরিয়া দিতে হয় না। পাতা জড়াইয়া কি ভাঙ্গিয়া দিবারও কোন আবশ্যক করে না; ঐ আক কাটিয়া ইহার গোড়ার জাব্ড়া (আবর্জনা) গুলি আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিয়া একবার কি দুইবার কোদালী করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়। ইহার জন্য বেশী পরিশ্রম কি পাইট করিতে হয় না। এই আকের চাষই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

নানা কথা। ইক্ষু ক্ষেত্রের ভূমি কোদালী না করিয়া শুদ্ধ লাঙ্গল দ্বারাও চাষ করা যাইতে পারে। কোদালী করিয়া মাটি উলাইয়া দিলে জমির "ভাব" মরিয়া যায় এ জন্য কোদালী করাই ভাল। চারা রোপণের সময় লাঙ্গলের "ফালট্" দিয়াও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চারা রোপণ করা যাইতে পারে।

ইক্ষুক্ষেত্র সযত্নে রক্ষা করিতে হয়। গোরু বাছুর না যাইতে পারে এজন্য ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে পগার দিয়া তাগার উপর মজবুত করিয়া বেড়া দিতে হয়। আক জন্মিলে সর্ব্বদা পাহারা দেওয়া কর্ত্তব্য। আকগুলি যাহাতে খাড়া থাকে সর্ব্বদা এই চেষ্টা করা উচিত। আক পড়িয়া গেলে রস পাতলা হয় সুতরাং গুড়ও কম হইয়া থাকে। চারা রোপণের পর কোন কোন ক্ষেত্রে উই লাগিয়া চারা মারিয়া ফেলে। চারায় উই লাগিলে তাহার গোড়ায় গোরুর চোনা ঢালিয়া দিলে উই মরিয়া যায়।

মুড়ী আক। আক কাটিয়া লইয়া তাহার গোড়া রাখিয়া দিলে সেই গোড়া হইতে চারা বাহির হইয়া যে ইক্ষু জন্মে তাহাকে "মুড়ী আক" বলে। মুড়ী রাখিতে হইলে আক কাটার পর তাহার গোড়াগুলি ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া উত্তম রূপে কোদালী করিয়া সেই গোড়াগুলি মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। আবশ্যক বোধ করিলে গোড়ায় গোবরের সার দেওয়াও যাইতে পারে। বৎসরের মধ্যে মুড়ী আকের গোড়ায় ২।৩ বার কোদালী করিয়া দিতে হয়। বোম্বাই, সাম্‌সাড়া ও কামরাঙ্গা এই তিন জাতীয় আকের মুড়ী এক বৎসর ভাল হয়। কাজলী ও খলী আকের দুইবার মুড়ী রাখা যাইতে পারে কিন্তু খাগড়ী আকের মুড়ী ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাখিলেও তাহা নষ্ট হয় না।

কোন কোন স্থানে মুড়ি আক রাখা অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া তাহা রাখিয়া দেয়না। মূড়ী কার্ত্তিক মাসে পিড়াইতে হয়।

ব্রকলি নামক ফুলকপি।

(BROCOLI.)

উপরে যে নয়নমনোহর উদ্‌ভিজ্জের প্রতিরূপ চিত্রিত রহিয়াছে উহাই ব্রকলি নামক ফুল কপির প্রতিরূপ। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এই ফুলকপির আবাদ হইত না, কিন্তু এক্ষণে উহা আমাদের দেশেও যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিতেছে। উহা আমাদের দেশে যে আবাদ হইত না, তাহার কারণ যে উহা আমাদের দেশজাত উদ্‌ভিজ্জ নহে। সুদূর আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good-Hope) ব্রকলির জন্ম স্থান। আজ কাল অন্যান্য বিদেশীয় দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে উহাও আমাদের দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে দেশের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল নাই। বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে দেশে আসিয়া পড়িলে দেশের ক্ষতি হয়; কিন্তু বিদেশীয় দ্রব্যের আবাদ-প্রণালী এ দেশে প্রচলিত হইলেও বিদেশীয় দ্রব্যের আবাদ প্রচুর পরিমাণে করিতে পারিলে দেশের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে নূতন নূতন প্রকার শাকসবজী বা ফলফুলের আবাদ করিতে পারা যায় প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তিরই সেই প্রকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ব্রকলি ফুলকপির গাছ কৃষ্ণবর্ণের হইয়া থাকে; কিন্তু ইহার ফুল লালের

আভাযুক্ত সবুজ। ইহা দেখিতে বড়ই সুন্দর। যখন উদ্যানে প্রচুর পরিমাণে ব্রকলি ফুলকপি বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তখন উদ্যানের শোভা দৃষ্টিগোচর করিলে আনন্দে মনপ্রাণ নৃত্য করিতে থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তার অসীম সৃষ্টি-কৌশল অবলোকন করিয়া হৃদয়ে ভক্তিরসের উদয় হয়।

ব্রকলির বাহ্য সৌন্দর্য্য যেরূপ নয়ন-মনোরম ইহার আস্বাদনও সেইরূপ মধুর ও রসনা-তৃপ্তিকর। একবার ব্রকলির মধুর আস্বাদন গ্রহণ করিলে আর ভুলিতে পারা যায় না। এই সুস্বাদু ফুলকপির এমন একটী বিশেষ আস্বাদন আছে যাহা অন্য কোনও ফুলকপিতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাঁহারা এই তৃপ্তিকর ফুলকপির আস্বাদন গ্রহণ করেন নাই, আমরা তাঁহাদিগকে একবার ইহার আস্বাদন করিতে অনুরোধ করি।

ব্রকলির আবাদ-প্রণালী অন্যান্য ফুলকপির আবাদ-প্রণালীর ন্যায়। সুতরাং উহা এস্থলে আর স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হইল না।

যদিও ব্রকলির জন্মস্থান আফ্রিকা প্রদেশে, কিন্তু এক্ষণে উহা বিলাত ও আমেরিকা প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিতেছে। আমাদের দেশেও উহার উত্তমরূপ আবাদ হইতে পারে এবং হইতেছে। যাহাতে এই সুমিষ্ট ফুলকপির আবাদ দেশমধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত হয় আমরা নিয়তই তাহার চেষ্টা করিয়া থাকি। আমরা প্রতি বৎসর ইহার বীজ ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে আনয়ন করিয়া আমাদের গ্রাহকবর্গের সন্তোষ সম্পাদনে চেষ্টা করিয়া থাকি।

দেশী মূলার বীজ সংগ্রহ।

আমরা "দেশী মূলার আবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধে দেশী মূলার বীজ সংগ্রহ করিবার কথা কিছুই বলি নাই। অদ্য মূলার বীজ সংগ্রহ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব। মূলার গাছ হইতে উহার বীজ সংগ্রহ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে; এই নিমিত্ত কৃষকেরা প্রায়ই অন্য স্থান হইতে আনীত মূলার বীজই রোপণ করিয়া থাকে। মূলার বীজ আমাদের দেশের নানাস্থান হইতে আমদানী হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মূলার আকৃতি, আস্বাদন ও গঠন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। বাঁকিপুর ও পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে

যে সকল মূলার বীজ আমদানী হয় তদুৎপন্ন মূলার দৈর্ঘ্য তত অধিক হয় না, যদি বেশী লম্বা হয় তাহা হইলে অর্দ্ধ হস্ত কিম্বা আড়াই পোয়া পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। পাটনাই মুলার বর্ণ কিছু সাদা। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত জাড়া ও মাণিককুণ্ড হইতে যে মুলার বীজ আমদানী হয় তদুৎপন্ন মূলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এই মূলা দেখিতে যেমন সুন্দর ইহার আস্বাদনও সেইরূপ মধুর। ইহার বাহিরের বর্ণ লাল এবং ভিতরের বর্ণ সাদা, দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় হস্ত পরিমাণ এবং স্থৌল্যেও তদনুরূপ হইয়া থাকে। এই মেদিনীপুর জেলার হিজলীকাঁথী ও এগরা প্রভৃতি স্থানের মূলাও খুব প্রসিদ্ধ। হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ প্রভৃতি স্থানের মূলাও খুব ভাল। কিন্তু মেদিনীপুরের অন্তর্গত জাড়া, কাঁথী ও এগরা প্রভৃতি স্থানের কৃষকেরা যেরূপ বীজ প্রস্তুত করিতে পটু অন্য স্থানের কৃষকেরা সেরূপ পটু নহে।

এস্থলে একটী কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বড় মূলার বীজ হইলেই যে তদুৎপন্ন মূলা নিশ্চয় বড় হইবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই। আবাদের তারতম্যানুসারেই মূলার আকৃতি ও আস্বাদনের তারতম্য হইয়া থাকে। আবাদের গুণেই মূলা কেবল ছোট মাঝারী এবং এমন কি কেবল মাত্র শাক জন্মিয়া থাকে। আমন ও আউস এই দুই প্রকার ভেদে মূলা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

যে মূলাগাছে বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে উহা প্রথম হইতে চিহ্নিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। পরে মাঘ মাসে যখন দেখিবে যে ঐ গাছগুলিতে ফুল হইবার উপক্রম হইয়াছে তখন যে স্থানে হাদী দেওয়া হইবে সেই স্থানটী নির্ণয় করিয়া পরিষ্কৃত রূপে হাদীর উদ্‌যোগ করিতে হইবে। ফুল হইবার উপক্রম হইলেই মূলার গাছের পাতাগুলি ক্রমশঃ ছোট হইতে আরম্ভ হয়। উহা দেখিয়াই গাছে ফুল হইবে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

এই সময়ে যে ঘরে হাদী দেওয়া হইবে সেই ঘরের মেজেতে ভাল বালী দুই তিন অঙ্গুলি ছড়াইয়া হাদীর স্থান প্রস্তুত করিতে হইবে। তৎপরে বীজের জন্ম চিহ্নিত মূলাগুলির বড় বড় পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট ডগার পত্র ও দুই বা এক অঙ্গুলি পরিমাণ মূলা ভাল ছুরি বা কাস্তে দ্বারা কাটিয়া লইয়া, উপরোক্ত বালুকা বিস্তৃত স্থানে ঠিক সোজা ভাবে এবং পরস্পর সংলগ্ন করিয়া

হাদী বা কাঁড়ী দিতে হইবে। এইরূপে কাঁড়ী দেওয়ার দুই তিন দিন পরে মূলাগুলির উপর সামান্য পরিমাণ জল সিঞ্চন করা কর্ত্তব্য। এরূপভাবে জল সিঞ্চন করিতে হইবে যেন কেবলমাত্র মূলার উপরিস্থিত ক্ষুদ্র পত্রগুলি মাত্র ভিজে। অধিক পরিমাণ জল দিয়া নিচের বালী পর্য্যন্ত ভিজাইয়া কাদা করিয়া দিলে মূলাগুলি পচিয়া যাইতে পারে।

যে ঘরে হাদী বা কাঁড়ী দেওয়া হইবে সেই ঘরের দরজা প্রাতঃকাল হইতে বেলা নয়টা ও বৈকাল তিনটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খুলিয়া রাখা আবশ্যক। ঐ গৃহে প্রচণ্ড রৌদ্র তাপ কিংবা রাত্রের শিশির প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। শিশির অন্যান্য অনেক উদ্ভিজ্জের প্রাণস্বরূপ হইলেও মূলার বীজের পক্ষে উহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

মূলার গাছে এইরূপে প্রথমবার জল সিঞ্চনের পর যখন উহার পত্রগুলি ঈষৎ হরিদ্রাভ হইয়া উঠিবে তখন উহাতে আর একবার জল সিঞ্চন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ দ্বিতীয়বার জল সিঞ্চনের তিন চারি দিন পরে ফুলের কুঁড়ি বাহির হইয়া থাকে, এই কুঁড়ি যখন তিন চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ হয় তখন উহাতে আর একবার জল সিঞ্চন করা উচিত। ইহার দশ বার দিন পর যখন ফুলের শীষগুলি এক হস্ত দেড় হস্ত পর্য্যন্ত লম্বা হইবে তখন আর একবার উহাতে সামান্য পরিমাণে জল সিঞ্চন করা কর্ত্তব্য। এই জল সিঞ্চনের পর আর মাসাবধি কাল উহাতে জল ব্যবহার করার প্রয়োজন হইবে না। ইহার কিছু দিন পরে মূলার ফুলগুলিতে সরিষার শুঁটীর ন্যায় বহু সংখ্যক শুঁটী ধরিতে আরম্ভ হয়। শুঁটী ধরিতে আরম্ভ করিলে উহাতে একবার জল সিঞ্চন করিতে হইবে এবং যাহাতে শুঁটীগুলিতে পরিষ্কৃত বাতাস লাগে তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। এইরূপে শুঁটী ধরিতে আরম্ভ হইবার প্রায় একমাস পরে, শুঁটীগুলি পরিপক্ক হয় অর্থাৎ শুঁটীর অভ্যন্তরস্থ বীজগুলি পরিপক্ক হইয়া উঠে।

শুঁটীগুলি উত্তোলন করিবার সময় সকলগুলি একবারে উত্তোলন করা উচিত নহে; কারণ তাহা হইলে কাঁচা পাকা সমস্ত শুঁটীই একবারে উত্তোলিত হয়। সকলগুলি একবারে উত্তোলন না করিয়া যে শুঁটীগুলি বেশ পরিপক্ক হইয়াছে তাহাই উত্তোলন করা কর্ত্তব্য। প্রথমবারে উত্তোলন করিবার আট

দিন পরে আবার শুঁটী উত্তোলন করা উচিত। এইরূপে তিন বার উত্তোলন করিলেই সমস্ত শুঁটী উত্তোলিত হইয়া যায়।

শুঁটী হইতে সুপক্ক বীজগুলি বাহির করিয়া যত্নের সহিত রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ভিক্টোরিয়া পদ্ম।

(VICTORIA REGEA.)

হিন্দুদিগের মধ্যে পদ্মপুষ্পের বিশেষ আদর দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশস্থ কবিকুলের নিকটও পদ্মিনীর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। কমলিনী ও তাহার কল্পিত নায়ক পদ্মিনীবল্লভ সূর্য্যদেবকে উপলক্ষ করিয়া কত শত সহস্র সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী কবিতা রচিত হইয়াছে। আমাদের দেবতারাও পদ্মপুষ্পের উপর বড়ই প্রীতিযুক্ত। স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা পদ্মযোনি নামে খ্যাত। সৌভাগ্য-দাত্রী লক্ষ্মীদেবীও পদ্মা নামে বিখ্যাতা। ভগবান বিষ্ণুদেবের নাভিস্থল হইতে পদ্মের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। ত্রেতাযুগে যখন ভগবান ভূভার হরণ মানসে ধরাতলে রামরূপে অবতীর্ণ হন, তখন রাবণ বধের নিমিত্ত আদ্যাশক্তি দেবীকে তুষ্ট করিবার জন্য নীলপদ্ম দিয়া তিনিও দেবীকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের নিকট এ কথা নূতন নহে। ফলতঃ স্থলজ ও জলজ যাবতীয় পুষ্পের মধ্যে পদ্মপুষ্প যে অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়া আছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পদ্মপুষ্প নানাপ্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শ্বেত, রক্ত ও নীল পদ্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। নীলপদ্মের গাছ অত্যন্ত বিরল। কদাচিৎ বহু চেষ্টা

করিয়া কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ ও মিসর দেশই পদ্মের উৎপত্তি স্থান। এই উভয় দেশস্থ জলাশয় সকলে যখন নানাবিধ পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তখন উহাদের কিরূপ নয়নমনোহর শোভা হয় তাহা সচক্ষে না দেখিলে উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না।

সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকার গায়েনা প্রদেশস্থ ভিক্টোরিয়া পদ্মিনী আমাদের দেশের ও মিসর প্রদেশের পদ্মিনীকুলকে পরাজিত করিয়াছে। কিছুকাল অতীত হইল স্নয়েম্বর্ক নামক জনৈক উদ্ভিদ্‌বেত্তা দক্ষিণ আমেরিকা পরিভ্রমণ কালে তত্রস্থ গায়েনা প্রদেশের বর্বিস নদীর মধ্যে প্রথমে শীর্ষোক্ত মনোহর পদ্মপুষ্প দেখিয়া অতিমাত্র চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই অদ্ভুত পুষ্পের গাছের এক একটী পত্র প্রায় ত্রয়োদশ হস্ত পরিধিবিশিষ্ট। এক একটী পুষ্পের পরিধিও আড়াই হস্তের কম নহে! এরূপ পুষ্প নয়নগোচর হইলে কাহার হৃদয় না আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে?

উক্ত পুষ্পের বাহ্য দৃশ্যও যেমন চমৎকার উহার প্রাণ মাতান মন মজান সুগন্ধও সেইরূপ অতুলনীয়। স্নয়েম্বর্ক সাহেব আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাম চিরস্মরণীয় করিবার মানসে এই পুষ্পের নাম রাখিয়াছেন "ভিক্টোরিয়া পদ্ম"। আমরা প্রবন্ধের শিরোদেশে এই সুন্দর পুষ্পের একটী প্রতিরূপ চিত্রিত করিয়া দিলাম। পাঠকবর্গ ইহা হইতেই এই সর্ব্বজন মনোহর পুষ্পের বাহ্য সৌন্দর্য্যের কিছু আভাস পাইবেন।

সম্প্রতি উক্ত পুষ্প ও পুষ্পলতা আমাদের সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আমেরিকা হইতে আনীত হইয়া কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী শিবপুরস্থ বোটানিক্যাল উদ্যানে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। বোধ হয় কিছুকাল পরে আমাদের দেশেও ইহা দুষ্প্রাপ্য হইবে না। এই পুষ্পের বীজ হইতে অতি সহজেই চারা প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

খদির বৃক্ষ।

আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে খদির বেশ সম্মানের আসন গ্রহণ করিয়া আছে। বাঙ্গালা দেশে এমন গৃহস্থ পরিবার নাই যথায় প্রত্যহ খদিরের

ব্যবহার হয় না। আমরা সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ খদির পাণের সহিতই ব্যবহার করিয়া থাকি। কেবল পাণের সহিত ব্যবহার ব্যতীত খদির অন্ত অনেক ব্যবহারে লাগে। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ খদির লৌহ পাত্রে ভিজাইয়া ঐ জলের সহিত সোহাগার খৈ মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার লিখিবার কালি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ঐ কালি দ্বারা অনেক শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রভৃতি লেখা হইয়া থাকে। এ দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে খদির বিলাতে রপ্তানি হইয়া থাকে। ইউরোপবাসীগণ খদির হইতে নানাবিধ রং প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আমাদের রমণীরা খদিরের সহিত নানাবিধ সুগন্ধ মসলা মিশ্রিত করিয়া উহা তরলাবস্থাতে ছাঁচে ঢালিয়া নানাবিধ খেলনা প্রস্তুত করিয়া থাকে। কেতকী বা কেয়া-পুষ্পের পাতার সহিত খদির মিশ্রিত করিয়া রাখিলে সমস্ত খদিরেই কেতকীর সুগন্ধ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এইরূপে সুগন্ধিকৃত খদিরকে আমাদের দেশে "কেয়া খএর" বলিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুসারেও খদির নানাবিধ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খদির শীতল ও পাচক এবং পিত্ত, কফ, কাশ ও বেদনা প্রভৃতি নানাবিধ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তারেরাও উদরাময় প্রভৃতি রোগে খদির ব্যবহার করিয়া থাকেন।

খদির বৃক্ষ দেখিতে ঠিক বাবলাবৃক্ষের ন্যায়। বাবলাবৃক্ষ যেরূপ কণ্টকাকীর্ণ খদির বৃক্ষও সেইরূপ। ভারতবর্ষের নানা স্থানে ও বাঙ্গলাদেশের কোনও কোনও প্রদেশে খদির বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। খদির বৃক্ষের চারা প্রস্তুত করা কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। খদির বৃক্ষের বীজ বাবলার বীজের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। একটী হাপর প্রস্তুত করিয়া উহাতে বীজ রোপণ করিলেই শীঘ্র বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। হাপরস্থিত চারা কিছু বড় হইলেই উহা তুলিয়া অন্যত্র রোপণ করা চলে। খদিরের বৃক্ষ খুব শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৃক্ষের পাইটের মধ্যে উহার গোড়া পরিষ্কার রাখিলেই চলিতে পারে। প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসে গাছের গোড়া খুড়িয়া অল্প পরিমাণে সার দিলেই গাছের তেজ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

খদির বৃক্ষ হইতে খদির প্রস্তুত করিতে হইলে উহার বৃক্ষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কোনও পাত্রে জলদ্বারা সিদ্ধ করিতে হয়। এই সকল কাষ্ঠখণ্ড

কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিতে করিতে উহা হইতে মধুর ন্যায় একপ্রকার গাঢ় পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। উহা তুলিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই খদির প্রস্তুত হইল। এই প্রকারে প্রস্তুত খদিরকে এ দেশে "পাপড়ী খএর" কহিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণদেশে ও ভারত মহাসমুদ্রস্থ কোন কোনও দ্বীপে এক প্রকার গুবাক বা সুপারী জন্মে, উহা হইতেও খদির প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

খদিরের আবাদে বিলক্ষণ লাভ আছে। ইহার আবাদ আমাদের বাঙ্গালা দেশে অত্যন্ত বিরল। যাহাতে ইহার আবাদ ও খদির প্রস্তুতপ্রণালী এ দেশে প্রচলিত হয় সাধারণের সে বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কুঙ্কুম বা জাফরাণ।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাফরাণ জন্মাইয়া থাকে। তন্মধ্যে কাশ্মীর-জাত জাফরাণই সমধিক প্রসিদ্ধ। জাফরাণ তৃণ বিশেষের পুষ্পকেশর ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা অদ্য এই সর্ব্বজন বিদিত ও বহুমূল্য দ্রব্যের আবাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আমাদের পাঠকবর্গের গোচরে আনিতেছি।

হরিদ্রাবর্ণাভ অতি কঠিন ক্ষেত্রেই জাফরাণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে বরাবর জাফরাণ উৎপন্ন হইতেছে সেই সেই ক্ষেত্র ভিন্ন অন্য নূতন ক্ষেত্রে জাফরাণ উৎপন্ন হয় না বলিয়া কাশ্মীরবাসীদিগের বিশ্বাস আছে। উহারা মনে করে যে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কএকটী জাফরাণ ক্ষেত্র ভগবানের একমাত্র অনুগৃহীত ভূখণ্ড। তাহাদের এই সংস্কার যে ভ্রান্তিমূলক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চেষ্টা ও যত্ন করিলে নূতন ক্ষেত্রেও জাফরাণ উৎপন্ন করা যাইতে পারে। তবে এক এক দেশের মৃত্তিকা এক এক প্রকার আবাদের বিশেষ উপযোগী, অন্য কোনও প্রদেশের মৃত্তিকায় সেরূপ ফসল কিছুতেই উৎপন্ন হয় না। বহু চেষ্টা করিয়াও শ্রীহট্টের ন্যায় কমলানেবু কিছুতেই অন্য প্রদেশে উৎপন্ন করা যায় না। পেশওয়ার প্রদেশজাত নানা প্রকার মেওয়ার আবাদও অন্য প্রদেশে হয় না।

জাফরাণ বৃক্ষের বীজ দেখিতে ঠিক লশুন বা রশুনের বীজের ন্যায়।

জাফরাণ বৃক্ষের বীজ প্রতিবৎসর রোপণ করিবার প্রয়োজন হয় না। এক বৎসরের বৃক্ষ হইতে প্রায় পনর বৎসর পর্য্যন্ত পুষ্পকেশর পাওয়া যায়। পনর বৎসর পরে বীজটী অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলে উহার স্থানে আপনা হইতেই একটী নূতন বীজ উৎপন্ন হয়। জাফরাণ ক্ষেত্রে লাঙ্গল মই প্রভৃতি কিছুই দিবার প্রয়োজন হয় না। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়মাসে ক্ষেত্র সকল কেবলমাত্র এক এক বার খুসিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়। জাফরাণ ক্ষেত্রকে তিন চারি হস্ত পরিমিত সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্রে বিভক্ত করিয়া লইতে হয়। এক একটী এই প্রকারে বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের মধ্যে জল নিষ্কাষণের প্রণালী রাখার আবশ্যক হয়।

এক একটী বীজ হইতে চারিটীর অধিক অঙ্কুরোদ্গম হয় না এবং এক একটী অঙ্কুরের অগ্রভাগে এক একটীর অধিক পুষ্পও প্রস্ফুটিত হয় না। মোটের উপর একটী বৃক্ষে চারিটীর বেশী পুষ্প উৎপন্ন হয় না। এই পুষ্প কেশরগুলিই জাফরাণ। কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই জাফরাণ বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয়। এক মাসের বেশী বৃক্ষ হইতে পুষ্প পাওয়া যায় না। এক একটী বৃক্ষে তিন হইতে চারিবার পর্য্যন্ত পুষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন জাফরাণ বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তখন ক্ষেত্রের একরূপ অপূর্ব্ব শোভা হইয়া থাকে। নিজ চক্ষে এই অনির্ব্বচনীয় শোভা সন্দর্শন না করিলে লেখনীদ্বারা উহা প্রকাশ করা যায় না।

পুষ্প উত্তোলন করিয়া কেশর ও পুষ্পদল স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিতে হয়। এই কেশরগুলি শুষ্ক করিয়া লইলেই জাফরাণ প্রস্তুত হইল। পুষ্পের কেশর মধ্যে কতকগুলি লাল ও কতকগুলি হরিদ্রাবর্ণের হইয়া থাকে। লালবর্ণের কেশরই উত্তম এবং উহা বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। ব্যবসায়ীরা হরিদ্রা-বর্ণের কেশরগুলিকেও লোহিতবর্ণে রঞ্জিত করিয়া ক্রেতাদিগকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং জাফরাণ ক্রয় করিবার সময় বিশেষ সাবধান হইয়া ক্রয় করাই কর্ত্তব্য।

খোবানী বা এপ্রিকট্।

বিদেশ হইতে আনীত ফলের মধ্যে খোবানী বা এপ্রিকটের বেশ এ দেশে প্রচলন হইয়াছে। এই খোবানী পিচজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের উপাদেয় ফল বিশেষ। ইহা প্রথমে আর্মেনিয়া ও এসিয়া খণ্ডের অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিত। সম্প্রতি ইহা ভারতবর্ষের কোনও কোনও স্থানে পাওয়া যাইতেছে। যদিও খোবানী আমাদের দেশে অধিক পরিমাণে জন্মায় না কিন্তু রীতিমত নিয়মানুসারে আবাদ করিতে পারিলে এ দেশেও প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে একপ্রকার খোবানী পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ শ্বেত কিন্তু ইহার আস্বাদন প্রভৃতি কিছুতেই নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু এ দেশ অপেক্ষা ইউরোপেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকারের ও সুস্বাদযুক্ত খোবানী পাওয়া যায়। রোমবাসীরাই এই সুস্বাদু ফল প্রথমে ইংলণ্ডে আমদানী করিয়াছিল। এক্ষণে ইংলণ্ডে খোবানীর প্রচুর পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে। যখন উদ্যানস্থ খোবানী বৃক্ষসমূহে শ্বেতবর্ণ খোবানী পুষ্প সকল বিকশিত হয় তখন উদ্যান মনোহর বেশধারণ করিয়া দর্শকের নয়ন মন তৃপ্ত করিতে থাকে। পিচফলের ন্যায় খোবানীর খোসা অত্যন্ত পাতলা ও নরম।

বীজ বপন করিয়া এবং কলম বাঁধিয়া উভয় প্রকারেই খোবানীর গাছ তৈয়ার করিতে পারা যায়। অম্ল রসযুক্ত পঙ্কময় মৃত্তিকাই খোবানী আবাদের উপযুক্ত ক্ষেত্র। খোবানীর বৃক্ষ রোপণ করিবার পূর্ব্বে গোময় প্রভৃতির সার দিয়া জমি প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। কখন কখন অন্যান্য গাছের (যথা কুল) সহিত ইহার কলম বাঁধা হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ করা উচিত নহে। ইহাতে বৃক্ষ সেরূপ তেজস্কর হয় না এবং ফল সেরূপ সুস্বাদু হয় না। বীজ হইতে উৎপন্ন গাছের সহিতই কলম বাঁধা কর্ত্তব্য।

খোবানীর গাছ উৎপন্ন হইবার পর গাছের গোড়ায় যে সকল ক্ষুদ্রশাখা বাহির হইবে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ভূমি হইতে উর্দ্ধে এক হস্তের মধ্যে যেন কোনও শাখা না থাকে। জানুয়ারী মাসে যে সকল শাখা বাহির হইবে তাহার মধ্যে পাঁচ ছয়টী রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত শাখা কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে বৃক্ষ উত্তমরূপ তেজস্কর হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয় বৎসরও উপ-

রোক্ত প্রথানুসারে পাঁচ ছয়টী মাত্র শাখা রাখিয়া সমস্ত শাখা কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। মোট কথা এই, যেসকল শাখা প্রশাখা অযথাভাবে বর্দ্ধিত হইয়া মূলবৃক্ষের ক্ষতি করিবে বলিয়া বোধ হইবে তাহা তৎক্ষণাৎ সমূলে নাশ করা উচিত।

মাঘ ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় পর্য্যন্ত খোবানী বৃক্ষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ ঐ সময়েই বৃক্ষ ফলোৎপাদন করিয়া থাকে। যে সকল শাখায় ফলোৎপাদনের কোনই সম্ভাবনা নাই সেই সকল শাখা একেবারে কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। গাছের ডাল কাটিয়া দিলে এবং গোড়া খুঁসিয়া দিলে বৃক্ষ সতেজ হইয়া উঠে। সুতরাং প্রতি বৎসর বৃক্ষের ডাল কাটিয়া দেওয়া ও গোড়া খুঁসিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

কর্কবৃক্ষ।

আজকাল আমাদের দেশে কর্কের বেশ প্রচলন হইয়াছে। শিশি ও বোতল প্রভৃতির ছিপির জন্যই কর্ক প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্য অন্য অনেক কার্য্যেও কর্ক আবশ্যক হইয়া থাকে। এই কর্ক একপ্রকার বৃক্ষের ছাল ব্যতীত আর কিছুই নহে। কর্কবৃক্ষ অত্যন্ত বৃহদায়তনের হইয়া থাকে, এই প্রকাণ্ড বৃক্ষ ফ্রান্স, স্পেন, পোর্ত্তুগাল, সিসিলি, ইটালী ও আলজিরিয়া প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার মধ্যে স্পেন ও পর্ত্তুগালেই ইহার আবাদ বেশী পরিমাণে হয়।

কর্কবৃক্ষে পুষ্পোদ্গম হইবার প্রায় দেড়বৎসর পরে উহার ফল পরিপক্ক হয়। শূকর, মেষ ও পশু-পক্ষীগণ এই ফল আহার করিয়া থাকে। এই ফল হইতে একপ্রকার রংও প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

শুষ্ক ও বালুকাময় ক্ষেত্রই কর্কবৃক্ষ জন্মিবার উপযুক্ত স্থান। এক একটী কর্কবৃক্ষ ৪০।৫০ ফুট দীর্ঘ ও ১৩।১৪ ফুট পর্য্যন্ত মোটা হইয়া থাকে। বৃক্ষের কাণ্ডের ১০।১২ ফুট উর্দ্ধ হইতে ইহার শাখা নির্গত হয়। ইহার স্থূল গুঁড়িতে যে ছাল জন্মায় উহাই কর্ক। বৃক্ষ হইতে একবার ছাল কাটিয়া লইলে উহাতে পুনরায় নূতন ছাল জন্মায়। যদি কর্কবৃক্ষ হইতে উহার ছাল না কাটিয়া লওয়া

যায় তাহা হইলে কিছুদিন বাদে উহা ফাটিয়া যায়। তখন আর উহা কোনই কার্য্যে আসে না। কর্ক দুইপ্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ ও একপ্রকার শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। ফ্রান্সে শ্বেতবর্ণ ও স্পেনে কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট কর্ক পাওয়া যায়। শুভ্রবর্ণের কর্কই দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর এবং উহারই মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক।

কর্কবৃক্ষ পনর কুড়ি বৎসরের হইলে তবে উহা হইতে কর্ক সংগ্রহ করিতে আরম্ভ হয়। আগষ্ট মাসই কর্কসংগ্রহ করিবার উপযুক্ত সময়। এই সময় কৃষকগণ বৃক্ষের গুঁড়ীর উপরে ও নীচে অস্ত্রদ্বারা এড়োভাবে ছাল কাটিয়া দেয়, ইহার পর লম্বালম্বী ভাবে দুইদিক চিরিয়া দেয় এবং কুড়ালীর বাঁট দ্বারা আঘাত করিতে করিতে বৃক্ষের ছাল আল্‌গা হইয়া খসিয়া পড়ে। এইরূপে ত্বক্ সংগ্রহ করিবার সময় বিশেষ সাবধান হইয়া বৃক্ষে আঘাত করা কর্ত্তব্য। কারণ যে ছাল তুলিয়া লওয়া হয় উহার নিম্ন স্তরে জোরে আঘাত লাগিলে উহা নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং আর নূতন কর্ক জন্মাইতে পারে না।

উক্ত প্রকারে ত্বক্ সংগ্রহ করিয়া উহা একবার অগ্নিতে ঝলসাইয়া লওয়া হয়। কারণ এইরূপ করিলে ত্বকের ছিদ্রগুলি বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং কর্কের ঘনত্ব জন্মে। ইহার পর লম্বা লম্বা টুকরা করিয়া গাঁইট বাঁধিয়া চালান দেওয়া হয়। প্রতি নয় দশ বৎসর অন্তর এক একবার ত্বক্ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে এবং যত অধিকবার ত্বক্ সংগৃহীত হয় ততই উৎকৃষ্টতর কর্ক পাওয়া যায়। কর্কবৃক্ষ হইতে উপরোক্তরূপে ত্বক্ সংগৃহীত না করিলে কর্কবৃক্ষ অধিক দিন বাঁচেনা। নিয়মিতরূপে ত্বক্ সংগ্রহ করিলে এক একটী কর্কবৃক্ষ একশত দেড়শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

গুটীপোকা।

রেশম এবং তন্নির্ম্মিত বস্ত্র সকলেই দেখিয়াছেন এবং রেশম যে গুটীপোকা নামে একপ্রকার কীটের লালা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাও সকলে শুনিয়া থাকিবেন; কিন্তু কিরূপে গুটীপোকার চাষ করিতে হয় এবং কিরূপেই বা গুটীপোকা হইতে রেশম উৎপাদিত হয় তাহা সকলের জানা না থাকিতে

পারে। গুটীপোকা সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ কৃষিতত্ত্বে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন হাবড়াজেলার চাষপ্রণালী অবলম্বনে প্রবন্ধটী লিখিত হইবে।

গুটীপোকা অনেকপ্রকার, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কএক প্রকার আমাদের দেশে প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়। (১) বড়পোকা, (২) বুলু, (৩) মিছরী বা চীনে, (৪) খৃষ্টানী এবং (৫) ছোটপোকা।

(১) বড়পোকা সকল গুটীপোকা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সম্বৎসরে ইহার একবার মাত্র চাষ হয়। বসন্তকাল ইহার চাষের সময়। ইহার ডিম্ব পূর্ণ একবৎসর থাকে। মাঘমাস পড়িলে পূর্ব্ববৎসরের সঞ্চিত ডিম্ব ফুটিতে আরম্ভ হয়। কৃষকগণ ইহার ডিম্ব পবিত্রভাবে রক্ষা করে। এই পোকা প্রায় ২ ইঞ্চ দীর্ঘ হয়। গুটীও তদনুরূপ বড় হয়। এককাহন গুটীতে ১২।১৩ তোলা রেশম হয়; ইহার গুটী সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণের। লালবর্ণের ও কদাচিৎ পাটকিলে বর্ণেরও গুটী দৃষ্ট হয়।

(২) বুলুপোকা—ইহার চাষ সকল সময়েই হইতে পারে। চাষের কোনরূপ ব্যতিক্রম না হইলে ইহাকে দেড় ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। এককাহন গুটীতে ৫।৬ তোলা রেশম হয়; ইহার কেবল শ্বেতবর্ণের গুটী হয়।

(৩) মিছরী বা চীনে—প্রথমে বোধ হয় চীন দেশ হইতে আনীত হইয়াছিল বলিয়া ইহার চীনে (অর্থাৎ চীনদেশীয়) নাম হইয়াছে; ইহা প্রায় দেড় ইঞ্চ দীর্ঘ হয়। বুলুর গুটী অপেক্ষা ইহার গুটী ছোট হইলেও ইহাতে অধিক রেশম জন্মে। এককাহন গুটীতে ৬।৭ তোলা রেশম হয়। ইহার গুটী শ্বেত।

(৪) খৃষ্টানী—ইহার এরূপ ইংরাজী নাম কেন হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। বোধ হয় কুঠিওয়ালা সাহেবরা প্রথমে এই জাতি আমাদের দেশে আনিয়াছিল বলিয়া ইহার "খৃষ্টানী" নাম হইয়াছে। অথবা ইহার শ্বেত ও লাল উভয় বর্ণের গুটী হয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে এরূপও অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা মিছরীপোকারই মত।

(৫) ছোটপোকা—ইহার দুইজাতি দৃষ্ট হয়, দেশীয় ও মুসলমানী। প্রথম প্রকারের গুটী খর্জ্জুরের বীজের মত বক্র এবং দুইমুখ সুক্ষ। মুসলমানী পোকার গুটী এরূপ নহে; ক্ষুদ্রাকারের হংসডিম্বের মত। ছোটপোকা সওয়া

ইঞ্চির অধিক লম্বা হয় না; কিন্তু ইহার রেশম বেশী হয়। এক কাহন গুটী হইতে ৫।৬ তোলা রেশম উৎপাদিত হইতে পারে। ইহার কেবল লাল-বর্ণের গুটী হয়।

গুটীপোকার চাষ বড় তাকতুকের কার্য্য। শীতোষ্ণতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। বর্ত্তমানে স্থানভেদে কোন কোন দেশে শীতোষ্ণতা নির্দ্ধারণার্থ তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। সে যাহাহউক শীতোষ্ণের ন্যূনাধিক্য বশতঃ গুটীপোকার নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে; কিন্তু রোগের নিদান এপর্য্যন্ত কেহ স্থিরিকরণ করিতে পারেন নাই। "টিসা" নামে একপ্রকার পীড়া দৃষ্ট হয়, তাহা বোধ হয় ঠাণ্ডা লাগিলে হয়, কেন না বর্ষাকালে এবং পোকার ঘর আর্দ্র হইলে প্রায়ই এই রোগ হইতে দেখা যায়। এই পীড়ায় পোকার গর্ভে রেশমের লালা জন্মায় না। পোকা স্থূলকায় হয় এবং টিপিলে দুগ্ধবৎ রস নির্গত হয়। এই রোগ সংক্রামক নহে, কারণ অবশিষ্ট যেগুলির এই পীড়া না হয় সেগুলি উত্তম গুটী প্রস্তুত করে।

"মাথাকাল" নামক পোকার আর একপ্রকার পীড়া আছে, এই রোগ বোধ হয় উষ্ণজ ও কিয়ৎপরিমাণে সংক্রামক। এই রোগে পোকা যে পাতা খায় তাহা পরিপাক না পাইয়া মস্তকে থাকে তাহাতেই পোকার মাথা কাল হয়। পোকার গর্ভে রেশম-লালা জন্মিলে যদি অধিক পাতা খাইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে ভুক্তপাতা গলাধঃকরণ করিতে পারে না, মস্তকে থাকে, সুতরাং রেশমের লালা মুখ দিয়া নির্গত হয় না; অবশেষে পোকা মরিয়া যায়।

পোকার আর একপ্রকার রোগ আছে তাহাকে "লালরোগ" বলে। এই রোগ অতীব ভয়ঙ্কর। ইহাতে পোকা লালবর্ণ হয়। ইহা বোধ হয় উষ্ণজ এবং ইহা অতিশয় সংক্রামক। যে ঘরে এই রোগ জন্মে, সেই ঘরে আর ২।৩ মাস পোকা হয় না, ইহাতে সমস্ত পোকা মরিয়া যায়।

বড়মাছিকেও গুটীপোকার অন্য একপ্রকার রোগ বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহা পোকার কোমল শরীরে বসিতে পাইলে বিদ্ধ করিয়া ডিম্ব প্রসব করিয়া আইসে, তাহাতে পোকা মরিয়া যায়। যদিও দুই একটী মক্ষিকাবিদ্ধ পোকা জীবিত থাকে তাহারা ভাল গুটী বাঁধিতে পারে না ও সে গুটীতে ভাল রেশম হয় না।

পোকার শত্রু অনেক—পিপিলিকা, মক্ষিকা, বোলতা, ইন্দুর, টিকটিকি, বিছা, সর্প প্রভৃতিকে নিবারণ করিতে না পারিলে পোকা জন্মে না। এরূপ ভাবে পোকার ঘর নির্ম্মাণ করিতে হয় যাহাতে ঐ সমস্ত শত্রু গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে। পোকার ঘরের নির্ম্মাণপ্রণালী বারান্তরে লিখিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনফরচন্দ্র বাউল,—হেড-মাষ্টার।

মসীনা বা তিসী।

মসীনা বা তিসী আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রচলিত শস্য। ইহা নানাকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর প্রভূত পরিমাণ তিসী এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

মসীনা সর্ব্বত্রই একবর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। তবে পাটনা অঞ্চলের মসীনা এ অঞ্চলের মসীনা অপেক্ষা কিছু বৃহদাকারের হয়। এইজন্য পাটনাই মসীনাকে "মোটা দানা" ও বঙ্গদেশজাত মসীনাকে "সরু দানা" বলিয়া থাকে।

সাধারণতঃ মসীনার বৃক্ষ তিন পোয়া পরিমাণ লম্বা হইয়া থাকে, তবে খুব তেজাল জমীতে জন্মিলে এক একটী বৃক্ষ এক হস্তের উপর দীর্ঘ হয়। আশ্বিন মাসই মসীনা বপন করিবার উপযুক্ত সময়; কিন্তু কখন কখনও কার্ত্তিক-মাসের অর্দ্ধেক পর্য্যন্তও মসীনা বুনানী চলে। মসীনার বীজ মাঘমাসের শেষ সপ্তাহ হইতে ফাল্গুনমাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে পাকিয়া উঠে।

মসীনার বীজ প্রতি বিঘায় পাঁচসের হইতে ছয়সের বপন করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া উহাতে একবার লাঙ্গল ও দুইপালা ভাসা ভাসা মই দেওয়া কর্ত্তব্য।

কুড়িজমি ও বিলের জমি এবং লোনাফোটা ভিন্ন সকলপ্রকার জমিতেই মসীনার আবাদ হইতে পারে। মসীনার বৃক্ষ একটু বড় হইলে একবার জল-

সিঞ্চন করা আবশ্যক। বৃক্ষে যখন ফুল ধরিয়া শস্য জন্মিবার উপক্রম হয় তখন আর একবার জলসিঞ্চন প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত অন্য সময়ে মসীনাবৃক্ষে জল-সিঞ্চনের প্রয়োজন হয় না। স্বভাবদত্ত শিশিরের জলেই মসীনাগাছের পুষ্টি-বর্দ্ধন হইয়া থাকে। যদিও শিশিরে মসীনাবৃক্ষের উপকার হয়, কিন্তু প্রবল ঝটিকাদ্বারা মসীনার ফুল সকল প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায়। ফাল্গুন চৈত্রমাসের প্রবল পশ্চিমা বাতাসে বৃক্ষের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। যে সকল মসীনা বিলম্বে বপন করা হয় কেবল তাহাদিগেরই এইরূপ দুর্দ্দশাভোগ করিতে হয়। এই নিমিত্ত কার্ত্তিকমাসের পনর দিন অতীত হইলে আর মসীনার বুনানী করা কর্ত্তব্য নয়।

মসীনা বেশ সুপক্ক হইলে উহা কাটাই করা আবশ্যক। মসীনাবৃক্ষ কাটাই করিয়া উহা উত্তমরূপে শুকাইয়া তবে মলাই করা কর্ত্তব্য। মসীনা মলাই করিয়া চালুনীদ্বারা চালিয়া লইয়া পুনরায় অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত চালুনী বা রাঙ্গী-দ্বারা চালিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। রাঙ্গীদ্বারা চালিয়া লইলে উত্তম মসীনা পাওয়া যায় এবং উহা অতি উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

মসীনা বুনানীর পর জলাভাব হইলে একপ্রকার কীট লাগিয়া বৃক্ষসকল নষ্ট করিয়া ফেলে। জলসিঞ্চন ভিন্ন ঐ পোকা নিবারণের আর অন্য কোনও উপায় নাই।

নিম্নে মসীনা আবাদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রদত্ত হইল।

খরচ।

ধানকাটা জমিতে চারিবার চাষ দিয়া মসীনা বুনিতে চারিখানি লাঙ্গলের মজুরি	৸৹
বীজ ছয়সের	৷৵৹
কাটাই খরচ	৷৵৹
মলাই খরচ	।৴৹
বুনানি খরচ	৵১৹
খাজনা	৷৹
জোতালে কুলী	৵১৹
	৩৵৹

উৎপন্ন।

মণ	১/	২/	৩/
মূল্য	৩।০	৬॥০	৯৸০
বাদ খরচ	৩৵০	৩৵০	৩৵০
	লাভ ৵০	লাভ ৩।৵০	লাভ ৬॥৵০
পচানজমি হইলে আর চারিখানি লাঙ্গল বেশী লাগে তাহার মূল্য ৸০ ও জোতালে মজুর এক-জন ৵১০ মোট বাদ	৸৵১০	৸৵১০	৸৵১০
ক্ষতি	৸১০	লাভ ২।৶১০	লাভ ৫॥৶১০

উপরোক্ত হিসাব হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে বিঘা প্রতি অন্ততঃ দুই মণ মসীনা উৎপন্ন হইলেও আবাদে লাভ হইতে পারে।

হরিদ্রা।

স্থান নিরূপণ ও জমির অবস্থা। দো-আঁশ বেলে মাটি হরিদ্রা ক্ষেত্রের উপযুক্ত ভূমি। মেটেল অথবা বালী মাটিতে হলুদ ভাল হয় না। অধিক দিনের পতিত জমিতে উত্তম হরিদ্রা জন্মে। অধিক দিনের পতিত জমি পাওয়া না গেলে অন্ততঃ ৪।৫ বৎসরের পতিত জমিতেও হলুদ একপ্রকার মন্দ হয় না। যে জমি বন্যার জলে ডুবাইয়া ফেলে অথবা যাহাতে বৃষ্টির জল বাধিয়া থাকে এইপ্রকার জমিতে কখনই হলুদ হইতে পারে না, কারণ হলুদ গাছের নীচে জল বাধিলে তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব যাহাতে হলুদ গাছের নীচে জল জমিতে না পারে এরূপ উচ্চ ভূমিতে হলুদের চাষ করাই কর্ত্তব্য।

চাষ-প্রণালী। যে জমিতে হলুদের চাষ করিতে হইবে তাহা অন্ততঃ এক ফুট গভীর করিয়া খনন করা কর্ত্তব্য। কার্ত্তিক অথবা অগ্রহায়ণ মাসে ঐ জমি কোদালী দ্বারা প্রথমে একবার কোপাইয়া রাখিতে হয়। তাহার পর

ফাল্গুন অথবা চৈত্র মাসে দো-কোপানী করিয়া তাহার উপর ৩।৪ বার মই দিয়া জমি সমান করিয়া লইতে হইবে। হলুদের জমিতে কিছু ঢেলা থাকার আবশ্যক কারণ ঢেলা থাকিলে জমিতে "ফাঁপ" থাকে সুতরাং হলুদও ভাল জন্মে। লাঙ্গল দ্বারা চাষ করা অপেক্ষা কোদালী দ্বারা কোপাইয়া হরিদ্রার আবাদ করাই সুব্যবস্থা।

রোপণ-পদ্ধতি। (বৃষ্টি হইলে) ১৫ই বৈশাখের পর হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত হরিদ্রা রোপণের উৎকৃষ্ট সময়। ইহার পর হরিদ্রা রোপণ করিলে গাছ নিস্তেজ হয় সুতরাং তাহার নীচে ভাল হরিদ্রা জন্মে না। হলুদের মোথাই প্রধানতঃ বীজরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোথার অভাবে বড় বড় মুথীর দ্বারাও বীজ করা যাইতে পারে। মুথীর দ্বারা বীজ করিতে হইলে তাহার গাত্র-সংলগ্ন ছোট ছোট মুথীগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। মোথার বীজ অপেক্ষা মুথীর বীজে হলুদ কিছু কম জন্মে।

জমি প্রস্তুত হইলে তাহার একপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক এক হাত অন্তর ৫।৬ অঙ্গুলি গভীর সোজাসুজি জুলি কাটিয়া তাহার মধ্যে ১৫।১৬ অঙ্গুলি ব্যবধানে এক একটী হলুদের বীজ ফেলাইয়া দিয়া উহার উপর ৩।৪ অঙ্গুলি মাটি চাপা দিয়া দিতে হয়। কৃষকেরা জুলি কাটা ও হরিদ্রার বীজ রোপণ এক সঙ্গেই করিয়া থাকে। তাহারা প্রথমে একটী জুলি কাটিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে বীজ ফেলিয়া যায় এবং দ্বিতীয় জুলির মাটি প্রথম জুলির বীজের উপর চাপা দিয়া দেয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে এক জুলির মাটি অন্য জুলির বীজের উপর চাপা দিয়া গেলেই বীজ রোপণের কার্য্য সহজেই সম্পাদিত হয়। হলুদের জমিতে দীর্ঘ প্রস্থে এক ফুট নালা কাটিয়া দিয়া তাহা কতকগুলি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে বিভক্ত করিয়া দিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। এরূপ করিলে জমি হইতে সহজেই জল বাহির হইয়া যায় এবং জমিও বেশ শুক্‌না থাকে। হলুদের জমি যতই শুক্‌না থাকে ততই ভাল।

কোন কোন স্থানে দৈর্ঘে প্রস্থে আধ হাত অন্তর ঐরূপে হলুদের বীজ রোপণের পদ্ধতি প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা ভাল ব্যবস্থা নহে। ইহাতে গাছ অত্যন্ত ঘন হয় এবং হলুদও কম জন্মে, বিশেষতঃ হলুদ তুলিবার সময় কোদালের "কোপ্" লাগিয়া অনেক হলুদ কাটিয়া যায়। হলুদগাছের

গোড়ায় দাঁড়া (আইল) বাঁধিয়া দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। দাঁড়া বাঁধিয়া না দিলে গাছের গোড়ায় জল বাঁধিয়া গাছ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বীজ রোপণ করিয়া তাহার উপরকার মাটিগুলি হাত দিয়া সমান করিয়া না দিলেও চলে। ক্ষেত্রে যে ঢেলা থাকিবে তাহা বৃষ্টির জলে গলিয়া গিয়া আপনা আপনিই মাটি সমান হইয়া যায়। চারা বাহির হইলে এক মাস পরে একবার ভাল করিয়া নিড়াইয়া দিতে হয়, নিড়াইয়া দিবার সময় যাহাতে চারা গুলি ভাঙ্গিয়া না যায় এরূপ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। প্রথমবার নিড়াইয়া দিবার ২০।২৫ দিন পর পুনর্ব্বার আর একবার নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। হরিদ্রা ক্ষেত্রে ঘাস জন্মিতে দেওয়া কদাপি উচিত নহে। দো-নিড়ানীর পরেই হলুদের গাছে দাঁড়া বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দাঁড়া বাঁধিয়া দিবার জন্য গাছের মধ্যে মধ্যে যে জুলি কাটিতে হইবে তাহার গভীরতা যেন আধ হাতের অধিক না হয়। গাছ বড় হইলে তাহার নীচে ঘাস জন্মিতে পারে না, ঘাস হইলে তাহা আপনা আপনিই মরিয়া যায়। যদি নিতান্তই অধিক ঘাস জন্মে, তবে তাহা হাত দিয়া ছিঁড়িয়া দিলেই যথেষ্ট হয়। ইহার পর হলুদের আর কোনরূপ যত্ন করিতে হয় না। তবে কি না গোরু বাছুরে যাহাতে গাছ ভাঙ্গিয়া না ফেলে সেই জন্য হরিদ্রা ক্ষেত্রে খুব মজবুত করিয়া বেড়া দেওয়ার আবশ্যক।

হরিদ্রা ক্ষেত্রে সার দেওয়ার তত প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। জমি অধিক দিনের পতিত থাকিলে স্বভাবতঃই তাহার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি নিতান্তই সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে "ওঁচলামাটি," পচাপাতা, পচাখড় সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গোবরের সার দিলে গাছ অত্যন্ত বড় হইয়া যায় সুতরাং তাহার নীচে ভাল হলুদ জন্মে না, অতএব ইহা হলুদের পক্ষে তত হিতকর সার নহে। গোবরের সার দিলে "কড়াপোকা" জন্মিয়া মধ্যে মধ্যে হলুদের চারা কাটিয়া দেয়। হরিদ্রা ক্ষেত্রে কোন প্রকার সার না দেওয়াই ভাল। সার দিলে হলুদ মোটা হয় বটে কিন্তু তাহাতে জলীয় অংশ অধিক হইয়া "মালে" ফলন কম হয়।

হরিদ্রার জাতিভেদ। আমাদের দেশে (বাঙ্গালা দেশে) চারি জাতীয় হলুদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—পাঁকালিয়া, কাজলা, হক্‌মো ও বাঘ-

হাতা। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত দুই জাতীয় হলুদই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কাছাড় অঞ্চলে "কামরাঙ্গা" নামক এক জাতীয় হলুদ পাওয়া যায়, এই হলুদ অত্যন্ত মোটা হয় বটে কিন্তু সিদ্ধ করিলে শুঁট প্রস্তুত হয় না। কাঁচা বেলায় এই হলুদের মধ্যের রঙ্গ ঠিক চীনের সিন্দুরের মত রক্তবর্ণ দেখায়। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছাঁচি, বাঘনলী, বয়ার বাঁট, আদা গেঁটে ও খেজুর ছড়ি ইত্যাদি নামে নানা জাতীয় হলুদ জন্মে।

হরিদ্রা উত্তোলন। মাঘ মাসে কি তাহার পূর্ব্বে হলুদের গাছগুলি শুকাইয়া গেলে তাহা ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত করিতে অথবা পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। তৎপরে প্রত্যেক দাঁড়ার "ফাঁকে ফাঁকে" কোপাইয়া হলুদ তুলিতে হইবে। তুলিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে একবারেই মোথা ও মুখী পৃথক্ করিয়া লওয়া আবশ্যক। মোথাগুলির গায়ে যে মাটি লাগিয়া থাকে তাহা এই সময় উত্তমরূপে ঝাড়িয়া লইতে হয় এবং তাহা বীজের জন্য কোন বৃক্ষের ছায়ায় অথবা কোন শীতল স্থানে গাদা করিয়া পোয়াল চাপা দিয়া রাখিয়া দিতে হয়।

হরিদ্রা সিদ্ধ করিয়া তাহার শুঁট প্রস্তুত করা অপেক্ষাকৃত কিছু কঠিন কার্য্য। কিরূপে হলুদ সিদ্ধ করিতে হয় এবং সেই সিদ্ধ হলুদ কিরূপেই বা শুকাইতে হয় যাঁহারা স্বচক্ষে ইহা না দেখিয়াছেন অথবা নিজে না করিয়াছেন তাঁহারা যেন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন। সিদ্ধ করিবার সময় এদিক্ ওদিক্ হইয়া একটু 'তাক্' খারাপ হইয়া গেলেই সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়। বহুদর্শী কৃষক ব্যতীত সহজে এই কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কঠিন। কোন কৃষি-পুস্তক অথবা কোন প্রবন্ধ (হরিদ্রা সম্বন্ধীয়) পাঠ করিয়া একবার উৎলাইয়া উঠিলেই হলুদ সিদ্ধ হইল, এই জ্ঞান ও বিশ্বাস বলে যাঁহারা এই কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হইবেন তাঁহারা প্রায়ই কৃতকার্য্য হইবেন না। হলুদ কম সিদ্ধ হইলে "দড়্কোচা" মারিয়া যায়—শুঁট হয় না এবং অধিক সিদ্ধ হইলে রং জ্বলিয়া যায় সুতরাং মালের ফলন কম হয়।

সিদ্ধ ও শুষ্ক-প্রণালী। হরিদ্রা সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে নাদা, ঝুড়ী ও "তেকাটা" সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। এই গুলি হলুদ সিদ্ধ করার উপকরণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে স্থানে হলুদ সিদ্ধ করার জন্য আখা

কিম্বা "বাইন" কাটা হইবে (হরিদ্রার পরিমাণ বুঝিয়া আখা কিম্বা "বাইন্" কাটিতে হয়) তাহার অনতি দূরে নাদা পাতিয়া তাহার উপর "তেকাটা" ও ঝুড়ী বসাইয়া রাখিতে হয়। হলুদ সিদ্ধ হইয়া গেলেই তাহা যেন তাড়াতাড়ি করিয়া ঐ ঝুড়ীর মধ্যে ঢালিয়া ফেলা যাইতে পারে। মাঝারী রকমের তোলো হাঁড়ীই হরিদ্রা সিদ্ধ করিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট। প্রথমতঃ হাঁড়ীর চারিভাগের তিন ভাগ হরিদ্রা পূর্ণ করিয়া তাহাতে গোবর মিশ্রিত জল ঢালিয়া দিতে হয়। (গোবর মিশ্রিত না করিয়া কেবল জল দ্বারাও হলুদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে) ঐ জল যেন হরিদ্রাগুলির ৩ অঙ্গুলি নীচেয় থাকে। হলুদের সমান সমান জল দেওয়া কি জল দিয়া হাঁড়ীর মধ্যস্থিত হলুদগুলি ডুবাইয়া দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। এইরূপে হাঁড়ী পূর্ণ করিয়া হলুদ সিদ্ধ করিতে হইবে। জ্বাল দিতে দিতে যে সময় হলুদ উৎলাইয়া উঠিবে সেই সময় একটী কাঠীর দ্বারা হলুদগুলি একটু ঠাসিয়া দিয়া তাহা আখা হইতে নামাইয়া ঝুড়ীর মধ্যে তাড়াতাড়ি ঢালিয়া দিতে হইবে। একবার উৎলাইয়া উঠিলেই যে হলুদ সিদ্ধ হইল এমন কথা নহে। ঐ গরম জলের "ভাব" সমুদায় হলুদের উপর লাগিয়াছে কিনা ইহা দেখিয়া তবে আখা হইতে হলুদ নামাইতে হইবে। যদি বুঝিতে পারা যায় যে গরম জলের "ভাব" উপরকার হলুদে ভাল করিয়া লাগে নাই তাহা হইলে আর একবার উৎলাইলেই হলুদগুলি নামাইতে হয়। দুই বারের অধিক জল উৎলাইতে দেওয়া উচিত নহে। তৎপরে সমস্ত সিদ্ধ হলুদগুলি একস্থানে গাদা দিয়া প্রথমদিন তাহার উপর চেটাই কি ছালা ঢাকা দিয়া রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় দিনে ঐ সমস্ত সিদ্ধ হলুদ কোন ঘাসযুক্ত স্থানে ৩।৪ অঙ্গুলী পুরু করিয়া বিছাইয়া (মেলিয়া) দিতে হয় এবং প্রত্যেক ৪ দিন অন্তর তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিতে হইবে। এই রূপে ৪।৫ বার উল্টাইয়া দিলেই হলুদের রস মরিয়া যাইবে সেই সময় হলুদগুলি ডলিতে হয়। না ডলিলে হলুদের দানা গোল হয় না, চেপ্টা হইয়া থাকে। ৩।৪ বার ডলিলেই হলুদের দানা বেশ গোল হইবে। একদিনেই যে ৩।৪ বার ডলিতে হইবে এমন নহে প্রথম দিন ডলিয়া দিবার ২।৩ দিন পরে পরে এক একবার ডলিয়া দিতে হইবে। ডলিয়া দিবার পরেও যতদিন ভাল করিয়া শুষ্ক না হইবে ততদিন রৌদ্রে দিতে হইবে। ভাল করিয়া শুষ্ক

হইলে ঐ সমস্ত হলুদ কুলাদ্বারা ঝাড়িয়া লইয়া গোলাজাত কি বস্তাবন্দী করিয়া রাখিতে হয়, পরে দর হইলেই বিক্রয় করিলেই চলে।

নানা কথা। (১) ভাল হলুদ হইলে প্রতি বিঘায় ২০/ মণ শুষ্ক হলুদ হইতে পারে। (২) এক জমিতে দুইবারের অধিক হলুদ রোপণ করা উচিত নহে। কারণ হলুদে জমির উর্ব্বরতাশক্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। (৩) হলুদ সিদ্ধ করিবার সময় নাদায় যে গরম জল পড়ে সেই জল দ্বারা পুনরায় হলুদ সিদ্ধ করিলে অতি সহজে ও অল্প সময় মধ্যে হলুদ সিদ্ধ হয়। কৃষকেরা ঐ গরম জল দ্বারাই হলুদ সিদ্ধ করে, বারে বারে কাঁচা জল দেয়না। (৪) হলুদ তুলিয়া সেই ক্ষেত্রে ভালরূপে সার না দিয়া অন্যকোনপ্রকার ফসল ফলান উচিত নহে। (৫) হলুদে পোকা লাগিলে তাহা গোরুর চোনা মাখাইয়া শুকাইলেই পোকা মরিয়া যায়। (৬) মাঘ মাসের মধ্যে হলুদ সিদ্ধ করার কার্য্য শেষ করিতে হয়।

শ্রীহরিপ্রসন্ন মৈত্র।

ম্যারাম ঘাস।

ইহাকে ইংরাজীতে Marram Grass ও বৈজ্ঞানিক মতে Psamma Arenaria বলে। আমাদের দেশীয় ঘাস নয় বলিয়া ইহার কোন বাঙ্গালা নাম নাই। Rye Grass, Lucerne, Clover প্রভৃতির ন্যায় পশুগণ ইহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ অশ্বগণের ইহা এক উপাদেয় খাদ্য। কেহ কেহ এই শুষ্ক ঘাসে জ্বালানি করিয়াও থাকে। একবার ইহার বীজ বপন করিলে পুনরায় পরবৎসর আর বপন করিতে হয় না। যদিও গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের তাপে সমস্ত ঘাসগুলি শুষ্ক হইয়া যায় তত্রাচ বর্ষাকালে পুনরায় উহার গোড়া হইতে সতেজে নূতন ঘাস বাহির হইতে দেখা যায়। নদী কিম্বা সমুদ্র-তটে যে সকল চর (চড়া) ভূমি থাকে তাহা বালুকা পরিপূর্ণ থাকায় কোন আবাদ হয় না সুতরাং পতিতাবস্থাই পরিলক্ষিত হয়। ঐ সকল পতিত জমীকে আবাদী জমীতে পরিণত করিতে হইলে এই ঘাসই একমাত্র প্রধান সহায়। আমাদের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালায় এইপ্রকার কত জমী যে পতিতাবস্থায় রহি-

য়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐরূপ জমীকে আবাদী জমীতে পরিণত করিতে পারিলে যে কিরূপ অর্থাগম হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। এই ঘাসের এরূপ আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, বৎসর কয়েক পরেই বালুকা রূপান্তরিত হইয়া, কাঁকুড়, তরমুজ প্রভৃতির আবাদের উপযোগী করিয়া থাকে। এই ঘাস বপন করিলে প্রথমে ঘাস হইতেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আয় হইবে বটে কিন্তু যখন ঐ জমী শাক-সবজীর আবাদের উপযোগী হইবে তখন এই ঘাসের উপকারিতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। পোর্ট ফেয়ারিতে (Port Fairy) সমুদ্র তীরে (Beach) বালিয়াড়ী (Sand-Hill) কাটিয়া ২৫ ফিট্ প্রশস্ত একটী নূতন রাস্তা প্রস্তুত হয়। ঐ রাস্তার বালির ধস্ ভাঙ্গিবার অনেকের আশঙ্কা থাকায় (Mr. Samuel T. Avery) অ্যাভারি সাহেব এই ঘাস রোপণ করিয়া উক্ত রাস্তার ধস্ (Sand-Drifting) রক্ষা করেন। তিনি বলেন যে কেবল ধস্ রক্ষা হইয়াছিল তাহা নয় সমস্ত বালিয়াড়ীটী শীঘ্রই আবাদীক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলে এই ঘাসের সহিত অন্যান্য অপর ঘাসও বপন করিতে পারা যায়। এই ঘাস যত কাটিয়া লওয়া যায় ততই উত্তমোত্তম নূতন ঘাসের সৃষ্টি হইয়া থাকে, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সরু ও নরম হয়, পূর্ব্বের ন্যায় স্থূল ও কঠিন থাকে না। আমাদের দেশের অনেকে পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার পাড় রক্ষা করিবার জন্য দূর্ব্বার চাপড়া বসাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে এই ঘাস বসাইতে অনুরোধ করি এবং ইহাদ্বারা যে কিরূপ সুফল প্রাপ্ত হইবেন তাহা বর্ণনাতীত।

শ্রীহরিদাস ঘোষ,
পালপাড়া, বেলুড় পোঃ, অঃ, হাওড়া।

পিয়াজ ও রসুন।

পিয়াজ ও রসুন যদিও হিন্দুগণের অব্যবহার্য্য তত্রাচ অধুনা অনেক গৃহস্থঘরে ইহাদের ব্যবহার প্রচলিত আছে। পিয়াজের একটী গুণ আছে যে উহা সকল প্রকার মসলাকে পরাজিত করিয়া খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদনের উৎকর্ষতা সম্পাদন করে। রসুন বা লসুনও পিয়াজের ন্যায় মসলার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রসুনেরও একটী বিশেষ গুণ আছে যে মাংস যেমন কঠিন ও পাকা হউক না কেন রসুন সহযোগে উত্তমরূপে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। আজকাল বঙ্গদেশে হিন্দুপরিবারবর্গের মধ্যে অনেকেই অধিক পরিমাণে পিয়াজ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু রসুনের ব্যবহার ততটা দেখা যায় না। রসুন মুসলমানেরাই অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন, পশ্চিম প্রদেশে ক্ষত্রীয় প্রভৃতি অনেক হিন্দুজাতিদের মধ্যে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। উড়িষ্যার লোকেরা পিয়াজ-রসুনকে পবিত্র জ্ঞান করে এবং প্রত্যহ অন্যান্য মসলার ন্যায় ইহাদেরও ব্যবহার করিয়া থাকে। পিয়াজ ও রসুন অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে মুখে, গাত্রে, ঘর্ম্মে, এমন কি মল মূত্রাদিতে পর্য্যন্ত অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। বোধ হয় এই দুর্গন্ধবশতঃই হিন্দুদিগের মধ্যে উহার ব্যবহার প্রচলিত নাই। হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে এরূপ কুসংস্কারাপন্ন আছেন যে তাঁহারা উহাদের রোপণ করিতে অনিচ্ছুক, অধিক কি স্পর্শ করিতে অধর্ম্মাচরণ জ্ঞান করেন। ফলতঃ ধর্ম্মের সহিত চাষ আবাদের কোন সংশ্রব নাই, সুতরাং এরূপ কুসংস্কারকে যে নিতান্ত উন্মত্ততার লক্ষণ এবং জাতীয় অবনতির প্রধান কারণ বলিতে হইবে তাহাতে সংশয় নাই।

পিয়াজ ও রসুন প্রায় একপ্রকার পদার্থ, ইহারা সকল ভূমিতেই জন্মায়। তবে দো-আঁস মাটিতেই বেশ জন্মিয়া থাকে। মৃত্তিকা কঠিন হইলে কোষ বা কোয়াগুলি ভাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং কম জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশে প্রতিবিঘায় প্রায় ৩০ মণ পিয়াজ ও রসুন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের আবাদের কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র নাই বলিয়া পৃথক্ পৃথকরূপে বর্ণনা করিলাম না।

কার্ত্তিকমাসে ৮ শ্যামাপূজার পর যখন বৃষ্টিপতনের আশঙ্কা একেবারে তিরোহিত হইবে সেই সময়ই ইহার আবাদের প্রশস্ত সময়। এই সময়ে ক্ষেত্রটী উত্তমরূপে চাষ দিয়া মই টানিয়া জমি সমতল করিয়া লইবে। এক্ষণে পূর্ব্ববৎসরের রক্ষিত কোষ বা কোয়াগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ৬ ইঞ্চ ব্যবধানে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রোপণ করিতে হইবে। ঐ বীজ সকল এরূপভাবে জমিতে বসাইতে হইবে যেন তাহা মাটির নীচে চাপা না পড়ে অর্থাৎ সমতল ভূমির ঠিক নিম্নে থাকে। কেন না বেশী মৃত্তিকা চাপা পড়িলে অঙ্কুরগুলি মৃত্তিকা ঠেলিয়া বাহির হইতে পারে না। আবার মুখগুলি বাহির হইয়া থাকিলেও রৌদ্রের

উত্তাপে শুষ্ক হইয়া যায়। ফলতঃ এই উভয়াবস্থার মধ্যবর্ত্তী করিয়া রোপণ করাই বিধেয়।

বীজগুলি অঙ্কুরিত হইলে পর ক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া দিতে হয়। পৌষমাসে ঐ সকল বৃক্ষ হইতে শিষ উঠিয়া ফুল হয়। ঐ শিষ-গুলিকে কালি কহে। পিয়াজের শিষগুলিকে পিয়াজকালি বলে এবং উহা অন্যান্য শাকসবজীর ন্যায় আহারার্থে ব্যবহার হয় বলিয়া কৃষকেরা ঐ সকল পিয়াজকালি উৎপাটনপূর্ব্বক বাজারে বিক্রয় করে। কালি বিক্রয়েও বেশ লাভ আছে।

মাঘ ফাল্গুনমাসে যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ঐ সকল বৃক্ষের পত্রগুলি শুষ্ক হইয়া আসিতেছে তখন বুঝিতে হইবে যে উহারা উত্তোলন করিবার উপ-যোগী হইয়াছে। এই সময় উহাদিগকে মাটি হইতে উঠাইয়া লইয়া শিকড়-গুলি কাটিয়া রৌদ্রে ডাঁটাসমেত শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে ডাঁটাগুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। এক্ষণে উহাদিগকে আর মৃত্তিকার উপর রাখা উচিৎ নহে, কেন না মাটির রস টানিয়া পচিয়া যাইবার সম্ভব। সুতরাং যাহাতে উহারা বেশ শুষ্ক অবস্থায় থাকে তাহা করা কর্ত্তব্য। মৃত্তি-কার উপর রাখিতে হইলে ঐ স্থানটী অর্দ্ধহস্ত পরিমিত বালুকাদ্বারা উত্তমরূপে আবৃত করিয়া তাহার উপর রাখিতে হয়।

আমাদের দেশের কৃষকেরা পিয়াজকেই বীজরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য দেশের কৃষকেরা পিয়াজের বীজই ব্যবহার করিয়া থাকে। স্পেনদেশের পিয়াজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত অর্থাৎ অত্যন্ত বৃহৎ আকারের হইয়া থাকে। ইটালিদেশে একপ্রকার এমন সুমিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত পিয়াজ জন্মিয়া থাকে যে তাহা আপেল ফলের ন্যায় কাঁচাই খাওয়া যায়।

অধুনা সভ্যজগতে কৃষিকার্য্যে আমেরিকার অধিবাসীগণ প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। ফিলাডেলফিয়াতে বিখ্যাত W. Atlee Burpee & Co. নামক কৃষক সম্প্রদায় স্পেন দেশ হইতে উল্লিখিত বৃহৎ Spanish King নামক পিয়াজের বীজ আনাইয়া আবাদ করেন। তাঁহারা তথাকার প্রদর্শনীতে ঐ পিয়াজ দেখাইয়া প্রথম পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। যে সকল পিয়াজ প্রদর্শনীতে

পাঠাইয়াছিলেন তাহার পরিধি ১২ ইঞ্চ হইতে ১৬ ইঞ্চ দেখা গিয়াছিল এবং প্রত্যেকটী ওজনে ৪ পাউণ্ড হইতে ৬ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইটালীদেশীয় যে সুমিষ্ট পিয়াজের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার নাম Mammoth Silver King Onion এবং ইহাও উক্ত কোম্পানী প্রদর্শনীতে দর্শাইয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হন এবং ইহাও ওজনে ৪ পাউণ্ড ৪ আউন্স হইতে ৪৲ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

আমাদের দেশে কেবল দুইপ্রকারের পিয়াজ দেখিতে পাওয়া যায়, এক প্রকার ছোট লাল বর্ণের ও অন্যপ্রকার বড় সাদাবর্ণের—বড় বলিয়া ২।৩ আউন্সের বেশী হয় না। স্পেন ও ইটালী দেশীয় পিয়াজ সকল নানা বর্ণের ও নানা প্রকারের হইয়া থাকে এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, বাহুল্য বোধে সকল নাম প্রকাশ করা হইল না। ফলতঃ যাঁহারা ঐ সকল পিয়াজ রোপণ করিতে অভিলাষ করেন তাঁহারা ইম্পিরিয়াল নর্শরীতে আবেদন করিলে সমস্তই অবগত হইবেন।

শ্রীহরিদাস ঘোষ।
পালপাড়া, বেলুড় পোঃ অঃ, হাওড়া।

গো-প্রতিপালন।

কৃষিকার্য্যের প্রধান সাধন হলপ্রবাহ। আমাদের দেশে গবাদি পশুর দ্বারাই প্রধানতঃ হল প্রচালন হইয়া থাকে। সুতরাং গবাদি পশুই অস্মদ্দেশীয় কৃষকগণের জীবনসর্ব্বস্বধন এবং এই গবাদি পশুগণ আমাদের জীবন ও অন্নদাতা বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। এই নিমিত্তই আমাদের দেশের পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষগণ গোজাতিকে দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাদের অপ্রতিপালনে ও অযত্নে নরকের ভয় পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

যাহাই হউক গোজাতি যে আমাদের দেশের কৃষিকার্য্যের প্রধান অবলম্বন তাহা আর কাহারও অস্বীকার করিবার কারণ নাই। এই নিমিত্ত যাহাতে গোজাতির প্রতি আমাদের, বিশেষতঃ আমাদের দেশের কৃষককুলের বিশেষ

দৃষ্টি থাকে তাহা সকলেরই করা কর্ত্তব্য। অতএব অতি যত্নের সহিত গোজাতির রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য এবং গোবংশের উন্নতির প্রতি সকলেরই লক্ষ্য রাখা সর্ব্বতোভাবে উচিত। গোজাতীর ন্যায় মনুষ্যের মহদুপকারী পশু এ জগতে আর নাই।

এরূপ উপকারী পশু যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দে থাকে প্রত্যেক কৃষকেরই তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক। গোরুকে দুই বেলা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। পোয়াল বিচালী প্রভৃতির সহিত খইল কুঁড়া ও জল সংযোগে "জাব" প্রস্তুত করিয়া দুই বেলা উদর পূর্ণ করিয়া গোগণকে আহার করান কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতীত কাঁচা ঘাস এবং মাষকলাই প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়াও খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে। ভাতের মাড় এবং চেলুনীজল গোরুর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

আমাদের দেশের কৃষকেরা বলিয়া থাকে যে গোরুদিগকে রাত্রে কিছু আহার দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। দিবসে অধিক পরিমাণ আহার দিলে যে ফল হয় রাত্রে অল্প পরিমাণ আহার দ্বারাই সেই ফল পাওয়া যায়। মোট কথা গোরুদিগকে দিবসে যতই কেন আহার দেওয়া হউক না রাত্রে কিছু না কিছু আহার দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। রাত্রে উপবাস করিলে গবাদি পশুগণ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

গবাদি পশুদিগকে প্রচুর পরিমাণে আহার দেওয়া যেমন উচিত উহাদের বিশ্রামস্থানের সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াও সেইরূপ কর্ত্তব্য। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া গোরুগণ যদি রাত্রে ভালরূপ বিশ্রাম না করিতে পায় তাহা হইলে তাহাদের কষ্টের এক শেষ হয়। যাহাতে এক ঘরে বেশী গোরু না থাকে এবং গোয়ালঘর বেশ প্রশস্ত হয় ও তাহাতে প্রচুরপরিমাণে বায়ু সঞ্চালন হইবার উপায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক গোপালকেরই কর্ত্তব্য।

গোয়ালঘরগুলি প্রত্যহ নিয়মপূর্ব্বক পরিষ্কার করা উচিত। শীতকালে শীতনিবারণের নিমিত্ত গোরুগণকে গাত্রবস্ত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য। শীতের সময় গোয়ালঘরের এক কোণে একটী অগ্নিকুণ্ড করিয়া রাখা ভাল। অগ্নিকুণ্ডের আর একটী বিশেষ গুণ এই যে গোয়ালঘরে অগ্নিকুণ্ড থাকিলে অগ্নির তেজে ও কুণ্ডের ধূঁয়া দ্বারা গোরুর গাত্রে "এটুলি" পোকা ও "কুকুর মাছি" প্রভৃতি

লাগিতে পারে না। শীতকালে গোরুর শৃঙ্গে তৈল মাখাইয়া দিলে গোরুগণের শীত তত বেশী লাগে না। বারমাস গোরুর শৃঙ্গে সরিষার তৈল দিলে উহাদের শরীর বড়ই সুস্থ থাকে। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে গোরুর মধ্যে মধ্যে গাত্র ধৌত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। উহাদের গাত্রে "এটুলি" লাগিলে প্রত্যহ উহা বাছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

এদেশে গোরুগণের রোগ হইলে তাহাদিগকে পৃথক্ স্থানে রাখিবার কোনও সুবন্দোবস্ত নাই। পীড়িত গোরুগণকে অন্যান্য সুস্থ গোরুর সঙ্গে একত্রেই রাখা হইয়া থাকে। ইহার ফল যে বিষময় হইয়া থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একএকটী রোগে পালের সমস্ত গোরুই রোগাক্রান্ত হইয়া মরিয়া যায়। এক এক সময় এক একটী রোগে এক এক গ্রামের সমস্ত গোরু একেবারে নিঃশেষ হইতেও দেখা যায়।

পীড়িত গোরুগণকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। এতদুদ্দেশে প্রত্যেক গ্রামের বহির্ভাগে এক একটী পীড়িত পশুচিকিৎসাশালা স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ঐ চিকিৎসাশালায় গ্রামের যাবতীয় পীড়িত গোরুগণকে রাখিয়া তাহাদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। গোরুগণ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ না হইলে উহাদিগকে গ্রামে লইয়া যাইয়া সুস্থ গোরুগণের সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত নহে। যদি কোনও পশুর মৃত্যু হয় তাহা হইলে উহাকে ভূগর্ভে নিহিত করাই উচিত। নতুবা যথা তথা গোরুর মৃতদেহ নিক্ষেপ করিলে উহাতে রোগ সকল ছড়াইয়া পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এদেশে বলিবর্দ্দের বয়ঃক্রম তিনবৎসরমাত্র হইলেই উহাদিগকে লাঙ্গলে যুড়িয়া দেওয়া হয়। এপ্রথা কিন্তু ভাল নহে। চতুর্থ বৎসরে গোরুকে লাঙ্গল বহাইতে শিক্ষা দিয়া পঞ্চম বৎসরে উহাকে পূর্ণ পরিশ্রম করান যাইতে পারে।

মহিষকুল গোশ্রেণীর অন্তর্গত। আজকাল আমরা গোরুর ন্যায় মহিষ হইতেও কৃষিকার্য্য ও অন্যান্য বিষয়ে সমভাবে উপকার পাইতেছি। অতএব গোরুর ন্যায় মহিষের রক্ষণাবেক্ষণ করাও আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বিলাতী কুলের চাষ।

আজকাল এদেশে বিলাতী কুলের বেশ প্রচলন হইয়াছে এবং এদেশে ঐ বিলাতী কুলও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে; কিন্তু সাধারণে ইহার আবাদ প্রণালী অবগত নহেন। আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিলাতের কুলের আবাদ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বেশ ফাঁকা ময়দান বা অপেক্ষাকৃত উচ্চ ক্ষেত্র হইলেই বিলাতী কুলের আবাদপক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। বাস্তুগৃহের প্রাঙ্গণে বা বৃক্ষবাটিকাতেও বিলাতী কুলের বৃক্ষ উৎপন্ন করা যাইতে পারে। তবে এই সকল স্থান প্রায়ই অন্যান্য বৃক্ষে পূর্ণ থাকায় কুলগাছে আওতা লাগে। আওতাতে কুলগাছে মোটেই ফলপ্রসব করে না। অধিকন্তু লোনা এবং কড়ে এটেলমাটিতে কুলের গাছ তত ভালরূপ তেজের সহিত বাড়িতে পারে না। দুধে এটেল এবং দো-আঁশ মাটিই বিলাতী কুলের আবাদ পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত।

চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসেই কুলের আবাদের উপযুক্ত সময়। এই সময়েই কুলের গাছ রোপণ করা কর্ত্তব্য। বীজ রোপণ করিলে বিলাতী কুলের গাছ উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু উহাতে উৎপন্ন কুলগুলি প্রায়ই দেশীকুলের ন্যায় হইয়া যায়; সুতরাং উত্তমরূপ বিলাতী কুল উৎপন্ন করিতে হইলে বিলাতী কুলের কলম হইতেই বৃক্ষ উৎপন্ন করা কর্ত্তব্য। দেশীকুলের গাছ প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত বিলাতী কুলের জোড় কলম বান্ধিতে পারিলে উত্তম হয়। এইরূপ কলমের গাছে বেশ বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট কুল উৎপন্ন হইয়া থাকে। বীজ হইতে কুলের গাছ উৎপন্ন করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রকারে উহার আবাদ করিতে হইবে।

যে ক্ষেত্রে কুলের আবাদ করিতে হইবে, সেই ক্ষেত্রে পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন এই তিনমাস মধ্যে মধ্যে লাঙ্গল দিয়া চাষ করিতে হইবে। পরে চৈত্রমাসে আর একবার ঐ ক্ষেত্রে লাঙ্গল ও মই দিয়া জমী সমান করিয়া দিতে হইবে। উপরোক্ত প্রকারে জমী ঠিক হইলে উহাতে বার হস্ত হইতে ষোল হস্ত পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এক একটী মাদা প্রস্তুত করিতে হইবে। এবং ঐরূপে প্রস্তুত মাদায় দুই এক অঙ্গুলি ব্যবধানে একত্রে চারি পাঁচটী

করিয়া কুলের বীজ বপন করিতে হইবে। একত্রে চারি পাঁচটী বীজ বপন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, বীজোৎপন্ন সকল কুলের চারাগুলি সমান তেজস্কর হয় না। যে গাছগুলি ভালরূপ তেজস্কর না হইবে তাহাদিগকে মাদা হইতে উঠাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। যদি সকল গাছগুলিই সমভাবে তেজস্কর হইয়া উঠে তাহা হইলে প্রতি মাদায় দুই চারিটী মাত্র গাছ রাখিয়া অবশিষ্ট গাছ উঠাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

মাদাস্থ বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইলে বিশেষ সতর্ক হইয়া থাকিতে হইবে। যাহাতে কুলের ক্ষেত্রে কোনও জন্তু প্রবেশ করিয়া কুলের গাছের কোনও প্রকার ক্ষতি না করে। চারাগুলি যখন এক বা দেড়ফুট লম্বা হইবে, সেই সময় একবার লাঙ্গল দিয়া অতি সাবধানে ক্ষেত্রের জমী পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। পরে যখন চারাগুলির আন্দাজ দেড়বৎসর বয়ক্রম হইবে, তখন (চৈত্রমাস হইলেই ভাল হয়) গাছগুলির নিম্নদেশে দুই হস্ত পরিমাণ গুঁড়ি রাখিয়া উহাদের মস্তকগুলি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপে মস্তক কাটিবার সময় বিশেষ সাবধান হইয়া কাটা আবশ্যক, যেন উহাতে গাছের ছাল না উঠিয়া যায়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইরূপে মস্তক কাটিবার চারি পাঁচদিন পরে গাছের গোড়ার মাটি দুই হস্ত পরিমাণ খুঁড়িয়া সমান করিয়া দিতে হইবে। এই সময় দেখা কর্ত্তব্য যে কুলের গাছগুলির কিপ্রকার তেজ ও বল আছে। যদি এই সময় কোনও গাছকে বিশেষ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে মাটি খুঁড়িবার সময় প্রতি মাদায় /২॥০ আড়াই সের হিসাবে সরিষা, মসীনা বা রেড়ির খইল গুঁড়া-মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া গাছের গোড়ায় দিয়া পরে মাটি চাপা দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহার পর ১০।১৫ দিন বাদে দেখা কর্ত্তব্য যে ঐ সমস্ত গাছ হইতে নূতন শাখা বহির হইয়াছে কি না। যদি গাছে নূতন শাখা বাহির হয় তাহা হইলে প্রতি গাছে এক-একটী তেজী শাখা রাখিয়া অবশিষ্ট শাখাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ইহার পর এই নূতন শাখা অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ বড় হইলে এই গাছের সমবয়স্ক এবং দেখিতে ঠিক একপ্রকার একটী বিলাতী কুলের ডাল আনিয়া চোং বা চোক্-কলম করিয়া দিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত না নূতন ডালটী পুরাতন বৃক্ষের সহিত এক হইয়া যায় ততদিন বিশেষ সাবধানতার সহিত বৃক্ষটীকে রক্ষা

করিতে হইবে। প্রায় তিনমাসকাল এইরূপ সতর্ক থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনমাসের পর আর কোনও আশঙ্কা নাই। ক্রমে ক্রমে শাখা ফল ফুল ধরিতে আরম্ভ করিলে একবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

টক-পালমের আবাদ।

টক-পালম এদেশে খুব প্রচলিত শাক। টক-পালমশাকের আবাদপ্রণালী কঠিন নহে। অতি সহজেই এই শাকের আবাদ করিয়া ইহা উপভোগ করা যাইতে পারে।

টক-পালমশাকের পক্ষে দো-আঁশ মাটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষেত্র ঠিক করিয়া লাঙ্গল বা কোদালদ্বারা ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে। ক্ষেত্রে চাষ দিয়া ক্ষেত্রের ঘাস ও জঙ্গল মারিয়া ক্ষেত্রের মাটি সমান করা কর্ত্তব্য। ক্ষেত্রে চাষ দেওয়া শেষ হইলেই উহাতে বীজ বপন করা উচিত।

শুষ্ক বীজ ক্ষেত্রে বপন করা কর্ত্তব্য নহে। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে বীজগুলিকে দুই চারিদিন জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। কেবলমাত্র জলে না ভিজাইয়া, জলে একটু টাট্‌কা গোময় গুলিয়া ঐ গোময়যুক্ত জলে বীজ ভিজাইয়া রাখিলে অধিকতর ফল পাওয়া যায়। কারণ স্বাভাবিক জলে বীজ ভিজাইয়া রাখিলে ঐ বীজোৎপন্ন শাকের গাছ সকল ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে; কিন্তু গোময়যুক্ত জলে বীজ ভিজাইলে আর কোনও প্রকারই দোষ হয় না। পক্ষান্তরে ইহাতে বীজোৎপন্ন পালমশাকের গাছ সকল বেশ সুপুষ্ট ও তেজস্কর হইয়া উঠে।

উপরোক্ত প্রকারে বীজ সকল তিন চারিদিন বেশ করিয়া ভিজাইয়া রাখিয়া উহা জল হইতে তুলিয়া কোনও শুষ্কপাত্রে রাখিয়া তিন চারি ঘণ্টা বাতাস লাগাইতে হইবে। এইরূপে বাতাস লাগাইলে বীজের গাত্র হইতে জল শুকাইয়া যাইয়া বীজগুলি বেশ শুষ্ক হইয়া উঠিবে। যে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হইবে, সেই ক্ষেত্রে দেড়হস্ত অন্তর এক একটী দড়ি লম্বা-ভাবে ফেলিতে হইবে এবং ঐ দড়ীর গায়ে গায়ে একহস্ত অন্তর নিড়ানদ্বারা এক একটী খুবি কাটিয়া প্রত্যেক খুবিতে চারি পাঁচটী করিয়া বীজ রোপণ

করা কর্ত্তব্য। এইরূপে খুবিতে বীজ ফেলিয়া বীজের উপর শুষ্ক ঝুরা মাটি চাপা দেওয়া আবশ্যক। উক্ত খুবিতে একটু একটু গোময়যুক্ত জল দিয়া মাটি চাপা দিলেই ভাল হয়। তৎপরে যখন দুই তিনদিন পরে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে, তখন প্রত্যহই অপরাহ্ণে একটু একটু জলসিঞ্চন করা আবশ্যক। পরে যখন গাছগুলিতে চারি পাঁচটী করিয়া পাতা বাহির হইবে তখন প্রত্যেক গাছের গোড়ার মাটি নিড়ানদ্বারা খুসিয়া মাটিকে গুঁড়া করিতে হইবে। চারি পাঁচটী বীজ একত্রে বপন করিবার একটু কারণ আছে। টক-পালমের গাছ অত্যন্ত বাতাসের তেজে একবারে শুইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। কিন্তু ৪।৫টী গাছ একত্রে থাকিলে আর বাতাসে গাছগুলি কাইত হইয়া পড়িতে পারে না। বীজ বপনের দিন হইতে পনর ষোলদিন গত হইলেই টক-পালমের শাকগুলি ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। টক-পালমের অম্ল কিংবা চাটনী অত্যন্ত মুখপ্রিয়।

টক-পালমের ক্ষেত্রে সহজেই কুলিবেগুণের আবাদ হইতে পারে। শ্রেণী-বদ্ধভাবে টকপালমের বীজ বপন করিলে মধ্যভাগে যে জমী থাকিবে উহাতে কোদালদ্বারা কার্য্য করিতে কোনই ব্যাঘাত ঘটে না এবং ঐ মধ্যস্থলের জমীতে উত্তমরূপ কুলিবেগুণের চাষ হইতে পারে।

পালা শশার আবাদ।

পালা শশার প্রচলন আমাদের দেশে খুব অধিক। ইহার পরিচয় পাঠক-বর্গকে দিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ফাঁকা অর্থাৎ আওতাশূন্য ক্ষেত্রেই শশার আবাদ করা কর্ত্তব্য। শশার ক্ষেত্র স্থির করিয়া উহাতে দেড় হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত দীর্ঘ এক একটী মাদা প্রস্তত করিতে হইবে। ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ মাটি তুলিয়া লইয়া তৎস্থলে পচা গোময় সার দিয়া মাদার মাটির সহিত সারগুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে। যখন সার ও মাটি উভয়ে উত্তমরূপ মিশ্রিত হইবে তখন উহাতে কলসী দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে জলসিঞ্চন করা কর্ত্তব্য। এইরূপে জলসিঞ্চন করিবার তিন চারি দিন পরে মাদা খুসিয়া দিয়া মাটি ঝরঝরে করিয়া দিতে হইবে।

এইরূপে মাদার মাটি প্রস্তুত হইলে উহাতে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর এক একটী শশার বীজ রোপণ করিতে হইবে। বীজ বপন করিবার সময় বিশেষ বিবেচনা করিয়া বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। কারণ বীজ বপনের গুণ বা দোষে শশার আকার ভাল ও মন্দ উভয়ই হইতে পারে। যদি শশার বীজ শোয়াইয়া বপন করা হয়, তাহা হইলে ফলগুলি মধ্যম আকার ও আগাগোড়া সমান হয়, যদি বীজগুলি খাড়াভাবে রোপণ করা হয়, তাহা হইলে ফলগুলি কিছু লম্বা আকৃতির হইয়া থাকে এবং পরিমাণেও অধিক জন্মায়। কিন্তু বীজগুলি যদি উল্টাভাবে রোপণ করা হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন ফলগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি হয় এবং পরিমাণেও অল্প হইয়া থাকে।

উপরোক্তরূপে বীজ বপন করিবার অল্পদিন পরেই বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া চারা বাহির হয়। চারা বাহির হইবার পর প্রায় একপক্ষকাল বিশেষ সাবধান হইয়া থাকা কর্ত্তব্য। কারণ এই সময়ে শশার চরায় লোহিত বর্ণের এক প্রকার পোকা লাগিয়া উহার বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। যদি কোনও কারণে ঐ পোকা তাড়ান একবারে অসম্ভব হয়, তাহা হইলে প্রত্যহ হুঁকার জল ও ঘুঁটের ছাইয়ের গুঁড়া চারার গাত্রে ছড়াইয়া দিলে উক্ত পোকা সকল সহজেই পলাইয়া যায়।

ইহার পর যখন চারা হইতে চারি পাঁচটী করিয়া পাতা বাহির হইবে তখন কোনও স্থানের তেজাল দো-আঁশ মাটি লইয়া চূর্ণ করিয়া শশার গাছের গোড়ায় এক বা দেড় ইঞ্চ পরিমাণে প্রদান করিতে হইবে। এই সময় যদি বৃষ্টিপাত না হয় তাহা হইলে কলসীদ্বারা কেবলমাত্র গাছের গোড়ায় জল-সিঞ্চন করা কর্ত্তব্য। বিশেষ সাবধান হইয়া কেবলমাত্র গাছের গোড়াতেই জল দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি গাছের ডালে এবং পাতায় জল লাগে তাহা হইলে গাছের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। গাছের ডালে এবং পাতায় কাঁটার ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জন্মে, জলের দ্বারা উহা নষ্ট হইয়া গেলে গাছগুলি মরিয়া যায়। অধিকন্তু বৃষ্টির জলাপেক্ষা তোলা জলে লবণের ভাগ অধিক পরিমাণে থাকায় তাহাতেও গাছের অনিষ্ট হইয়া থাকে।

ইহার পর শশার গাছ যখন একফুট আন্দাজ বড় হইবে তখন পূর্ব্বের ন্যায় আর একবার চূর্ণ দো-আঁশ মাটি গাছের গোড়ায় প্রদান করা কর্ত্তব্য।

পার্শ্বস্থ ভূমি হইতে দুই তিন অঙ্গুলি উচ্চ করিয়া মাটি দিলেই চলিতে পারে। মোট কথা এরূপভাবে মাটি উচ্চ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যেন গাছের গোড়ায় কোনওরূপ জল বসিতে না পারে। কারণ শশাগাছের গোড়ায় জল বসিলে গাছ হঠাৎ মরিয়া যায়।

ইহার পর শশাগাছের পত্রগ্রন্থি হইতে সরু সরু সূতার ন্যায় আঁকড়া বাহির হইতে আরম্ভ হইলে গাছের মূলদেশে একটী কাঠি পুতিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পরে উক্ত আঁকড়াগুলি যেমন বড় হইতে থাকে তেমনই কঞ্চি প্রভৃতি দিয়া মাচা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া উচিত। আঁকড়াগুলি কঞ্চি প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া অতি শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শশার গাছ যখন মাচার উপরে উঠে এবং উহার গোড়া হইতে পাতাগুলি শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে তখন গাছের গোড়া বিচালিদ্বারা মাটি হইতে আন্দাজ তিন ফুট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত জড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

শশাগাছের গোড়া হইতে ত্রিশ ও পঁয়ত্রিশটী পাতা বাহির হইলেই উহাতে ফুল ও ফল ধরিতে আরম্ভ করে। যে বৎসর বেশী পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় সে বৎসর শশার গাছে তত বেশী পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয় না, কিন্তু যে বৎসর বর্ষার ভাগ অল্প হয় সে বৎসর বৃক্ষে বেশী পরিমাণ ফলোৎপন্ন হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত শিশির পতিত না হয় সে পর্য্যন্ত শশার গাছে রীতিমত ফল উৎপন্ন হইতে থাকে। শিশির পড়িতে আরম্ভ করিলেই শিশিরের তেজে শশার গাছগুলি মরিয়া যায়।

ক্ষেত্রবিশেষে এবং বিশেষ যত্নপূর্ব্বক শশার আবাদ করিতে পারিলে প্রচুর পরিমাণে ফলোৎপাদনে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। উপরোক্ত প্রণালী মত শশার আবাদ করিলে নিশ্চয় অধিক পরিমাণে ফলোৎপন্ন হইতে পারে। যাঁহারা শশার আবাদ করিয়া ব্যবসায় করিতে চাহেন, তাঁহারাও ইহার আবাদ করিয়া বিশেষ লাভবান হইতে পারেন। পক্ষান্তরে গৃহস্থ ব্যক্তিরা নিজ গৃহপ্রাঙ্গণে দুই একটী করিয়া শশার গাছ উৎপন্ন করিলে প্রচুর পরিমাণে ইহার ফলভোগ করিয়া সুখী হইতে পারেন।

কৃষিতত্ত্ব।

কৃষি-বিষয়ক সচিত্র মাসিক-পত্র।

১ম খণ্ড। } ভাদ্র—পৌষ ১৩০৭। { ৮ম—১২শ সংখ্যা।

* সম্পাদকীয় উক্তি।

উষ্ট্রের লাঙ্গল।—জর্ম্মানীদেশে অশ্ব ও বলদের পরিবর্ত্তে উষ্ট্রের দ্বারা লাঙ্গল বহান হইতেছে। এক জোড়া ঘোড়ায় যতখানি জমী চষিতে পারে, একটী উটের দ্বারা তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ কার্য্য হয় অথচ অশ্ব অপেক্ষা নিকৃষ্ট খাদ্যে উষ্ট্রেরা জীবন ধারণ করে। আমাদের কৃষকগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি?

আলকাতরার চিনি।—আমাদের কৃষকমণ্ডলী চিরকালই গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক কৌশলে আল-কাতরা হইতে চিনি (Succhrine) প্রস্তুত করা হইতেছে। পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, ইহা ইক্ষুর চিনি অপেক্ষা ২২০ গুণ অধিক মিষ্ট। এই চিনি দ্বারা বিলাতে জ্যাম, জেলি প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়; ইহার একটী বিশেষ গুণ আছে যে ইহা দেহের স্থূলতা বৃদ্ধি করেনা, এজন্য ডাক্তারেরা কোন কোন রোগে এই চিনি দ্বারা চা, কফি প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

নেবুর আরক।—নেবুর আরক প্রস্তুত করিতে পারিলে আমাদের দেশে অর্থাগমের যে একটী নূতন উপায় হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। রায় কানাই-লাল দে বাহাদুর আমাদের দেশে প্রথম ইহার আবিষ্কার করেন এবং তাঁহার "নেবুর আরক" যে কত দেশে রপ্তানি হইতেছে তাহা বলা যায় না। সমুদ্রের ঢেউ লাগিয়া জাহাজ দোলায়মান হইলে, যাত্রীগণের বমন হইয়া থাকে সে অব-স্থায় "নেবুর আরক"ই একমাত্র ঔষধ। আরও জাহাজের নাবিকগণের "স্কার্ভি" নামক একপ্রকার ব্যারাম হইয়া থাকে, তাহাতেও "নেবুর আরক" একমাত্র

ঔষধ বলিয়া ব্যবহার করা হয়। ‘নেবুর আরকে’ কীটাণু বিনষ্ট হইয়া থাকে। পানীয় জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে জলের কীটাণু বিনষ্ট হইয়া থাকে। টাট্‌কা নেবুর রসেও এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। ফলতঃ এরূপ উপকারী নেবুর আরক প্রস্তুত করিতে পারিলে যে, একটী লাভের ব্যবসা হয় তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না, যেহেতু আমাদের দেশে নেবু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পাখীর পালক।—সাহেবদের পাখীর পালক একটী সখের জিনিস। গৃহ-সজ্জা, দেহ-সজ্জা, পরিচ্ছদের শোভা বর্দ্ধনার্থ এবং তুলার পরিবর্ত্তে গদী, তোষক, বালিস প্রভৃতির মধ্যে পালক ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে ৩ কোটী পাখীর পালক ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে পাখীর অভাব নাই; সুতরাং পাখীর পালকের ব্যবসা করিতে পারিলে বেশ লাভ হইয়া থাকে।

সুস্বাদু মৃত্তিকা।—ফিজি দ্বীপে একপ্রকার মৃত্তিকা আছে, যাহা তথাকার রমণীরা তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিয়া থাকেন। ইহা কিছু আশ্চর্য্য নয়, আমাদের দেশের রমণীগণও পাতখোলা খাইয়া থাকেন। গর্ভবতী পশুগণকেও দগ্ধ মৃত্তিকা খাইতে দেখা যায়।

বৃহৎ আনারস।—হেন্সস্ নামক জনৈক ইংরাজ জলপাইগুড়িতে আটসের ওজনে আনারস উৎপন্ন করিয়াছেন। আমরাও চেষ্টা ও যত্ন করিলে যে বৃহৎ আনারস উৎপন্ন করিতে পারিব তাহাতে সন্দেহ নাই। হাওড়া জেলার অন্তর্গত নালুয়া ও পায়রাটুঙ্গি নামক গ্রাম দুইটীতে বিস্তর আনারস জন্মিয়া থাকে। তথাকার কৃষকগণ কি সুবৃহৎ আনারস উৎপন্ন করিতে প্রতিযোগীতা দেখাইবেন?

পাতার সার প্রস্তুতের নূতন প্রণালী।—কৃষ্ণগঞ্জের রোণ্ট সাহেব পাতার সার প্রস্তুতের এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন পাতা সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিয়া উহাদিগকে চূর্ণ করতঃ সূক্ষ্ম চালনা দ্বারা উত্তমরূপে চালিয়া লইয়া একটী বাক্সে রাখিয়া জল দিয়া চাপিয়া রাখিতে হয়। সপ্তাহ পরে বাক্সের ডালা খুলিয়া যখন দেখা যাইবে যে পত্রচূর্ণগুলি বেশ শীতল অবস্থায় আছে, তখন বুঝিতে হইবে যে ব্যবহারোপযোগী সার প্রস্তুত হইয়াছে; যদি উষ্ণ অবস্থা থাকে তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত না শীতল হয় বাক্সের ডালা বন্ধ করিয়া রাখিবে।

ইক্ষু বীজ।— যাবা দ্বীপে সামারাঙ্গ নগরের Messrs Endmann & Seilcken Co. ইক্ষুর বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ডগার স্থায় বীজোৎপন্ন চারায় সমান ফল পাওয়া যায় এবং তাহা ডগার গাছের স্থায় রোগপ্রবণ হয় না। উক্ত কোম্পানীর নিকট হইতে আখের বীজ ও তাহার বপন প্রণালী প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। আমাদের সহৃদয় কৃষকগণ কি ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ?

বিলাতে পুষ্পের ব্যবসা।—লণ্ডনে প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ তিন কোটী টাকার পুষ্প বিক্রয় হইয়া থাকে।

অদ্ভুত দ্রাক্ষা বৃক্ষ।—আমাদের সম্রাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর ব্যবহারের জন্য হেম্পটনকোর্ট দ্রাক্ষাবৃক্ষ নামে একটী জগদ্বিখ্যাত দ্রাক্ষা বৃক্ষ আছে। বৃক্ষটী প্রায় দেড়শত বৎসরের বেশী হইবে; ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় শত ফিট্ এবং ইহার কাণ্ডের পরিধি প্রায় ৩২ ইঞ্চি হইবে। কোন কোন সময়ে এই বৃক্ষে কিঞ্চিদধিক দুই শত দ্রাক্ষাগুচ্ছ জন্মে, প্রত্যেক গুচ্ছের পরিমাণ প্রায় ১৭ আউন্স হইয়া থাকে। তাহা হইলে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সমগ্র গাছটীতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় এক টন অর্থাৎ আমাদের প্রায় ২৮ মণ দ্রাক্ষাগুচ্ছ জন্মিয়া থাকে। এই সকল ফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্ল্যাক্হাম্বার্গ জাতীয়; বোধ হয় সেই জন্যই ইহারা সম্রাজ্ঞীর অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছে।

অহিফেনের আবাদ।—শুনিতেছি বৈদ্যনাথের নিকট নাকি শীঘ্রই অহিফেনের আবাদ হইবে। অহিফেন সেবকগণের ইহা কি আনন্দের সংবাদ নহে ?

ভারতে কোকো ও চকোলেট।—দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য বরোদার মহারাজা, শ্রীযুক্ত গড়্বোলে নামক জনৈক ভারতবাসীকে শিল্প শিক্ষার্থে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বিলাতে গিয়া বিলাতী খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিবার অনেক কৌশল শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বরোদার মহারাজার ও বোম্বের বিখ্যাত বণিক মিষ্টার টাটার অর্থে ও যত্নে বরোদার অন্তর্গত বিলমোরিয়া নগরে কোকো ও চকোলেট প্রস্তুত করিবার জন্য একটী কারখানা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা এই অধঃপতিত ভারতবাসীর পক্ষে একটী গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে। আমেরিকার মধ্যপ্রদেশে অপর্য্যাপ্ত কোকো জন্মে। ফ্রান্স ইটালি, স্পেন প্রভৃতি দেশের ব্যবসায়ীরা আমেরিকা হইতে কোকো ফল আনাইয়া স্ব স্ব দেশে চকোলেট ও কোকো প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সিংহলে যথেষ্ট

কোকো পাওয়া যায়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গড়বোলে সিংহলে যাইয়া তথা হইতে বরদায় কোকো আনাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছেন। ইয়ুরোপে পারিশ্রমিক অধিক এবং আমেরিকা হইতে তথায় কোকো আমদানী করিতেও অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। এ দেশে পারিশ্রমিক অল্প এবং সিংহল হইতে কোকো আমদানী করিলে ব্যয়ও অধিক হইবে না। অতএব ভারতের কোকো ও চকোলেট অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হইবে এরূপ আশা করা যায়। এরূপ ব্যবসাই এ সময়ে আমাদের অনুকরণীয়। বঙ্গে ধনীর অভাব নাই, কিন্তু কয়জনের এরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় আছে? বরোদার মহারাজা ও মিষ্টার টাটা এই কলের প্রতিষ্ঠাকল্পে অর্থ সাহায্য করিয়া ভারতবাসীর কৃতজ্ঞভাজন হইয়াছেন।

জেড়ুয়া বা মরসুমি ফুলের রোপণ প্রণালী।

(SEASON FLOWERS.)

মরসুমি ফুলের বীজ রোপণের জন্য বেশ পরিষ্কার সমতল ভূমির নির্ব্বাচন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ঐ ভূমির ছোট ছোট গাছপালা এবং ঢেলা বা পাথরকুচি প্রভৃতি (Weeds and stones) উঠাইয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে। জমির মৃত্তিকা সারাল হওয়া আবশ্যক, যদি তাহা এঁটেল বা জমাট মৃত্তিকা হয়, তাহা হইলে তাহাকে উত্তমরূপে কোদলাইয়া তাহাতে প্রচুর বালি এবং কিছু গুঁড়া চুণ মিশ্রিত করিবে। গোয়ালের পুরাতন সার বা হাড়ের গুঁড়া মৃত্তিকায় দিলে উত্তম সার হইতে পারে।

কিছু বেশী পরিমাণে জমী খুঁড়িতে হইবে ও উত্তমরূপে মাটি গুঁড়া করিতে হইবে এবং তাহাতে নালা কাটিয়া ঢেলা, শিকড়, ঝিনুক, সামুক প্রভৃতি আবর্জ্জনাদি দূরে ফেলিয়া দিবে এবং ঐ নালায় উপরে এক ইঞ্চি আন্দাজ করিয়ায় ছাই দিয়া দুই পার্শ্বের গুঁড়া মৃত্তিকা লইয়া চাপা দিবে; ছাই দেওয়াতে গাছের গোড়ার মাটি অধিক পরিমাণে শক্ত কিম্বা সেঁতা হইবেনা; অর্থাৎ মাটি সর্ব্বোতভাবে নরম থাকিবে এবং তাহার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইবে।

এ প্রদেশে ফুলের বীজ অক্টবরের শেষে বা নভেম্বর মাসের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে রোপণ করিতে হয়। যখন শীতের আবির্ভাব অনুভব করিবে সেই সময়ই জেড়ুয়া ফুলের বীজ রোপণের

প্রশস্ত সময়। জাড়ের সময় জন্মায় বলিয়া চলিত ভাষায় উহাদিগকে জেড়ুয়া ফুল কহে। এক্ষণে উল্লিখিত প্রস্তুত করা জমীর আলের মধ্যেই হউক অথবা টবে বা গামলায় ঐরূপ মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া বীজ রোপণ করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। দেবদারু কাষ্ঠের বাক্সতেও কেহ কেহ রোপণ করিয়া থাকেন। টব, বাক্স বা গামলার উপরে চারা প্রস্তুত করিতে হইলে অধিক পরিমাণে গুঁড়া মাটি দিতে হয়। প্রত্যেক টবের তলে এক একটি বড় বড় ছিদ্র থাকিবে, আর গামলায় বা বাক্সতে ৭।৮টি ছিদ্র করিতে হইবে, কেননা তাহা হইলে মাটিতে জল দিলে উহা মৃত্তিকা সরস রাখিয়া নিম্নের ছিদ্র দিয়া বহির্গত হইয়া যাইবে অর্থাৎ জমিয়া থাকিবেনা। মরসুমি ফুলের গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে বৈকালে জল দিতে হয়। জমীতে, গামলায়, বাক্সে বা টবে অপর গাছ বহির্গত হইলে তুলিয়া দিবে এবং প্রতি সপ্তাহে নিড়ানের দ্বারায় মাটি খুসিয়া দিতে হইবে। প্রবাদ আছে যে, একবার খোসা আর সাতবার জল দেওয়ায় একই ফল পাওয়া যায়। চারাগুলি সতেজ হইলে যে স্থানে ইচ্ছা উঠাইয়া লইতে পারা যায়, কিন্তু মৃত্তিকা একই প্রকার হওয়া আবশ্যক। মৃত্তিকা সরস থাকিলে প্রত্যহ বৈকালে জল দিতে হয় না।

অধিক মাটির নীচে বীজ পড়িলে অঙ্কুরিত হয় না। বীজ ছড়াইয়া এরূপ ভাবে গুঁড়া মাটি চাপা দেওয়া উচিত যে, মৃত্তিকায় জল দিলে বীজগুলি দেখিতে না পাওয়া যায়, এবং এরূপ ভাবে বীজ ছড়াইতে হইবে যেন কেহ কাহারও গায়ে না লাগে, ইহা কেবল হস্তের কৌশল অতএব ইহা সকলের আয়ত্তাধীন। এ কারণ সমস্ত বীজ একবারে রোপণ না করিয়া দুইবারে বা তিনবারে রোপণ করা আবশ্যক; কি জানি যদি কোন কারণ বশতঃ প্রথমবারের রোপিত বীজগুলি ভালরূপে অঙ্কুরিত না হয় তাহা হইলে দ্বিতীয়বারে হইলেও হইতে পারে। যে চারা গুলি লতানে ভাব বুঝিবেন তাহাতে কঞ্চি বা ধঞ্চেকাটি লাগাইয়া দিবেন; ঐরূপ সাহায্য পাইলে চারা সকল দ্বিগুণ তেজে বৃদ্ধি হইতে থাকিবে এবং সেইরূপ ফুলও প্রসব করিবে। দিবাভাগে গামলা বা বাক্সর চারাগুলি রৌদ্রে রাখিতে হইবে, কারণ মরসুমি ফুলের গাছ সকল বড় উত্তাপ ভালবাসে। বৃষ্টির জল পাইলে চারাগুলি মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা, অতএব যাহাতে বৃষ্টি না পায় এমন ভাবে আচ্ছাদিত রাখিবে।

মরসুমি ফুলের মধ্যে Portulaca, Aster, Pansy, Viola, Chrysanthemum, Delphinium ইত্যাদি বড় সুখ-প্রিয় এবং আদরের ফুল ইহাদের জমীতে

না বসাইয়া টবে বসান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ডবল পিটুনিয়া (Double Petunias, Double Pinks, Carnations, Pinks) ইত্যাদি বড়ই সুন্দর এবং বাহারের। জগতে ইহাদের তুলনা দিবার কিছুই নাই, স্বভাবের এরূপ অতুলনীয় অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় কারুকার্য্যের নৈপুণ্যতা, লোকের বুদ্ধি ও মনের অগোচর। এরূপ পুষ্পলাভে আমাদের যে কেন প্রবৃত্তি জন্মেনা তাহা বলিতে পারিনা। সামান্য ব্যয়ে এবং সামান্য চেষ্টায় ও সামান্য পরিশ্রমে যে কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তাহা অদ্যাবধি দেশে প্রচলিত না হওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। আশা করি দেশের শিক্ষিত সহৃদয় ব্যক্তিগণ এরূপ নয়ন-মন-মুগ্ধকর পুষ্প রোপণে উদাসীন হইবেন না। যেরূপ মূল্যের ইচ্ছা সেইরূপই বীজ পাওয়া যায়। তবে এই সকল পুষ্প উৎপন্ন করিয়া উপভোগ করিতে আমরা বিরত ও উদাসীন কেন?

আমেরিকান ও বিলাতি শাক-সবজীর সংক্ষিপ্ত বপন-প্রণালী।

সতর্কতা।

বিদেশীয় বিশেষতঃ আমেরিকা প্রদেশের বীজ সকল ঠাণ্ডা পাইলেই যে নষ্ট হইয়া যায়, সকলে ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। এজন্য আমাদের পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি যে, প্রেরিত বীজের পার্শেল প্রাপ্ত মাত্রই যে স্থানে বাতাস না লাগে এরূপ স্থানে রাখিয়া ২।৩ ঘণ্টাকাল সূর্য্যোত্তাপে উত্তাপিত করিয়া তৎপরে গরম কাপড় বা কম্বল জড়াইয়া কোন নিরাপদ স্থানে বাক্স বা সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া দিবেন। এবং যত শীঘ্র জমীতে বপন হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। যদি কোন কারণবশতঃ বিলম্ব হয় তাহা হইলে বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইবে। ইহা বিশেষ স্মরণ রাখিবেন।

বাঁধাকপি [Cabbage]।

এই বীজ প্রথমতঃ বপনের জন্য বেশ ফাঁকা স্থানে অর্থাৎ যে স্থানে সকল সময়ে রৌদ্র ও শিশির পাওয়া যায়, এমন স্থানে আবশ্যক মত দুইটী অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ ধাপার প্রস্তত করাইয়া, তাহার উপর দরমা, হোগলা বা অন্য কোনরূপ আচ্ছাদন

প্রস্তুত করিয়া দেওয়া আবশ্যক; তৎপরে একটী হাপরের মাটি রীতিমত গুঁড়া করিয়া উহাতে বীজ বপন করিতে হইবে। বীজ রোপণের পরদিন উহাতে কিঞ্চিৎ জল দিতে হইবে, তৎপরে তিন চারি দিবসের পর চারা বাহির হইতে দেখা যাইবে এবং চারাগুলি যখন ৩।৪ পাতায় সজ্জিত হইবে তখন উহাদিগকে ২।১ দিনের মধ্যে অপর হাপরে ঈষৎ পাতলাভাবে রোপণ করিবেন। উভয় হাপরের মাটি বেশ ধূলার মত হওয়া আবশ্যক। উক্ত চারা সকল যখন ৫।৬ পাতায় পরিণত হইবে, তখন উহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট জমীতে ১॥০ বা ২ হস্ত অন্তর নোল টানিয়া ঐ নোলের মধ্যে ১॥০ বা ২ হস্ত ব্যবধানে এক একটী চারা রোপণ করিবেন। রোপণ কালে আবশ্যক মত জল ব্যবহার করিতে হইবে এবং প্রত্যহ অপরাহ্নে জলদিতে হইবে। কপিতে ছেঁচ দিতে পারিলে খুব ভাল হয়। সপ্তাহ অন্তর ছেঁচ দিতে পারিলে আর প্রত্যহ জল দিবার আবশ্যক করিবে না। চারার গোড়ার মাটি প্রতি সপ্তাহে খুসিয়া দিতে হইবে। রেড়ির বা সরিষার খোল কপির উত্তম সার। চারা বলবান হইলে গোড়া খুঁড়িয়া অঞ্জলী প্রমাণ খোল দিয়া মাটি ঢাকা দিবে এবং সেদিন জল না দিয়া পরদিন জল দিবে।

ওলকপি [Borecole or Kale]।

এই বীজ আবাদ করিতে হইলে বাঁধা কপির ন্যায় অগ্রে চারা তৈয়ারী করিয়া উক্ত নিয়মে ১॥০ দেড় হস্ত ব্যবধানে ক্ষেত্রে বপন করিতে হইবে। বাঁধা কপির সহিত ওলকপি চাসের কোন প্রভেদ নাই।

ফুলকপি [Cauliflower]।

ইহার আবাদও বাঁধাকপির আবাদের ন্যায়। ঐরূপ হাপরে চারা প্রস্তুত করিয়া পরে জমীতে নোল তৈয়ারী করণ পূর্ব্বক ১॥০ হস্ত ব্যবধানে এক একটী চারা রোপণ করিতে হয়। এই সমস্ত কপির অর্থাৎ বাঁধাকপি, ফুলকপি এবং ওলকপির চারা অল্প পরিমাণে আবাদ করিতে হইলে, বড় বড় টবে, গামলায় বা কাষ্ঠের বাক্সে মৃত্তিকা পূর্ণ করিয়া উহাতে বীজ বপন করিয়া চারা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু খোলা স্থান ভিন্ন অপর স্থানে বীজ রোপিত টব রাখা হইলে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া চারাগুলি অত্যন্ত লম্বা হইয়া কোমর ভাঙ্গিয়া শুইয়া পড়ে, এবং অল্প দিনের মধ্যেই মরিয়া যায়। এই কারণে অনেকেই নিরুৎসাহিত হইয়া থাকেন এবং খারাপ বীজ বলিয়া অনুমান করেন। অনেকে "পুরাতন বীজ" বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। বীজ যে পুরাতন

হইলে খারাপ হয়, তাহা মনে করিবেন না; পুরাতন বীজই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল ফুল উৎপন্ন করে, বলিতে কি বীজগুলি যদি বেশ গরম স্থানে গরম ভাবে যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইয়া পুরাতন করা যায় এবং ঠাণ্ডা ধরিয়া যদি উহার উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস না হয়, তাহা হইলে উহাতে প্রায়ই বিফল মনোরথ হইতে হয় না। যাহাহউক ঠিক নিয়মমত বীজ রক্ষিত হইলে উহা কথনই ব্যর্থ হয় না।

বীট [Beets]।

বিট পালমের বীজ ২।৩ ঘণ্টা রৌদ্রে উত্তাপিত করিয়া তৎপরে চারি দিবস নিত্য নূতন জলে ভিজাইতে হইবে। অগ্রে ইহার চারা ভাটীতে প্রস্তুত করিয়া ৫।৬ পাতায় পরিণত হইলে জমীতে একহস্ত ব্যবধানে এক একটী করিয়া রোপণ করিতে হয়। ইহার বীজ ৫।৭ বা ৮ দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হইতে থাকে। বীজ না ভিজাইয়া জমীতে ফেলিলে চারা বাহির হয় না।

গাজর [Carrots]।

উক্ত বীট বীজের ন্যায় ইহাকেও ৪।৫ দিন জলে ভিজাইয়া তৎপরে জমী তৈয়ারী করিয়া এককালে জমীতে বপন করিতে হয়। ইহার বীজ ৭।৮ দিন হইতে ১৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। ইহার চারা হাপরে প্রস্তুত করিতে হয় না। জল দেওয়া এবং জমি খোসা সকলেরই আবশ্যক।

সালগম [Turnips]।

ইহা অগ্রে ৪।৫ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া তৎপরে ১ বা ১॥০ ঘণ্টাকাল বীজগুলি হাওয়া লাগাইয়া বেশ ঝরঝরে অর্থাৎ (কেহ কাহারও গায়ে না জড়ায়) এমত অবস্থা হইলে এককালে ক্ষেত্রে বপন করিতে হইবে এবং ইহারাও কপির বীজের ন্যায় তিন রাত্রির মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। ইহার চারা হাপরে প্রস্তুত করিতে হয় না। ইহা না ভিজাইয়া জমিতে বীজ ছিটাইয়া দিলেও চলে। ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ চারা হইলে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিবে।

মূলা [Radish]।

মূলার বীজ এককালে ক্ষেত্র তৈয়ারী করিয়া বপন করিতে হয়। ইহার বীজ ৩।৪ দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। ইহার বীজ বপনের পূর্ব্বে ভিজাইয়া রাখিতে হয় না। চারা কেহ কাহারও গায়ে লাগিলে ফসল ভাল হয় না এক একটি আধ হাত অন্তর থাকিলে মূলা খুব বৃহৎ হয়। ইহার জমী যত আল্গা রাখিবে ফসল তত ভাল জন্মাইবে।

ছালাদ (Lettuce.)

ছালাদ বীজ হাপরে বা টবে কপির ন্যায় চারা প্রস্তুত করিবে। চারাগুলি ৫।৬ পাতায় পরিণত হইলে, তৎপরে উহাদের একহস্ত ব্যবধানে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। ইহার বীজ বপনে বড়ই সতর্ক থাকিতে হয়, কারণ পিপীলিকা ইহার প্রধান শত্রু ; এমন কি ২।১ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত বীজ মাটি হইতে বাছিয়া লইয়া শস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। এ নিমিত্ত ইহার বীজ বপনের সময় হাপরের মাটির সহিত কিঞ্চিৎ ঘুটের ছাই মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইতে ৩।৪ দিন সময় লাগে। অনেকে শীঘ্র অঙ্কুরিত করিবার জন্য ইহার বীজ ভিজাইয়া রোপণ করেন। বীজগুলি দুই ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া তৎপরে ছাঁকিয়া লইয়া একটী নেকড়ার পুঁটুলী বাঁধিয়া দুই দিবস ঝুলাইয়া রাখিতে হয়।

সিলেরী (Celery.)

সিলেরী বীজ ২।৩ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া, পরে ছাঁকিয়া লইয়া একঘণ্টা কাল ছাওয়াতে শুষ্ক করিয়া, তৎপরে হাপরে বা টবে বীজ বপন করিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার বীজ অঙ্কুরিত হইতে ৫।৬ দিন সময় লাগে। প্রথমতঃ চারাগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয় ; পরে ৫।৭ পাতায় পরিণত হইলে এক হস্ত ব্যবধানে জমীতে রোপণ করিতে হয়।

লঙ্কা (Pepper.)

ইহার আবাদ করিতে হইলে, আশ্বিন মাহায় হাপর বা টবে চারা প্রস্তুত করিতে হয়। তৎপরে চারা ৪।৫ পাতায় পরিণত হইলে স্থান নির্ব্বাচন পূর্ব্বক এক একটী চারা পৃথক করিয়া বসাইতে হয়। ইহার ফল অতি মনোহর দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী, সাধারণের আদরের জিনিষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার এক জাতি কলার মত বৃহৎ হইয়া থাকে।

হালিম (Nasturtium or Indian Cress.)

ইহার আবাদ করিতে হইলে অগ্রে টবে বীজ বপনপূর্ব্বক চারা প্রস্তুত করিয়া, তৎপরে কোন জলাশয়ের কিনারায় স্থান প্রস্তুত করিয়া অর্দ্ধহস্ত ব্যবধানে এক একটী চারা রোপণ করিতে হয়। ইহা এক প্রকার মসলার মধ্যে পরিগণিত।

স্পিনাক (এক প্রকার শাক) [Spinach.]

ইহার আবাদ করিতে হইলে বীজগুলি এককালে জমীতে অর্থাৎ নির্ব্বাচিত

স্থানে শাক বপন করার ন্যায় বপন করিতে হয়। ইহার পত্র শাকের ন্যায় অত্যন্ত সুখাদ্য। ইহার বীজ ৩।৪ দিনে অঙ্কুরিত হয়।

আমেরিকান বা বিলাতী ফুটী, কাঁকুড়, তরমুজ, খরমুজা ও অন্যান্য নানাজাতীয় মেলন (Melon.)

এই সর্ব্বপ্রকার ফুটী, কাঁকুড়, তরমুজ ও খরমুজা বীজ বর্ষান্তে অর্থাৎ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে রোপণ করিতে হয়। ইহার বীজ রোপণের পূর্ব্বে জমীতে নিয়ম মত মাদা প্রস্তুত করিতে হয়। প্রতি মাদার মাটির সহিত কিঞ্চিৎ সার মিশ্রিত করিয়া পরে ৪।৫টী করিয়া বীজ রোপণ করিতে হয়। ইহার বীজ ১২ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া, তৎপরে রোপণ করা বিধেয়। ইহার চারা বাহির হইতে ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত সময় লাগে। চৈত্রশশা, দেশীকাঁকুড় বা ফুটী ইত্যাদির বীজ কপির চাস ফুরাইলে ঐ সারাল ভূমিতে বসান উচিত, কারণ দক্ষিণে বাতাস না পাইলে উহারা অঙ্কুরিত হয় না।

কুমড়া (Quash.)

এই কুমড়ার বীজ বর্ষান্তে আবাদ করিতে হয়। ইহার বীজ ফুটী কাঁকুড়ের ন্যায় জমীতে মাদা করিয়া রোপণ করা বিধেয়। বীজ রোপণ করিয়া বেশী পরিমাণে জল ব্যবহার করিবার আবশ্যক করে না, কারণ খোসা পাতলা বীজ অধিক জল পাইলে পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য আবাদের সময় বড় সতর্ক হইতে হয়। ইহারা দেশীয় কুমড়া নহে।

পেঁয়াজ ও রসুন (Onion and Leek.)

ওনিয়ন এবং লিক্ বীজের, অগ্রে হাপরে চারা তৈয়ারি করিয়া তৎপরে জমীতে রোপণ করিতে হয়। ইহারা ৪।৫ দিনে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। ইহাদের বিশেষ কিছু পাইট করিতে হয় না, তবে জমী সারযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

হাতিচোক (Artichoke.)

আর্টিচোক্ বীজ ২।৩ দিন জলে ভিজাইয়া, তৎপরে জমীতে রোপণ করিতে হয়। ইহার বীজ অঙ্কুরিত হইতে ৪।৫ দিন সময় লাগে। ইহার বীজ

এককালে নিরূপিত স্থানে এক একটী মাদা তৈয়ারি করিয়া রোপণ করাই বিধেয়। ইহা অত্যন্ত সুখাদ্য।

বিলাতী সীম (Beans.)

বর্ষান্তে ইহার বীজ এককালে নিরূপিত স্থানে এক একটী করিয়া রোপণ করিতে হয় এবং অল্প পরিমাণে জল ব্যবহার করিতে হয়। খোসা পাতলা বীজে বেশী জল দেওয়া হইলে সহসা পচা ধরিয়া নষ্ট হয়। ইহার বীজ সারি ব্যবস্থায় রোপণ করিতে পারিলে ভাল হয়। চারাগুলি লতাইয়া পড়িলে কঞ্চি, পাকাটি বা ধঞ্চেকাটিতে উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

বিলাতী বেগুন (Tomato.)

ইহাকে একপ্রকার বিলাতী বেগুন বলে। ইহা ৩।৪ প্রকারের; ইহার আবাদ করিতে হইলে, প্রথমে হাপরে চারা প্রস্তুত করিয়া তৎপরে ক্ষেত্রে ১।।০ হস্ত অন্তর নোল টানিয়া ঐ নোলের মধ্যে ১।।০ হস্ত অন্তর এক একটী চারা রোপণ করিতে হয়। সমতল জমীতে বসাইলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না।

টেপারী (Gooseberry.)

ইহার আবাদ করিতে হইলে বর্ষান্তে অর্থাৎ আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে হাপর প্রস্তুত করিয়া উহাতে চারা তৈয়ারী করিয়া পরে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। ইহাতে উত্তম চাটনী প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহা অনেকের অত্যন্ত প্রিয়।

ভুট্টা বা মক্কা (Maize or Indian Corn.)

ইহার আবাদ করিতে হইলে আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে দুই হস্ত অন্তর জমীতে নোল টানিয়া ঐ নোলের মধ্যে এক হস্ত অন্তর এক একটী বীজ বপন করিয়া, অল্প পরিমাণ জল দিয়া চারা বাহির করিবে। চারাগুলি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বেশী পরিমাণে জল ব্যবহার করিতে হয়। ইহার বীজ অঙ্কুরিত হইতে ৪।৫ দিন সময় লাগে। ইহারা সমতল ভূমিতেও মন্দ জন্মায় না।

মটর (Peas.)

বর্ষান্তে মটরের বীজের আবাদ করিতে হয়। ইহার বীজ ৮।১০ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া পরে বপন করিতে হয়। ইহার আবাদ করিতে হইলে, সারি ব্যবস্থায় বীজ বপন করিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যখন চারাগুলি ৪।৫

অঙ্গুলি বড় হইবে, সেই সময় চারার মূলের নিকটবর্ত্তী স্থানে কঞ্চী, পাকাটি অথবা ধঞ্চেকাটি এক একটী পুতিয়া দিয়া উহাতে মটর গাছগুলি তুলিয়া দিতে হয়; নতুবা মাটিতে গাছ পড়িয়া থাকিলে আশানুরূপ ফল ধরে না এবং গাছও বলবান হয় না।

কৃষি ও কৃষক।

শবদেহের আশাও নাই, আকাঙ্ক্ষাও নাই; সুখও নাই, দুঃখও নাই। জীবনের অভাবই শবদেহ, জীবন থাকিলেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। সুতরাং একমাত্র জীবনই, এই পরস্পর বিরোধী অবস্থাদ্বয়ের সামঞ্জস্য সাধক।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ লাভ মনুষ্য জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ইহার প্রত্যেকটাই জীবনের স্থায়ীত্বের উপর নির্ভর করে। সুতরাং একমাত্র জীবন লইয়াই সংসার। জীবন লইয়াই ইহকালের লীলাখেলা এবং পরকালের মুক্তি। যাহা ইহকালের ও পরকালের সৌকর্য্য সাধনের হেতু—যাহা সুখের মূল ও শান্তির কারণ—সে জীবনের রক্ষা ও স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি কি মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য নহে?

এই জীবন রক্ষার প্রধান উপাদান কি? বিলাসের মহাসমুদ্রেই ডুবিয়া থাক, রত্নখনিতেই আজীবন বাস কর, আমোদের খরস্রোতেই গা ভাসাইয়া দেও, কিছুতেই তোমার জীবন রক্ষা হইবে না। জীবন রক্ষার জন্য উদর তৃপ্তির প্রয়োজন; উদর তৃপ্তির জন্য আহারের প্রয়োজন। অতীত ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠা অনুসন্ধান কর, কি বর্ত্তমান ইতিহাসই দৃষ্টি কর, দেখিবে আহার ভিন্ন কেহ বাঁচে নাই ও কেহ বাঁচিতেও পারেনা। সুতরাং জীবন রক্ষার প্রধান ও একমাত্র উপাদান আহার। আহার্য্য বস্তু হইতে রক্ত এবং রক্ত হইতে বীর্য্য উৎপন্ন হয়। এই রক্ত ও বীর্য্যই শরীরের পুষ্টিসাধক, জীবনের পরিপোষক, এবং মন ও মানসিক বৃত্তিনিচয়ের স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতা সম্পাদক। আহার ও মনের প্রফুল্লতাই আরোগ্য সুখের আকর। আরোগ্যই দীর্ঘজীবনের মূল ভিত্তি এবং চতুর্ব্বর্গলাভের প্রশস্ত পথ।

"ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষানাং আরোগ্যং মূলমুত্তমম্॥"

আমাদের এই দেহ এবং জীবনরক্ষার প্রধান উপকরণগুলি, আমরা একমাত্র কৃষি হইতেই পাইয়া থাকি। সুতরাং কৃষি কাহারও উপেক্ষার বিষয় নহে। কৃষির উন্নতি সাধনই জীবনের প্রধান ব্রত ও আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে দিন দিন দেশের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইতেছে। যৎসামান্য ইংরেজী লেখা পড়া শিখিলেই আমরা "কাহং" ভুলিয়া "অহং" এর বশবর্ত্তী হইয়া পড়ি এবং সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রমে বিমুখ হইয়া, সময়ের প্রবল প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া বিলাস বাসনায় নিমজ্জিত হই। গৃহে অন্ন নাই সে দিকে আমরা দৃষ্টি করিনা; অন্নাভাবে ক্লিষ্ট স্ত্রীপুত্রের মলিন মুখ আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না।

আমাদের জীবনের প্রধান আশা কেরাণীগিরি, ব্যবহারজীবের ব্যবসা ও স্কুল মাষ্টারী। এই তিনের প্রথমটীতে, আমাদিগকে পোড়া পেটের দায়ে নিয়ত নানাবিধ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। রাজপুরুষদের মুখ নিঃসৃত "ড্যাম, শূয়র, রাসকেল্" প্রভৃতি গালি আমাদের অঙ্গের ভূষণ হইয়া উঠে। সময় সময় পদাঘাত, মুষ্টাঘাত প্রভৃতির আস্বাদ গ্রহণ করিতে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে ব্যবহারজীবের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাঁহারা বহু-চেষ্টায়ও নিজ নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন না।

যোগেযাগে শেষোক্ত কার্য্যটী লাভ করিতে পারিলে, নির্দ্দিষ্ট কএকটি মুদ্রার উপরে নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে কায়ক্লেশে চিরজীবন যাপন করিতে হয়। আমাদিগকে এত যন্ত্রণা, এত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয় বটে, তথাপি আমরা স্বাধীন ব্যবসা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হইতেছি না। ধনবিজ্ঞানের মতে, কৃষিকার্য্য যে অতীব লাভজনক ও অর্থাগমের পক্ষে যে সুগম পথ তাহা আমাদের ধারণাশক্তিতে আদৌ স্থানলাভ করিতে পারে না। আমরা অদ্যাপি এবম্বিধ ব্যবসায় উন্নতি সাধনে নিয়ত পরাঙ্মুখ রহিয়াছি, ইহা বড় আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়!

যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের এ দুর্দ্দশা, সেই পাশ্চাত্য প্রদেশের কৃষিকার্য্যই তদ্দেশীয় লোকদিগকে সভ্যতার উচ্চ সোপানে উত্তোলন করিয়াছে। তাহারা দেশের বল ও মেরুদণ্ড স্বরূপ। সে দেশে কৃষিবিজ্ঞান উন্নতির উচ্চ-সীমায় উঠিয়াছে।

যে দেশে প্রাচীন সময়ে রাজা অবধি ইতর পর্য্যন্ত সকলেই কৃষিকার্য্যকে ধনাগমের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করিত, যে দেশোৎপন্ন শস্য দ্বারায় সমগ্র দেশের লোক প্রতিপালিত হইয়া, প্রচুর পরিমাণ শস্য উদ্বৃত্ত হইত, যে দেশে আর্য্যগণও স্বহস্তে লাঙ্গল চালন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, হায়! সেই দেশের আজ এরূপ দুর্দ্দশা! এ কথা ভাবিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়!

আজকাল এদেশে বিদেশজাত শস্যের আমদানী না হইলে দেশের অভাব মোচন হয় না। দুর্ভিক্ষ হইলে, অন্নাভাবে দেশের লোক উৎসন্ন যায়। যে ভারত স্বর্ণ-প্রসবিনী, যে ভারতের সুদূরব্যাপী প্রান্তর সকল পর্ব্বত প্রমাণ শস্য প্রসব করিত, আজ সেই ভারত-সন্তানগণ অন্ন চিন্তায় জর্জ্জরিত! কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য!

পাঠক! যদি কৃষিকার্য্যে স্বদেশীয়গণের অনুরাগ জন্মে ও তাহারা উঞ্ছবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য অবলম্বন করে এবং স্বীয় ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য দ্বারায় স্বকীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণের উপায় বিধান করে, তবে আর তাহাদের অভাব কিসের? দেশীয় কৃষকগণ লাঙ্গল বহন করিয়া এখনও নিজ নিজ পরিবারের ভরণপোষণোপযোগী শস্য অর্জ্জন করিতেছে এবং তাহার উদ্বৃত্ত অংশ বিক্রয় করিয়া রাজস্ব প্রদান ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।

ভারতবর্ষের ভূমি স্বভাবতঃ অন্যান্য দেশের ভূমি অপেক্ষা সুফলা ও উর্ব্বরা। সুতরাং অনায়াসে এবং অত্যল্প ব্যয়ে এ দেশে শস্য উৎপাদন করা যায়। পক্ষান্তরে ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের মরুভূমি সদৃশ স্থানে অনৈসর্গিক উপায়ে ভূমি উর্ব্বর করিয়া শস্য উৎপাদন করিতে বহু অর্থ ব্যয় ও শ্রম আবশ্যক করে। ইংলণ্ডে অপ্রাকৃত উপায়ে একটি আনারস জন্মাইতে যে ব্যয় হয় তাহার প্রত্যেকটী আনারস ৫৲ টাকায় বিক্রয় করিলেও ব্যয় সঙ্কুলন হয় না, অথচ এদেশে বাঁশবনে অযত্নে ও অরক্ষিত অবস্থায় একটী চারা পুতিয়া রাখিলেই অনায়াসে এবং বিনা ব্যয়ে উৎকৃষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে এদেশে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে, কৃষিকার্য্যের বিশেষ অনুশীলন ছিল; তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাচীন গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। কৃষিকার্য্য কোন বর্ণের পক্ষেই তৎসময়ে নিষিদ্ধ ছিল না; বরং ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির পক্ষেই কৃষি-কার্য্য শাস্ত্রানুমোদিত ছিল। যথা "ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্মাণি কারয়েৎ"। (পরাশর সংহিতা) অর্থাৎ কলিযুগে ষট্‌কর্ম্ম নিরত ব্রাহ্মণ কৃষিকর্ম্ম করিতে পারেন।

"উভাভ্যা মপ্যজীবং স্ত কথং স্যাদিতিচেন্তবেৎ, কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্যজীবিকাম্" (মনুসংহিতা) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ যথোক্ত স্বকর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। অক্ষমতাস্থলে ক্ষত্রিয়ের ব্যবসা তাহাতেও অক্ষম হইলে বৈশ্যের ব্যবসা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। অর্থাৎ কৃষি ও গোরক্ষণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। এই বিধি মনুর মতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য।

"লৌহ কর্ম্ম তথা রত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্ বাণিজ্যং কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্য বৃত্তি-রুদাহৃতা" (পরাশর সংহিতা) অর্থাৎ লৌহ কর্ম্ম, রত্ন ব্যবসা, গোজাতির প্রতি-পালন, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য এই সকল বৈশ্যের কার্য্য।

পুরাকালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যজাতিই আর্য্যনামে পরিচিত হইত। অধুনা ইউরোপীয় ও এসিয়া দেশবাসী কোন কোন জাতিও Aryan (এরিয়ান্) অর্থাৎ আর্য্যজাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। "অর্য্য" শব্দে বৈশ্যকে বুঝায়। বৈশ্যের ব্যবসা প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন, ভারতবর্ষীয় সকল জাতিই "অর্য্য" নামে অভিহিত হইত। সুতরাং এতদ্দ্বারায় প্রতীয়মান হয় যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অর্য্যজাতির অন্তর্গত ছিল না। সম্ভবতঃ অর্য্য হইতেই আর্য্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সদ্বংশোদ্ভব। বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যগত স্থানে আর্য্যজাতির বসতি ছিল।

"আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমি মধ্যং বিন্ধ্য হিমালয়া" (অমরসিংহ)

ইউরোপীয় অধিকাংশ ভাষায় "অর্" (Ar) শব্দে ভূমি কর্ষণ বুঝায়। সংস্কৃতে "অর্" ধাতু নাই। কিন্তু "ঋ" ধাতু হইতে "অর্য্য" এবং আর্য্য শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় "অর্" শব্দে কর্ষণ অর্থই প্রতিপাদন করে। সুতরাং একথা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, অর্য্য এবং আর্য্য জাতি প্রাচীনকালে কৃষিকার্য্য করিত। বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন স্থানে আমরা অনেক আর্য্যসন্তানকে স্বহস্তে হল চালনা করিতে দেখিয়া থাকি; কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহারাও এখন হল চালন কার্য্য হইতে বিরত হইয়া আমাদের দলে মিলিত হইতেছে।

কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবন যাপন করা আমাদের পক্ষে কোনরূপেই অসম্মানের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত নহে। কেননা আজ কাল চাকুরির যে অবস্থা তাহাতে কালে আমাদিগের কৃষিকার্য্য অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না।

অনেকের কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমি ও অর্থের অভাব হইতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষে অদ্যাপি এমন অনেক স্থান পতিত রহিয়াছে যে, তাহা শ্রম ও অর্থ-ব্যয় দ্বারা আবাদোপযোগী করিয়া কৃষিক্ষেত্র করিলে, বহুলোকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে। কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে এই কার্য্য অবলম্বন করিতে মূলধনের অভাব হইতে পারে। চেষ্টা করিলে সহজেই সে অভাব মোচন করা যায়। বিশেষ আড়ম্বর না করিয়া দেশীয় কৃষকের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিলেই চলিতে পারে। তাহারা একখানা লাঙ্গল ও দুইটী বলদ দ্বারায় নিজ নিজ পরিবারবর্গের ভরণপোষণোপযোগী শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। অল্প

লোকের পক্ষে তাহা অবশ্যই সম্ভবপর নহে। তাহাদিগের ভৃত্য দ্বারা কার্য্য করাইতে হইবে। সুতরাং অধিক পরিমাণ ভূমি আবাদ না করিলে ব্যয় সঙ্কুলন হইয়া লাভ দাঁড়াইতে পারে না। সচরাচর ৩।৪ খানা হাল চলিলেই এক পরিবারের ভরণপোষণোপযোগী শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। ৩।৪ খানা হালের ব্যয় ৩০০।৪০০৲ শত টাকার অধিক নহে। ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা মূলধন হইলেই প্রথমতঃ চলিতে পারে। চারিখানা হাল দ্বারায় ৭০।৮০ বিঘা জমী আবাদ হইতে পারে। প্রতি বিঘার খরচ বাদে ২৫৲ টাকা লাভ হইলেও ন্যূনাধিক বার্ষিক ২০০০৲ টাকা লাভ হইতে পারে।

আজ কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াও চাকুরির জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। যোগেযাগে কোন একটা কার্য্যে প্রবেশ করিতে পারিলেও তাহা প্রথমতঃ পরিবার প্রতিপালনের পক্ষে যথেষ্ঠ হয় না; অথচ চাকুরিও বর্ত্তমান সময়ে সুলভ নহে। এমতাবস্থায় পরের গঞ্জনা, লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া পরপদ লেহন করিয়া চাকুরির জন্য লালায়িত হওয়া অপেক্ষা কৃষিকার্য্যের ন্যায় স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

আজ কাল উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে যে অর্থ ব্যয় হয়, তদ্দ্বারায় এক পরিবারের ভরণপোষণ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং ঐ পরিমাণ অর্থ স্থলবিশেষে একের জীবনে চাকরির দ্বারায় সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ব্যয়িত অর্থকে মূলধন গণ্য করিলে তাহার সুদের পরিবর্ত্তে চাকরি করার তুল্য হয়। মনে কর একজনের শিক্ষার ব্যয় ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা। এই তিন হাজার টাকাকে মূলধন করিয়া কৃষিকার্য্যে কি অন্যবিধ কার্য্যে বিনিয়োগ কর। সাধারণতঃ লাভের হার বার্ষিক প্রতি টাকায় ।৵০ আনা হইলেও উল্লিখিত মূলধন হইতে প্রতি বৎসর ১১২৫৲ টাকা লাভ হইতে পারে। M. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম মাসিক ৭৫৲টাকা বেতনের চাকুরি পাইলেও বার্ষিক ৯০০৲ টাকার অধিক আয় হইতে পারেনা। কিন্তু ঐ অর্থ কৃষি কি অন্য কার্য্যে বিনিয়োগ করিলে গৃহে বসিয়া অনায়াসে মাসিক ১০০৲ টাকা উপার্জ্জন করা যায়। এমতাবস্থায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে যাইয়া কতকগুলি অর্থের শ্রাদ্ধ করায় ফল কি? কৃষি কি বাণিজ্য ব্যবসার অনুসরণ করাই তোমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারায় এ কথা বুঝিতে হইবে না যে, লেখা পড়া শিক্ষা করা আদৌ অনুচিত। নিজ ব্যবসা চালাইবার উপযুক্ত শিক্ষালাভ করা অবশ্যই উচিত। তৎপর অর্থের স্বচ্ছলতা ও অবস্থা বিবেচনায় উচ্চশিক্ষা লাভ

করা নিতান্ত সঙ্গত। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, অর্থবল বিবেচনায় ভাবীজীবনের উন্নতির পথ অনুসরণ করাই উচিত।

বর্ত্তমান কালে দেশের এবং সময়ের অবস্থা বিবেচনায় কৃষির উন্নতি সাধন করাই যুক্তিযুক্ত ও সর্ব্বানুমোদিত।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষা নৈবচ নৈবচ" অর্থাৎ বাণিজ্যকার্য্যে পূর্ণ লাভ, কৃষিকার্য্যে তাহার অর্দ্ধেক, চাকুরিতে তাহার অর্দ্ধেক, এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে কোন লাভ নাই। এই শ্লোকের ভাবে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে কৃষিকার্য্য ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। আমরা অদ্য এই স্থানেই এই বিষয়ের উপসংহার করিয়া পাঠকগণের নিকট বিদায় হইলাম। বারান্তরে এই বিষয়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধ সহ উপস্থিত হইব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ,
জামালপুর, ময়মনসিংহ।

চা।

[মৃত্তিকা।]

কোন প্রদেশে, চার চাষ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, চারিটী বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। মৃত্তিকা, জলবায়ু, পরিশ্রম ও প্রেরণের সুবিধা। উক্ত চারিটী বিষয় সম্বন্ধে, ভারতবর্ষের হিমালয় প্রদেশ চার চাষের পক্ষে যতদূর অনুকূল, ও যেরূপ জলবায়ুতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চা উৎপন্ন হয়, তাহা এই প্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে দেখা যাউক, কিরূপ মৃত্তিকা চার পক্ষে বিশেষ অনুকূল এবং কি উপায়ে প্রতিকূল মৃত্তিকাকেও চা উৎপাদনের উপযোগী করা যাইতে পারে।

জলবায়ুর উপযোগিতা, যেমন সহজে নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে, মৃত্তিকার বিষয় সেরূপ বলা তাদৃশ সহজ নহে। প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই চার গাছ জন্মিতে পারে, এবং বিলক্ষণ বৃদ্ধিশীলও হইয়া থাকে। তথাপি, চা উৎপাদনের উপযোগী মৃত্তিকা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে, এমন কতকগুলি স্থূল স্থূল সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যাহার সত্যতার বিষয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

যখন আমি প্রথমে চার বিষয় পর্য্যালোচনা করি, তখন ভিন্ন ভিন্ন চা বাগান হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহার পর মনে মনে স্থির করিলাম যে, উক্ত ভিন্ন ভিন্ন রকমের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিলেই কোন না কোন একটা নিয়ম নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু যখন দেখিলাম যে, নিতান্ত বিভিন্ন প্রকৃতির মৃত্তিকা হইতেও উত্তম উত্তম বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, তখন আমাকে একেবারে হতাশ হইতে হইল। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে, আমি চা সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিতাম না। গাছের আয়তন দেখিয়াই, চার উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতা বিচার করিতাম। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমাত্মক। যাহা হউক ক্রমশঃ পরীক্ষাদ্বারা ইহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আমার পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনেকাংশে সত্য অর্থাৎ অনেক মৃত্তিকাই চার অনুকূল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কতকগুলি সাধারণ নিয়ম ব্যতীত, এ বিষয়ের আর কিছুই নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না।

হিমালয় প্রদেশস্থ মৃত্তিকা যেমন উত্তম, পরিমিত পরিমাণে বালুকা মিশ্রিত লঘু মৃত্তিকাও (loam) তদ্রূপ হইতে পারে।* এরূপ মৃত্তিকা, গভীর হওয়া আবশ্যক এবং পচা বৃক্ষ লতাদি ইহার উপরিভাগের মৃত্তিকার সহিত যত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে ততই ভাল। যদি এমত গভীর হয় (তিন ফুট হইলেও চলিতে পারে) যে, বৃক্ষের প্রধান মূল, সহজে মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে উহার নিম্নস্থ মৃত্তিকা যেরূপ হউক না কেন, তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। আবার নীচের মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ হরিদ্রাভ লাল বর্ণের হইলে বিশেষ সুবিধাজনক হয়। এই প্রকার মৃত্তিকা সচরাচর কর্দ্দম ও বালুকা মিশ্রিত। আসাম, কাচার ও চট্টগ্রামের অধিকাংশ মৃত্তিকাই এইরূপ। তবে প্রভেদ এই যে, আসামের মাটী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও চট্টগ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

উপরে যে প্রকার মৃত্তিকার বিষয় উল্লেখ করা গেল, তাহাতে যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে চর্ব্বি ও বালুকা মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে উহা আরও সারবান হইয়া উঠে। সকল প্রকার চার মৃত্তিকাতে পরিমিত বালুকা মিশ্রিত থাকা আবশ্যক। বালুকা মিশ্রিত আছে কিনা, ইহা যদি সহজে উপলব্ধি না হয়, তবে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকাতে থুথু মিশাইয়া হাতের তালুতে মর্দ্দন করিয়া সূর্য্যকিরণে ধরিলে, যদি বালুকা থাকে, তবে তাহা চিক্ চিক্ করিতে থাকিবে।

* বালি এবং পচা উদ্ভিদ ও জান্তব পদার্থ মিশ্রিত মৃত্তিকা।

হিমালয় প্রদেশে সচরাচর যে মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা লঘু, উর্ব্বরা ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে জীর্ণ উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত। উহার নিম্নস্তর ঈষৎ হরিদ্রা ও রক্তবর্ণ এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ লোহার ভাগও বর্ত্তমান আছে। আমার বিবেচনায় এইরূপ মৃত্তিকাই চার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেখানকার জল বায়ু চার পক্ষে অনুকূল, সেখানে কুত্রাপি এরূপ মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয় প্রদেশের মৃত্তিকা যেমন অনুকূল, জলবায়ু সেরূপ নহে। যে মৃত্তিকাতে যত অধিক পরিমাণে জীর্ণ উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত থাকিবে তাহা সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট। হিমালয় প্রদেশে বহুশত বৎসর ধরিয়া, গলিত ওক পত্র সকল মৃত্তিকা রূপে পরিণত হইয়া, তত্রত্য মৃত্তিকাকে উর্ব্বরা করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ইহা সকলেই জানেন যে, ওকবৃক্ষ নাতিশীতোষ্ণ দেশ ব্যতীত আর কুত্রাপি জন্মেনা।

বহুকাল ধরিয়া লোকের মনে বিশ্বাস ছিল যে, অনুর্ব্বরা ভূমিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চা উৎপন্ন হয়। চা সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাতে চীন দেশের চার মৃত্তিকার যে বর্ণনা আছে, তাহাই ঐরূপ বিশ্বাসের হেতু। ফলতঃ চীন দেশে যে মৃত্তিকাতে আর কিছুই জন্মেনা, তাহাতেই চা উৎপন্ন করা হয়, সুতরাং উক্ত বিশ্বাস কেবল ভ্রান্তি মাত্র। মৃত্তিকা অধিক হালকা ও চুর চুরে হইলে চার পক্ষে বেশী উর্ব্বরা হয় না।

বুল্ সাহেব তাঁহার প্রণীত পুস্তকে* চার মৃত্তিকা সম্বন্ধে বিস্তর লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে সকল মত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারা পরস্পর এত অনৈক্য যে, তাহা হইতে কিছুই নিশ্চিতরূপে জানা যাইতে পারে না।

এক্ষণে দেখা যাউক কি কি গুণ থাকিলে, মৃত্তিকা চা উৎপাদনের অনুকূল বা প্রতিকূল হয়। প্রথমতঃ যে মৃত্তিকা সহজে চূর্ণ হইয়া যায়, তাহা চার পক্ষে উত্তম। ইহা হইতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, চার মৃত্তিকায় পরিমিত বালুকা থাকা আবশ্যক; কিন্তু তাই বলিয়া, বালুকার পরিমাণ অতিরিক্ত হওয়া ভাল নহে। কারণ তাহা হইলে, মৃত্তিকা অনুর্ব্বরা হইবে। দ্বিতীয়তঃ মৃত্তিকা সচ্ছিদ্র হওয়া আবশ্যক, নচেৎ মৃত্তিকাতে সহজে জল নির্গত হইয়া যাইতে পারেনা। তৃতীয়তঃ উপরিভাগের মৃত্তিকা, যত অধিক পরিমাণে জীর্ণ উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত হইবে ততই উত্তম।

* Bulls' Book on "Cultivation and manufacture of tea in India."

সকলপ্রকার কঠিন মৃত্তিকা, অর্থাৎ যাহা বৃষ্টির পর শুষ্ক হইলে জমাট বাঁধে ও ফাটিয়া যায়, তাহারা চায় প্রতিকূল। কাল রঙের মাটী ভাল নহে। উৎকৃষ্ট চায় মৃত্তিকা মাত্রই ঈষৎ শ্বেতবর্ণ। কিন্তু যদি বৃক্ষলতাদি পচিয়া মৃত্তিকার রং কাল হয়, তাহা হইলে তাহাকে মন্দ বলা যাইতে পারে না। কারণ উক্ত কাল রং এরূপ স্থলে মৃত্তিকার স্বাভাবিক রং নহে। আর পূর্ব্বে ইহাও বলা হইয়াছে যে, মৃত্তিকারূপে পরিণত উদ্ভিদাদি চায় পক্ষে বিশেষ অনুকূল। শুষ্কাবস্থায় মৃত্তিকার প্রকৃত বর্ণ জানিতে পারা যায়; যেহেতু ঈষৎ শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকাও আর্দ্রাবস্থায় কাল দেখায়। যে মৃত্তিকাতে ইট প্রস্তুত হয় তাহাতে চা জন্মে না। যদিও কখন কখন এরূপ দেখা গিয়াছে যে কঠিন মৃত্তিকাতেও চায় গাছ বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হয়, তথাপি এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না যে, ঐরূপ মৃত্তিকাতে চিরকালই সুন্দররূপ চায় গাছ জন্মিবে।

যে সকল মাটী স্বভাবতঃ কঠিন, তাহাতে পাথরের কুচি থাকিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। কারণ তাহা হইলে মাটী জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইতে পারে না। কিন্তু বৃহৎ প্রস্তর থাকা ভাল নহে। উহাতে গাছের শিকড় নামিবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে।

নরম ও হাল্‌কা মাটীতে চায় গাছ খুব তেজাল হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল শিকড় দিয়া, মৃত্তিকা হইতে, গাছ রস আকর্ষণ করে, তাহাদের অগ্রভাগ সাতিশয় কোমল, সুতরাং কঠিন মৃত্তিকা তাহারা সহজে ভেদ করিতে সমর্থ হয় না। এই হেতু কঠিন মৃত্তিকাতে অপেক্ষাকৃত অধিক সার থাকা সত্বেও, তাহাতে গাছের কোন উপকার হয় না।

বালুকা মিশ্রণ দ্বারা কঠিন মৃত্তিকারও অনেক উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। কিন্তু নিকটে বালি প্রাপ্ত হওয়া গেলেও, ইহাতে অধিক ব্যয় পড়ে। চায় গাছ রোপণের জন্য যে সকল গর্ত্ত খনন করা হয়, ঐ সকল গর্ত্তের মৃত্তিকার সহিত বালি মিলাইয়া, গাছ রোপণ করিতে হয় এবং কিয়ৎদিন পরে, পুনর্ব্বার গাছের চতুর্দ্দিকে ও গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তন্মধ্যে বালি প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। এই সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয় ও শ্রমসাধ্য বলিয়া, উৎকৃষ্ট চায় মৃত্তিকা ব্যতীত অন্যরূপ মৃত্তিকা নির্ব্বাচন করা উচিত নহে। উল্লিখিত সকল প্রদেশেই স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট চায় মৃত্তিকা সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জোড়-কলম (GRAFT.)।

এরূপ কতকগুলি বৃক্ষ আছে যাহাদের মাটী ও গুটী বা গুলকলমে চারা প্রস্তুত হয় না ; সে জন্য তাহাদের জোড়-কলম বাঁধিতে হয়। আম্র বৃক্ষের গুটী বা গুল-কলমে চারা প্রস্তুত হয় না, যদিও গুটী-কলমে শিকড় বাহির হইতে দেখা যায় ; কিন্তু হাপরে অথবা মাটীতে বসাইলেই মরিয়া যায়। কেবল এক জাতীয় আম্রের গুটী বা গুল-কলম হইয়া থাকে তাহাকে সচরাচর ধরের বোম্বাই বলিয়া থাকে। এরূপ গোলাপও আছে যাহাদের জোড়-কলম ভিন্ন অন্য উপায়ে চারা উৎপন্ন করিতে পারা যায় না। অতএব কিরূপে জোড়-কলম বাঁধিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয় অদ্য তাহাই আমরা পাঠকবর্গের গোচরে আনিব।

কোন গাছের শাখার সহিত অপর একটী চারার পরস্পর মিলন করিয়া গাছ প্রস্তুত করার নাম জোড়-কলম। এই কলম প্রস্তুত করিবার নিয়ম জানা থাকিলে ফুল, ফল প্রভৃতি নানা প্রকার গাছ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। বীজের গাছ অপেক্ষা জোড়-কলমের গাছে ফুল ও ফল অধিকতর উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। বীজ যেরূপ তদুৎপন্ন গাছও সেইরূপ হওয়াই নিয়ম। কিন্তু নানা কারণে সকল স্থানে সে নিয়ম দেখা যায় না। অনেকে উৎকৃষ্ট আম্র কিম্বা অন্য কোন প্রকার ফলের বীজ রোপণ করিয়া মূল গাছের সদৃশ ফললাভে বঞ্চিৎ হইয়া থাকেন। অনেক গাছের আবার এরূপ স্বভাব যে, তাহার বীজে প্রায়ই চারা উৎপন্ন হয় না। কোন কোন গাছের আবার এরূপ নিয়মও দেখা

গিয়া থাকে যে, বীজের চারায় ফললাভ করিতে হইলে অধিক দিন সময় অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু জোড় কলমে চারা প্রস্তুত করিলে অল্প দিনের মধ্যে ফল ধরিয়া থাকে, ফলের আস্বাদন ও আকার মূল গাছের ফলের ন্যায় হইয়া থাকে। এজন্য কলম করিবার নিয়ম জানা অতি আবশ্যক।

ফুল কিম্বা ফলের যে কোন গাছের কলম করিতে হইলে অগ্রে শাখা নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। অর্থাৎ যে ডালের সহিত যে চারার কলম বাঁধিতে হইবে, তাহারা পরস্পর সমান স্থূল কিনা। চারা ও ডাল ঠিক এক অবস্থাপন্ন হওয়া উচিত। পাকা ডালের সহিত কচি চারার কলম ভাল হয় না। আবার চারার কাট শক্ত এবং ডাল কচি হইলেও কলমে ব্যাঘাত হইয়া থাকে। এজন্য ডাল ও চারার কাষ্ঠাংশ তুল্য দেখিয়া কলম বাঁধিতে হয়। মনে কর যে চারার বয়স এক বৎসর, তাহার সহিত কলম বাঁধিতে হইলে এক বৎসর বয়সের ডালের সহিত বাঁধাই উচিত। পরস্পর সমান অবস্থাপন্ন পদার্থের যেমন যোগ হয়, বিভিন্ন অবস্থা হইলে সেরূপ হয় না। আবার ইহাও জানা উচিত যে, চারা কিম্বা ডাল খুব কচি হইলেও কলমের পক্ষে তত অনুকূল নহে। যে সকল ডালের কাষ্ঠাংশ কিছু শক্ত হইয়াছে এরূপ আকারের চারা ও ডালে কলম বাঁধিলে তাহা শীঘ্র লাগিয়া থাকে। ফুল কিম্বা ফলের গাছের যে সকল ডালের শাখা উপরের দিকে মুখ করিয়া থাকে সেই ডালে কলম বাঁধা বিধেয়। কারণ নিম্ন মুখ শাখায় কলম বাঁধিলে কলমের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে।

যে নিয়মে কলম বাঁধিতে হয় এই প্রস্তাবের শিরোভাগে তাহার একটী চিত্র প্রদর্শিত হইল। এই চিত্রে একটী গোলাপ গাছের ডালের সহিত অপর একটী গোলাপের চারার কলম বাঁধা হইতেছে। বড় টবে যে বড় গাছটী আছে, তাহার পার্শ্বস্থ একটী ডাল বাঁকাইয়া চারার সহিত মিলিত হইয়াছে। সকল গাছের সকল ডাল কলম বাঁধার উপযুক্ত আকারে জন্মায় না। যে সকল ডাল অনেকগুলি ডালের মধ্যে থাকে, তাহাদিগকে বাঁকাইয়া মাটিতে শোয়াইয়া রাখিতে হয়। ডাল মাটিতে পড়িয়া থাকিলে, তাহার প্রত্যেক গাঁইট হইতেই প্রায় এক একটী কেঁকড়ী বা হুক্ বাহির হয়। ডালের ঐরূপ কেঁকড়ীই কলম বাঁধার পক্ষে সুবিধা; নতুবা প্রত্যেক ডালের সহিত কলম বাঁধিতে হইলে কলমের সংখ্যা অল্পই হইয়া থাকে। মনে কর একটী গাছে দশটী ডাল আছে, আর প্রত্যেক ডালে যদি কলম বাঁধা যায় তবে দশটীর অধিক কলম প্রস্তুত হইবে না। কিন্তু ঐ দশটী ডাল যদি মাটিতে শোয়াইয়া রাখা যায় এবং প্রত্যেক

ডালের গাঁইট হইতে যদি পাঁচটী করিয়াও ফেঁকড়ী নির্গত হয় তাহা হইলে দশটী ডালে অন্ততঃ পঞ্চাশটী কলম বাঁধা যাইতে পারে। গোলাপ গাছ সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম অবলম্বিত হইয়া থাকে। আম্র প্রভৃতি গাছের পক্ষে এ নিয়ম খাটে না। তাহাদিগের প্রত্যেক ডালে এক একটীর অধিক কলম প্রস্তুত হয় না। গোলাপের মধ্যে জায়গেণ্টিয়া নামে এক জাতীয় জঙ্গলা প্রকৃতির লতানে গোলাপ আছে, তাহার চারার সহিত কলম বাঁধিলে কলমের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। জায়গেণ্টিয়া একপ্রকার অমর গাছ, সহজে নষ্ট হয় না। এই জাতীয় গাছে প্রায়ই গোলাপ হয় না। প্রথমে জায়গেণ্টিয়ার ডাল কাটিয়া খোঁচা কলম প্রস্তুত করিতে হয়। খোঁচা কলমের নিয়ম এই যে, এক একটী ডাল ৮।১০ অঙ্গুলি পরিমাণ করিয়া কাটিতে হয়। পরে ঐ কর্ত্তিত ডালগুলি কোন স্থানে হাপোর প্রস্তুত করিয়া তথায় পুঁতিতে হয়। হাপোরে কিছুদিন উহা থাকিলে গাছ লাগিয়া যায়। গাছ লাগিয়া গেলে, তখন তাহা তুলিয়া ভাল ভাল গোলাপ ডালের সহিত কলম বাঁধিতে হয়। পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন গোলাপের কলম বাঁধিতে হইলে তাহার ডাল মাটিতে শোওয়াইয়া রাখিতে হয়। অনন্তর ঐ ডালের চোক হইতে ফেঁকড়ী বাহির হইলে সেই ফেঁকড়ীর পাশে জায়গেণ্টিয়ার চারা পুঁতিতে হইবে উহা এরূপ ভাবে পুঁতিতে হইবে তাহা যেন ফেঁকড়ীর মাথার সহিত সমান উচ্চভাবে থাকে। এইরূপ নিয়মে চারা রোপণ করা হইলে ডালের মধ্যস্থল হইতে দুই ইঞ্চি পরিমিত স্থান এবং চারার মধ্যভাগ হইতেও ঐ পরিমিত অংশ চাঁচিয়া লইতে হইবে। তীক্ষ্ণধার ছুরী দ্বারা কলম কাটা আবশুক। কারণ ছুরীর ভাল ধার না থাকিলে কলম কাটিবার সময় গাছে আঘাত লাগিতে পারে। আঘাত লাগিলে সেই কর্ত্তিত স্থান নষ্ট হইবার সম্ভব। এই নিয়মে চারা ও ডালের নির্দ্দিষ্ট অংশ কাটা হইলে সূতা দ্বারা ঐ কর্ত্তিত অংশ পরস্পর জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। এই চিত্রে ক নামক স্থান কর্ত্তন করিয়া পরস্পর বাঁধা হইয়াছে। পুর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জায়গেণ্টিয়ার ডাল খোঁচা কলমে চারা প্রস্তুত করিয়া সেই চারার সহিত অন্যান্য গোলাপের কলম বাঁধিতে হয়। এস্থলে ইহা মনে রাখা উচিত যে, জায়গেণ্টিয়ার যে ফেঁকড়ীটী সবল ও তেজাল তাহার সহিত কলম বাঁধাই উচিত। কারণ জায়গেণ্টিয়ার চারা যে পরিমাণ তেজবিশিষ্ট হইবে, কলমের চারাও সেই পরিমাণ সবল হইয়া উঠিবে। এজন্য জায়গেণ্টিয়ার যে ফেঁকড়ীতে কলম বাঁধা হইবে, তাহা রাখিয়া অপর ডালগুলি

কাটিয়া ফেলিতে হইবে। কারণ উহাতে অধিক ডাল থাকিলে প্রত্যেক ডালই আপন আপন দেহ পরিপোষণের নিমিত্ত মূল গাছ হইতে রস গ্রহণ করিবে। সুতরাং কলম বাঁধা ডালে প্রচুর রস প্রাপ্ত হইতে ব্যাঘাত জন্মিবে। যে চারায় কলম বাঁধিতে হইবে তাহা যত সতেজ হয় ততই ভাল।

কলম বাঁধিবার সময় আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত; ডাল ও চারা যখন পরস্পর সুতাদ্বারা জড়াইয়া বাঁধিতে হইবে, সেই সময় উহা যেন উত্তমরূপ বাঁধা হয়। কারণ ডাল ভাল বাঁধা না হইলে অর্থাৎ সল থাকিলে ঐ বাঁধার স্থান হইতে আবের ন্যায় ফুলিয়া উঠিতে পারে। ঐরূপ ফুলিয়া উঠিলে চারা মরিয়া যাইবার সম্ভব।

কলম বাঁধার পর চারার অর্থাৎ বন্ধনের ঠিক উপর খ নামক স্থান কাটিয়া ফেলিতে হইবে। কারণ চারার মাথা না কাটিয়া দিলে গাছের রস উপরে উঠিয়া বাড়িতে থাকিবে। আর মাথা কাটিয়া দিলে ঐ রস উঠিতে না পারিয়া কলম-বাঁধা শাখায় সঞ্চারিত হইবে। এইরূপ অবস্থায় কিছু দিন কলম বাঁধা থাকিলে উহা লাগিয়া যাইবে। কলম লাগিয়া গেলে, তখন যে ডাল কাটিয়া কলম করা হইয়াছে সেই ডালের কলম-বাঁধা স্থানের নিম্নে কাটিয়া দিতে হইবে। অনন্তর কিছুদিন চারা না তুলিয়া সেই স্থানে রাখিতে হইবে।

উপরি উক্ত নিয়মে কলম প্রস্তুত হইলে, তাহা তুলিয়া বাগানে অথবা টবে কিম্বা যে কোন স্থানে রোপণ করিতে পারা যায়। যে কোন উদ্ভিদের স্বজাতীয় গাছের সহিতই উত্তম জোড় হইয়া থাকে। সমশ্রেণীর গাছ না হইলে প্রায় জোড় লাগে না। এজন্য আমের সহিত আম্র, গোলাপের সহিত গোলাপ এবং জবার সহিত স্থলপদ্মের জোড়কলম হইয়া থাকে। জবা এবং স্থলপদ্ম যদিও ভিন্ন জাতীয় গাছ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক উহা ভিন্ন জাতীয় গাছ নহে। আম্রের জোড়কলম বাঁধিতে হইলে এক বৎসরের পুরাতন ডালের সহিত জোড় বাঁধাই বিধেয়। আম্রের জোড়কলম বাঁধিবার সময় আর একটী বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়; অর্থাৎ নিতান্ত অম্লরসবিশিষ্ট চারার সহিত মিষ্ট গাছের কলম বাঁধা উচিত নহে। কারণ মন্দ গাছের সহিত ভাল গাছের কলম বাঁধিলে ক্রমে ক্রমে ভাল গাছের গুণ নষ্ট হইতে পারে। এজন্য সুমিষ্ট আম্রের চারার সহিত মিষ্ট গাছের শাখায় কলম বাঁধাই উচিত। জোড় বাঁধিতে যদি এক জাতীয় গাছ না পাওয়া যায়, তবে তজ্জাতীয় কোন গাছের ডালের সহিত বাঁধিলেও তাহা জোড় লাগিতে পারে। এক জাতীয় গাছের মধ্যে যত নিকট জাতীয় গাছ হয় কলমের পক্ষে ততই সুবিধা।

. যে সকল গাছের আকার বড়, তাহাদিগের কলম বাঁধিতে হইলে, যে ডালে কলম বাঁধিতে হইবে, তথায় মাচা বাঁধিয়া সেই মাচায় টবে করিয়া চারা স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপভাবে চারা স্থাপন করিলে চারার মাথা ঐ ডালের মাথার সহিত সমান হইবে। এজন্য আম্রাদি বড় বড় গাছের কলম করিতে হইলে টবে চারা প্রস্তুত করিতে হয়। গোলাপের চারা টবে প্রস্তুত না করিলে কোন ক্ষতি হয় না। কারণ তাহার ডাল সকল মাটিতে শোয়াইয়া কলম বাঁধিলে চলিতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গাছের পক্ষে জোড় কলম বাঁধিবার ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। আম্রাদির কলম বর্ষাকালে বাঁধিতে হয়। গোলাপের জোড় কলম বাঁধিবার পক্ষে কার্ত্তিক মাসই প্রশস্ত সময়। বৎসরের মধ্যে অন্যান্য সময়ে যদিও ঐ সকল গাছের জোড় কলম বাঁধিলে কলম প্রস্তুত করিতে পারা যায় কিন্তু অসময় নিবন্ধন অনেক কলম না লাগিবার সম্ভব। সকল কার্য্যেরই এক একটী সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। উদ্যানকারীগণের সেই সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। কলম বাঁধিবার যেমন সময় নির্দ্ধারিত আছে, সেইরূপ আবার এক এক জাতীয় গাছের কলম লাগিবার সময় নিরূপিত দেখা যায়। গোলাপের যত শীঘ্র জোড় লাগিয়া থাকে, আম্রের জোড় তত শীঘ্র লাগে না। গোলাপের কলম একপ্রকার অমর বলিলেও হয়। কারণ সহজে উহার জীবনী-শক্তি বিনষ্ট হয় না। সামান্য ছালেও গাছ হইতে পারে। তবে যাহার কলম বাঁধিবার আদৌ ক্ষমতা নাই, তাঁহার দ্বারা জোড় বাঁধিলে প্রথমে দুই একটী কলম না হইলেও হইতে পারে। কিছুদিন নিজের হাতে কলম তৈয়ার না করিলে, উহা শিখা যায় না। অস্ত্র চিকিৎসাবিদ্যা যেমন কিছু দিন স্বহস্তে চালনা করিলে, তাহাতে জ্ঞান জন্মে, কলম কাটার পক্ষেও সেইরূপ। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে কলম বাঁধিবার পূর্ব্বে কলম বাঁধিবার উপযোগী শাখা ও চারা স্থির করিয়া লইতে হয়। কারণ তাহা স্থির করিতে না পারিলে সুন্দররূপ কলম প্রস্তুতের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। কলম প্রস্তুত হইলে ডালের জোড়ের নিম্নে কাটিয়া দিতে হয়। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত কলম না লাগিয়া যায়, ততদিন শাখা কাটা উচিত নহে। কারণ অসময়ে শাখা কাটিয়া দিলে তাহার অগ্রভাগ অর্থাৎ জোড়ের উপর হইতে অবশিষ্ট শাখা শুকাইয়া যাইবে। সে জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। চারা ও শাখা হীনতেজ হইলে তাহাদিগের কলম ভাল হয় না। যে সুতা কি সরু দড়ী দ্বারা জোড়স্থান বাঁধিয়া দিতে হয়, জোড়

লাগিয়া গেলে সেই সূতা কিম্বা রজ্জু খুলিয়া না দিলে কোন ক্ষতি হয় না। কলম বাঁধিবার সময় শাখা ও চারার যে স্থান কাটিয়া পরস্পর জুড়িয়া বাঁধিতে হয় সেই কর্ত্তিত স্থান হইতে এক প্রকার রস নির্গত হইয়া চারা ও শাখার কাষ্ঠাংশ এক অঙ্গের ন্যায় হইয়া উঠে। কলম বাঁধিবার পর প্রবল ঝড় কিম্বা অন্য কোন কারণে ঐ জড়িত স্থান যদি নড়িয়া যায়, তাহা হইলে জোড় লাগিবার পক্ষে ব্যাঘাত হইতে পারে।

কলমের চারা রোপণ করিবার সময় আর একটী বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। চারা পুঁতিবার দোষে অনেক কলম নষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ কলম বাঁধা স্থানটী অনেক উপরে রাখিয়া চারা পুঁতিয়া থাকেন। এরূপ ভাবে রোপণ করা অবিধেয়। কারণ জোড় উপরে থাকিলে এবং শাখা প্রশাখা বড় হইলে, ঐ স্থান চিরিয়া যাইতে পারে। বৃক্ষের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা জোড় বাঁধা স্থান যে অপেক্ষাকৃত শিথিল থাকে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। মালদহ অঞ্চলে আম্রের কলম কিছু উপরে বাঁধা হইয়া থাকে। উহা এত উপরে বাঁধা হয় যে আবশ্যকীয় স্থান পর্য্যন্ত মাটির মধ্যে পুঁতিতে পারা যায় না। সাধারণতঃ কলমের চারা জোড়ের অর্দ্ধেক পরিমাণ উপরে রাখিয়া পুঁতিবার নিয়ম। কিন্তু কলম অধিক উপরে বাঁধা হইলে রোপণের সময় সে নিয়ম রক্ষা হয় না। এজন্য অধিক উপরে জোড় বাঁধা নিষেধ।

যে সকল বৃদ্ধি-শীল বৃক্ষ বাগানের অধিক স্থান ব্যাপিয়া থাকে, সেই সকল গাছের বীজের চারা রোপণ না করিয়া কলমের চারা রোপণ করা ভাল; কারণ কলমের চারা বীজের গাছের ন্যায় সহজে তত বড় হয় না। বাগানে বড় বড় বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে অনেক স্থান অনর্থক পড়িয়া থাকে, গাছের আওতায় লাভ-জনক অন্য কোন উদ্ভিদ্ জন্মে না। কলমের গাছ রোপণ করিলে অনেক স্থান বাঁচিতে পারে এবং সেই স্থানে অন্যান্য গাছ উৎপাদন করা যাইতে পারে। অল্প দিনের মধ্যে ফল ভোগ করিতে হইলে কলমের চারার ন্যায় বীজোৎপন্ন চারা শীঘ্র ফলে না। ফলতঃ ফুল ও ফলাদির উৎকর্ষ সাধন এবং অল্প দিনের মধ্যে উহা উপভোগ করিবার পক্ষে কলমের গাছই একমাত্র উপায়।

কৃষিকার্য্য।

জগতের যে নানাপ্রকার উন্নতি দেখা যাইতেছে কৃষিই তাহার মূল। কৃষি কার্য্য ব্যতীত জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য কোন উপায় নাই। কৃষিজাত ফল, মূল, শস্যাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ পূর্ব্বক মানবজাতি নানাপ্রকার যশস্কর কার্য্য, শিল্প নৈপুণ্য প্রভৃতি দেখাইতেছেন, কিন্তু যদি কৃষিকার্য্য না করা হয় তাহা হইলে বিদ্যাবল, শিল্পকৌশল, বীরত্ব প্রভৃতি সমস্তই লুপ্ত হইয়া যায়। জগৎ সুখবিহীন, সংসার অন্ধকারময় বোধ হয় এবং সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সুখ, ভোগবিলাসিতা একেবারে অতল জলধিতলে চিরকালের জন্য নিমগ্ন হইয়া যায়। অধিক কি মানবজাতির জীবনধারণ ভার হইয়া উঠে ও দুর্লভ মনুষ্যজীবন কালের করালকবলে কবলিত হয়। যাহাহউক কৃষিকার্য্য যে মানবজাতির জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র উপায় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। পরন্তু সেই কৃষিকার্য্যকেই আজকাল কি ইতর কি ভদ্র সকলেই অশ্রদ্ধা করেন। কি আশ্চর্য্য সকলেরই স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করায় অনিচ্ছা দেখা যাইতেছে। সকলেই পরাধীন-ভাবে পরপদ সেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক ও অত্যন্ত গৌরব বিবেচনা করিয়া থাকেন। আজকাল নীচমনা দাসত্বপ্রিয় কর্ম্মচারিগণকে সকলেই ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মান্য করেন এবং তাঁহারাও অক্ষুব্ধচিত্তে আপনাদিগের অবস্থাকে অতিশয় গৌরব বিবেচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বাধীন কৃষককে সকলেই ঘৃণা করিয়া থাকেন, এমন কি তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপও করেন না। এ নিমিত্ত কৃষকেরাও আপন আপন অবস্থাকে ঘৃণা করিয়া চাকুরি করা ভাল ও সম্মানজনক কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে। যদি কৃষকগণের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধ মূল হয় ও কৃষিকার্য্যে অবহেলা করে, তাহা হইলে ভারতের প্রত্যেক গৃহে কৃতান্ত ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিবে সন্দেহ নাই। সকলেরই পরপদাবলেহন, দাসত্ববৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা উচিত।

দেখা যায় যে অনেকে অর্থের অনাটন প্রযুক্ত দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করেন; কারণ কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতিতে অর্থের আবশ্যক করে অথচ তাঁহাদের সে ক্ষমতা নাই। পরন্তু অর্থশালী ব্যক্তিরা যে দাসত্বকে ভাল বাসেন, দাসত্বের গৌরব করেন এবং দাসত্বে জীবনযাপন করিতে প্রভূত অর্থ গচ্ছিত রাখিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না তদপেক্ষা লজ্জা ও ঘৃণাকর বিষয় আর নাই। (ক্রমশঃ)

মানকচু।

কচু একপ্রকার উৎকৃষ্ট তরকারী। ইহা নানাপ্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মানকচু, শোলাকচু ও গুঁড়িকচুই প্রধান। আমরা এই প্রস্তাবে মানকচুর বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে প্রথমতঃ মৃত্তিকা উত্তমরূপে খনন করিয়া ঘাস, মুথা প্রভৃতি বাছিয়া ভূমিতে সার দিতে হয়। তোলা মাটি কচুর ক্ষেত্রে দিলে ইহা আকারে অতিশয় বড় হয়। মৃত্তিকার উত্তমরূপে পাইট না করিলে কোনপ্রকার ফসলই যে সুচারুরূপে উৎপন্ন হয় না, তাহা সকলেই অবগত আছেন। উক্তরূপে ভূমির পাইট করা হইলে কচুর পো অর্থাৎ চারা (যাহা গাছের গোড়াতেই উৎপন্ন হয়; তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য কোন প্রকার নিয়ম নাই এবং প্রস্তুত করিতেও হয় না) দীর্ঘে ও প্রস্থে দুই হস্ত অন্তর পুঁতিতে হয়। ইহার অন্য কোনপ্রকার পাইট করিতে হয় না। পরে মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হইলে একবার ও বৈশাখমাসে জল হইলে একবার গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। বর্ষাকালে উত্তমরূপে, গোড়াখোঁড়া প্রভৃতি পাইট করিতে হয় এবং গোময়, গোয়ালের ওঁচলা, ঘুঁটের ছাই, শরিষার খোইল প্রভৃতি সার গোড়ায় দিতে হয়। এইরূপ করিলে কচু অতিশয় বড় এবং আস্বাদনে উৎকৃষ্ট হয়। ইহা মাঠেই ভাল হয়; আওতায় রোপণ করিলে কিম্বা পাইটের অভাবে আকার বৃদ্ধি হইতে না পারিলে, খাইবার কালে মুখ কুট্ কুট্ করে। ইহা রোগীর পক্ষে সুখাদ্য। ইহার চাষে অধিক পরিশ্রম নাই অতএব ইহা রোপণ করিয়া অনায়াসে উত্তম দ্রব্য লাভ করিতে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। ইহা রোপণ করিবার এক বৎসর পরেই খাইবার উপযুক্ত হয়।

কলা।

কলা নানাপ্রকার। চাটিম, কাঁঠালি, চাঁপা, কাঁচকলা, সবরি, অমৃপান, অগ্নিশ্বর, রামকলা, কাবুলী, কাঁনাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, সিঙ্গারপুরী, পিনাং, মার্টাবান বা মর্ত্তমান প্রভৃতি অতিশয় সুস্বাদু ও সুমিষ্ট। বৈশাখমাসে ভূমিতে উত্তমরূপে চাষ দিয়া খনন করিয়া সার দিতে হয়। পরে একবার বৃষ্টি হইলে আট হাত অন্তর একহাত গর্ত্ত করিয়া কলার তেউড় অর্থাৎ চারা রোপণ করিতে হয়। ইহার পাইট উত্তমরূপে করিতে হয়, অর্থাৎ গোড়া সর্ব্বদা খুঁড়িয়া দিতে

হয়। ইহার পাতা কাটিলে ফল ভাল হয় না। চৈত্র মাসে কলার ঝাড়ে দুই তিনটী চারা রাখিয়া অন্যান্য সমস্তগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়।

ইহার মোচা অর্থাৎ ফুলে উৎকৃষ্ট তরকারী হয়। কাঁচকলা তরকারীতে ব্যবহৃত হয় এবং অন্যান্য কলা পাকিলে খাইবার উপযুক্ত হয়। প্রত্যেক গৃহস্থই বাটীর নিকটে অনায়াসে দুই চারি ঝাড় কলাগাছ রোপণ করিতে পারেন। ইহার চাষে প্রচুর পরিমাণে লাভ হইয়া থাকে।

কলার গুঁড়ায় যে একপ্রকার উৎকৃষ্ট ময়দা প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে সুতরাং এক্ষণে আর তাহার পুনরালোচনা করা হইল না। কলার বাসনা শুখাইয়া লইয়া তাহাতে কাগজ প্রস্তুত হয়। কলার বাসনা হইতে একপ্রকার আঁশ পাওয়া যায় তাহাতেও উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাঁঠালী কলার আঁশ রেসমের ন্যায় উজ্জ্বল, মসৃণ ও দৃঢ় হইয়া থাকে। কলার আঁশে সালটির কাপড়, এমন কি জাহাজ বাঁধিবার কাছি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। উক্ত রূপ আঁশ বাহির করিবার জন্য শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ সরকার মহাশয় একটী কল প্রস্তুত করিয়া কলিকাতার শিল্প প্রদর্শনীতে দেখাইয়াছিলেন। তিনি কলাগাছের আঁশের দ্বারা যে কাপড় প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত সুন্দর ও পরিপাটী হইয়াছিল।

ড্রুরি সাহেব বলেন এ দেশে যেরূপ কলাগাছ পাওয়া যায় তাহাদ্বারা ইয়ুরোপের সহিত বেশ বাণিজ্য কার্য্য চলিতে পারে। কিন্তু এরূপ বাণিজ্যব্যাপারে সংলিপ্ত হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি আমাদের দেশে কয়জন আছে?

লাউ।

লাউ তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। ইহা পাকিলে ইহার মধ্যস্থিত শাঁস বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া কঠিন আবরণ অর্থাৎ উহার ত্বক তানপুরা প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র বিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার চাসে কোন বিশেষ পরিশ্রম নাই। মৃত্তিকা উত্তমরূপে খনন করিয়া শ্রাবণ, ভাদ্রমাসে মাদা প্রস্তুত করিয়া লাউয়ের বীচি, দুই একদিন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া, প্রত্যেক মাদায় তিন চারিটি করিয়া রোপণ করিতে হয়। চারা বাহির হইয়া কিঞ্চিৎ বড় হইলে তাহার নিকট বাঁশের কঞ্চি অথবা সেইরূপ অপর কিছু অবলম্বন পুঁতিয়া দিতে হয়। এইরূপ করিলে গাছ উক্ত কঞ্চি আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধি পায়, পরে মাচা প্রস্তুত করিয়া

দিতে হয়। গাছ সেই মাচায় উঠিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পরে গাছ রীতিমত বৃদ্ধি পাইলেই ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। এই সামান্য পরিশ্রম করিয়া সকল গৃহস্থই ইহা বাটীতে রোপণ করিয়া বাজারের শুষ্ক ফল ক্রয় করিয়া খাওয়ার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

পেঁপে।

পেঁপে একটী সুখাদ্য ফল। পাকিলে ইহার আস্বাদন অত্যন্ত সুমিষ্ট হয়। ইহা উপকারী এবং রোগীর পক্ষে অতি উত্তম খাদ্য। অপক্ক অবস্থায় ইহার উৎকৃষ্ট তরকারী হইয়া থাকে। ইহার চাষে কোন পরিশ্রম নাই। প্রথমে বীচি ছড়াইয়া চারা করিতে হয়। আষাঢ় মাসে মৃত্তিকা উত্তম রূপে খনন করিয়া পরে বৃষ্টি হইলে চারি পাঁচ হাত অন্তর এক একটী চারা রোপণ করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া প্রভৃতি পাইট করিতে হয়। গাছ পাঁচ ছয় মাসেই ফলবান হয়। ইহার চাষে বিস্তর লাভ। অতএব সকলেরই করা উচিত।

উদ্ভিদদিগের প্রাণ ও জীববৃত্তি।

উদ্ভিদদিগের প্রাণ আছে কিনা, এই বিষয় লইয়া ইউরোপের প্রধান প্রধান উদ্ভিদতত্ত্ব সমাজের পণ্ডিতদিগের মধ্যে তুমুল তর্ক বিতর্ক চলিয়া ছিল। কেহ ইহাদিগকে চেতন, কেহ অচেতন কেহ বা "চেতন এবং অচেতন এতদুভয়ের মধ্যস্থিত একপ্রকার পদার্থ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। কোনও কোনও পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, "উদ্ভিদদিগের চেতন শক্তি নাই কিন্তু জীবনী শক্তি আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না।" এবম্প্রকার বহুল তর্ক বিতর্কের পর সমাজের অধিকাংশ সভ্যগণ স্থির করিয়াছেন যে উদ্ভিদদিগের চেতনাশক্তি এবং জীবনী শক্তি এই দুইই আছে। যে সকল যুক্তি দ্বারা পণ্ডিত মহাশয়েরা উদ্ভিদবর্গের জীবনী শক্তি ও চেতন শক্তি প্রমাণ করিয়াছেন তাহার সমালোচনা করিয়া অন্যান্য সুধীগণ বলেন "উদ্ভিদ্দিগের চেতন শক্তি, জীবনী শক্তি এবং জীববৃত্তি এই তিনই আছে।" আমরা আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে বোধ হয় কথাগুলি সত্য এবং সার গর্ভ। হিন্দুশাস্ত্রকর্ত্তা মহাশয়েরা বহুকাল পূর্ব্বে এ সকল কথা গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন, আমরা

এতদিন তাহাতে আস্থা স্থাপন করি নাই; এখন ইউরোপীয় মহাশয়েরা—দেব-দূতেরা—সেগুলি বলিতেছেন বলিয়া আমরা সত্য কথা জ্ঞানে তাহা প্রতিপন্ন করিতে বসিয়াছি। হায়! এ জাতির দুর্গতি আর কখন কি মোচন হইবে?

উদ্ভিদদিগকে প্রাণী বলিতে হইলে ইহার যে প্রাণ আছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য, জীবনী শক্তি ও জীববৃত্তি আছে তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে। উদ্ভিদের জীবনী শক্তি থাকার কথা পণ্ডিতেরা মুক্তকণ্ঠে এবং এক বাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যে গুপ্ত শক্তি (Occult force) দ্বারা কেহ আপনার শরীর পোষণ (Vitality or animation) করিতে সমর্থ হয় তাহাকে জীবনী শক্তি বলা যায়। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ব্যক্তিবর্গ বলেন, উদ্ভিদের জীবনী শক্তি না থাকিলে ইহা ভূমি হইতে রস গ্রহণ এবং তাহা সর্ব্বাঙ্গে সম্প্রসারণ করিতে সমর্থ হইত না। মূলগুলি মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিয়া তাহা গুঁড়িতে (Stem or trunk) লইয়া যায়, গুঁড়ি হইতে সেইগুলি শাখা, প্রশাখা ও পত্রাদির শিরায় সঞ্চালিত হয়। এই সঞ্চালন শক্তির নাম জীবনী শক্তি। এই শক্তি পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থেরই আছে, হিন্দু শাস্ত্রকর্ত্তারা ইহাকে "ব্রহ্মতেজ," "আদ্যাশক্তি" বা "প্রকৃতি" নামে বর্ণনা করেন। ইংরাজীতে ইহার নাম Anima; লাটীন ভাষায় ইহার নাম Steo Vitus। উদ্ভিদদিগের চৈতন্য প্রমাণ করিতে হইলে বলা আবশ্যক যে, ইহাদেরও সুখ দুঃখ ভোগ করিবার ক্ষমতা আছে। ডারউইন বলিয়াছেন, আফ্রিকার ডিয়োটিনিয়া নামক তরু ও নিপ্যাক্‌স্ নাম্নী লতার আনন্দ ও বিষাদ ভোগ করিবার শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গিয়াছে। প্রাচীন পণ্ডিত প্লিনি লিখিয়াছেন, উদ্ভিদের চৈতন্য না থাকিলে উহারা জীবিত থাকিত না। হিষাদ প্রণীত উদ্ভিদতত্ত্ব নামধেয় সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিস্তৃত উদ্ভিদতত্ত্ব নামক গ্রন্থে লিখিত আছে "আয়র্লণ্ডের কার্ণারবন্‌সায়র নামক স্থানে বিষ্টলেট নামক এক লতা আছে উহার একএকটা এক একার (প্রায় ৩ বিঘা) পরিমিত জমি ব্যাপিয়া থাকিতে পারে। ঐ লতার ডাঁটা খুব ক্ষীণ কিন্তু পত্রদল বিস্তৃত, স্থূল ও গোলাকার। বিষ্টলেটের পাতা কোন কোন সময়ে এত বড় হয় যে, দেখিলে স্কোশিয়ার পাতা বলিয়া ভ্রম জন্মে।" আমাদের দেশের পদ্মপত্র স্কোশিয়া পত্রের সমান। সাহেব আরও বলেন, "এই লতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল লাল ফুল হয়, তাহার গন্ধ অতি চমৎকার এবং তাহার শোভা নিতান্ত চিত্তহারিণী। এই ফুলে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মধু পাওয়া যায়। মধুমক্ষিকা মধুপানে প্রবৃত্ত হইলে গাছের শোভা বাড়ে, কুসুমকুল ফুলিয়া উঠে, পাতা সকল সরল হয়, সমগ্র লতাটি যেন

আনন্দে অঙ্গ ফুলাইয়া ইতস্ততঃ দুলিতে থাকে এবং সে সময়ে কোন কোন স্থান হঠাৎ ফাটিয়া উঠিয়া লতা হইতে জলবৎ তরল রস নিষ্কাষিত হয় (ইহাই আনন্দের চিহ্ন)। যদি মধুমক্ষিকার গমন কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে, তাহা হইলে দেখা যায়, বৃক্ষটি সঙ্কুচিত হইয়া যেন পিপাসিত হৃদয়ে শুষ্কবৎ পড়িয়া আছে, গাছের শোভা নাই, তাহাতে বসন্ত-মাধুরি নাই, তেমন রস নাই এবং তেমন প্রফুল্লতা বা বিকাস নাই। মৌমাছি আসিলেই যেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত আইসে।" উক্ত সাহেব আরও বলেন, "ঐ স্থানে আর একটি ক্ষুদ্রকায় লতা ছিল, তাহাকে শুষ্ক প্রায় দেখিলাম। ইহার পার্শ্বস্থ ভূমি তখন শুকাইয়া গিয়াছিল। আমি বিন্দু বিন্দু করিয়া জল ফেলিতে আরম্ভ করিলাম, ক্রমাগত কয়েক ঘন্টা এইরূপ করাতে ইহা সতেজ ও সরস হইয়া উঠিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের লক্ষণ দেখাইল।" এই পণ্ডিত আরও বলেন; "বিলাতের ভায়-লেট লতা অতি আশ্চর্য্য প্রকারে আনন্দ এবং নিরানন্দ উপভোগ করিবার শক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে।" এইরূপ অনেক প্রমাণ দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, উদ্ভিদদিগের চেতনাশক্তি আছে। "আদিসুর ও বল্লালসেন" নামক গ্রন্থে বাবু পার্ব্বতী শঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, কান্যকুব্জাগত পঞ্চ-ব্রাহ্মণগণের সহিত রাজা সাক্ষাৎকার লাভ করিতে অসম্মত হইলে তাঁহারা তাঁহাদের হস্তস্থিত বারি এক শুষ্ক ও পতিত তরুর গাত্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে তরুবর চেতন হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপ প্রবাদের কোন মূল থাকিতে পারে। চৈতন্য ও জীবনীশক্তির সমষ্টিকে প্রাণ বলা যায়—সুতরাং উদ্ভিদগণও কেন প্রাণী না হইবে? শাস্ত্রে আছে আহার, বিহার, ভয়, মৈথুন এই চারিটী-বৃত্তি যাহাদের আছে, তাহারাই প্রাণী পদ বাচ্য হইতে পারে। আমরা দেখাইতে পারি, উদ্ভিদদিগের ক্ষুধা, ক্রোধ, ঘৃণা, কপটতা, লজ্জা, স্পৃহা, কাম, লোভ, অহ-ঙ্কার, নিদ্রা, পরিশ্রম, প্রণয়, ভয়, মোহ প্রভৃতি জীববৃত্তি আছে। আমরা বলি, যাহা কখনও মরে না, তাহাই অচেতন পদার্থ; যাহা পৃথিবীতে মরে তাহাই প্রাণী। মনুষ্য, সিংহ, ব্যাঘ্র, মেষ, মহিষ, বানর, শকুনি, সারস, সর্প, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জীব মাত্রেই মরিয়া থাকে, সুতরাং ইহারা প্রাণী। প্রস্তর, মৃত্তিকা, ইষ্টক, প্রাচীর, গেলাস, ঝাড়, লণ্ঠণ ইত্যাদি মরে না; সুতরাং অচেতন এবং তজ্জন্য প্রাণী নয়। উদ্ভিদগণ জন্মিলেই মরে—চিরজীবি হয় না—সুতরাং ইহারা চেতন ও প্রাণী পদবাচ্য। একখণ্ড প্রস্তরকে বাক্সের ভিতর রাখ, হয়ত যাব-জ্জীবন সমান ভাবে থাকিবে। উদ্ভিদের প্রতি যতই যত্নকর উহা চিরকাল বাঁচিবে

না—মরিবেই মরিবে। অতএব উদ্ভিদগণ কখনই অচেতন নহে—উহারা প্রাণী পদবাচ্য। ডারউইন সাহেব বলেন, সমুদ্রের জলজ শৈবালী লতাকে জল হইতে তুলিয়া জলের নিকটবর্ত্তী স্থলে রাখিলে উহা আপনা হইতে সরিয়া আসিয়া পুনরায় জল মধ্যে আপনার পূর্ব্ব স্থানে মিলিত হয়, তিনি বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। এই সাহেব মাংসাশী লতা (Carnivorous plant) নামে একপ্রকার লতার উল্লেখ করেন, ইহা মাংস ও শোণিত ভালবাসে। পাতায় শোণিত মাখাইয়া দিয়া দেখ, উহা একেবারে চুষিয়া লইয়াছে ; জল কিম্বা দুগ্ধ দিলে সেরূপ চুষিয়া লয় না। মাংসকে হামাল দিস্তায় পেষণ করিয়া অতি তরলাবস্থায় উহার পাতায় রাখিলে তৎক্ষণাৎ বৃক্ষটি তাহা চুষিয়া খায়। এই শ্রেণীর আর একটি লতা আছে, তাহার পাতার মধ্যে ছোট ছোট গর্ত্ত থাকে সেই গর্ত্তে কীট, পতঙ্গ, মক্ষিকা প্রভৃতি বসিলে, পাতাটি আস্তে আস্তে আপনা হইতে সঙ্কুচিত হইয়া চারি পার্শ্বকে একেবারে গুটাইয়া লইয়া এই সকল জীবকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। কিছুক্ষণ পরে পাতাটি আপনা হইতে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত হইলে দেখা যায়, জীব সকলের পক্ষাদি পতিত আছে, অপরাংশ অংশকে যেন খাইয়া ফেলিয়াছে। এদেশের লজ্জাবতী লতার নাম পাঠক শুনিয়া থাকিবেন, ইহার লজ্জা ঠিক নব-পরিণীতা কুলকন্যার ন্যায়। ইহাকে স্পর্শ কর, ইহা লজ্জায় ম্রিয়মানা হইয়া সঙ্কুচিতা হইয়া যাইবে। ইংলিশম্যান সংবাদ পত্রে এলাহাবাদ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন, "আমি মৌফুলের মধু আহরণে গিয়াছিলাম, একটী ফুলের কাণ্ড দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। একটী অপেক্ষাকৃত স্থূলাকার মৌমাছি একটা কুসুমের ভিতর বসিয়া মধু পানার্থে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু ফুলটী কোন ক্রমেই মধু দিতেছে না, যেন জোর করিয়া গর্ভকেশর ও তৎসন্নিহিত সঙ্কুচিত ও আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। আমি কৌতূহলী হইয়া দেখিয়া, জানিতে পারিলাম যে, ঐ মক্ষিকাটী বিদেশীয় ও ভিন্ন জাতীয় ; মৌমাছি অপরিচিত বা বিদেশী বলিয়া কি মধু পাইতেছে না ? যাহা হউক, ইহা বড় কৌতুকের বিষয়।" আরব্য দেশে য়োজালা নামে লতার ডাঁটায় হাত দিলে বিষম বিপদে পড়িতে হয়। হাত দিবামাত্র সমস্ত পাতা একত্রিত হইয়া হাতকে বন্ধন করে, শেষে ছাড়ান দায় হইয়া উঠে। আমরা এই সকল কারণেই বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি যে উদ্ভিদগণ প্রাণী ও চেতন পদার্থ।

বারমাসের বিলাতী ফুলের চাষ।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, জগদীশ্বর সর্ব্বপ্রথমে উদ্যান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কয়েকটী মনোরম কুসুমের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বোধ হয় সেই জন্যই তত্রত্য অধিবাসীবৃন্দের পুষ্প-প্রিয়তা প্রবৃত্তি এতদুর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক পুষ্প-প্রিয়তা মানবজাতির সকল প্রকার আনন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আমাদের শরীর ও মন সুস্থ রাখিবার পক্ষে এতাদৃশ উপকারী আমোদ আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহার বাটীর সম্মুখে মনোহর উদ্যান এবং তন্মধ্যে বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট সুরম্য কুসুম সন্নিবিষ্ট থাকে, তাঁহার মনে নিত্য নিত্য কতপ্রকার যে বিশুদ্ধ প্রফুল্লতার উদয় হয় তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফুলগাছের চাষ ও বাগান প্রস্তুত করণের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আজিকালি ইউরোপীয় সভ্যতা যতই এদেশে বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, ততই আমরা বিবিধপ্রকার বিলাতী ফুলের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছি; এই জন্যই বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা পাঠকদিগকে বারমাসের বিলাতী ফুলের চাষের কথা বলিব।

জানুয়ারী—হলি, আইভি, জুনিপার, সাইপ্রেস্, ইউফ্, রোজ্মেরি, পেরিউইন্কেল্, জর্ম্মেণদার, ফ্লাক্সিস্, মার্টল এবং মেরিয়ম্।

ফেব্রুয়ারী—মেজেরিণ্, কোরোকস্, ভারণস্, প্রিম্রোজ্, আণিমোণিস্, টলিপা, হায়েসিন্থাস্, অরিয়েন্টেলিস্, চামেরি, এবং ফেরেটেলেরিয়া।

মার্চ্চ——ভায়লেট্, পীতবর্ণ ডাফাদিল্, ডেজি এবং সুইট ব্রায়ার।

এপ্রেল—ডবল শ্বেতবর্ণ ভায়লেট্, ওয়াল্ ফ্লাওয়ার, ষ্টক্ জিলি, কাউস্লিপ্, ডেলিশেস্, লিলি, রোজ্মেরি, টিউলিপ্, ডবল পাওণি, মলিণ ডাফাদিল, ফরাসী হণিসকল্, ডাগাশিন্ এবং লেলাক্।

মে ও জুন—পিঙ্ক, রোজ, হণিসকল্, বগ্লস্, কলম্বাইন্, মেরিগোল্ড, ফ্লশ আফ্রিকান্স্, রাইভ্, রেস্প, ভাইন্, লাভেণ্ডার, সাটিরিয়ান্, হার্ব্বা মস্কারিয়া, লিলিয়ম্ কন্ভালিয়ম্ এবং ডাণ্টিজিক্।

জুলাই—সর্ব্বপ্রকারের জিলিপুষ্প, মস্ক্ গোলাপ, পিয়রস্, জিনিটিং এবং কোয়াডলিন্।

আগষ্ট—পিয়রস্ আপ্রিকক্স্, বর্ব্বেরি, ফিল্বার্ড, মকহড্, এবং বেডিং।

সেপ্টেম্বর—কটনিস্, নেক্টারিণ, কর্ণিলিয়ান্স, ওয়ার্দেন, এবং কুইন্সেস্।

অক্টোবর ও নবেম্বর—সার্ব্বিশ্, মেড্‌লার, বুলিশ্, হলিয়ক্ এবং ষ্টেড্।

ডিসেম্বর—সমগ্র শীতকালে যে সকল পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তাহা এই সময়ে আজ্জাইবে; জানুয়ারী ও নবেম্বর মাসের ফুলের তালিকা দেখিলেই জানিতে পারিবে।

পাঠক, সুন্দর উদ্যানে সুন্দর কুসুমকে সুন্দরভাবে বিকসিত হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন ইহার প্রতি পত্রে পত্রে কবিতা ও সঙ্গীত বিরাজ করিতেছে, আবার যখন ইহাদের ভুবনমোহিনী সৌগন্ধ সায়াহ্ন বা প্রভাতীয় সমীরণের সহিত মিশিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তখনকার মনের ভাব সহজে বর্ণনা করা যায় না। এই জন্য বলি, কুসুম, বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম ইহাদের মনোহারিত্ব বর্ণনা করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। কুসুমের সৌগন্ধ বায়ু পরিষ্কার করিবার পক্ষে প্রশস্ত উপায়। উপরে যে সকল ফুলের কথা বলা হইল তন্মধ্যে ভায়লেট ফুল (সৌগন্ধে) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; শ্বেতবর্ণ ডবল ভায়লেটের সৌগন্ধের কাছে আর কোন ফুলের গন্ধ উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। এই ফুল বৎসরে দুইবার ফুটে। ডামাস্ক গোলাপ দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু উহার কিছুই গন্ধ নাই। রোজমেরি, বেইস ও মেরিয়ম্ প্রভৃতি পুষ্পের গন্ধ তাদৃশ নাই বলিলেই হয়। ভায়লেটের পরেই মস্‌ক্ গোলাপের নাম করা যাইতে পারে। তদনন্তর দ্রাক্ষাপুষ্প, ব্রায়ার ও জেনিং পুষ্প সুগন্ধে শ্রেষ্ঠমধ্যে গণ্য হইয়াছে। ষ্ট্রবেরির পত্র শুষ্ক হইলে উত্তম গন্ধ প্রদান করে এবং ওয়াল পুষ্প (Wall flower) বৈঠকখানা, প্রাচীর ও কুটীরের জানালায় দিলে উত্তম শোভা হয়। বিন্ (Beane) ফুল ময়দানের পক্ষে ভাল; বর্‌নেট্, ওয়াইল্ড টাইম্ ও ওয়াটার মিণ্ট কুসুমত্রয়ের সুগন্ধ দূর হইতে অত্যন্ত মনোরম বলিয়া বোধ হয়।

উদ্যানে ঐ সকল সাময়িক পুষ্প আজ্জাইতে হইলে আর একটী কার্য্য করা উচিত। ফুলের সঙ্গে সঙ্গে ঋতু উপযোগী কয়েক প্রকার উৎকৃষ্ট লতা ও গাছ আজ্জাইতে পারিলে বড় ভাল হয়, যথা—ডিসেম্বর, জানুয়ারী এবং নভেম্বরের শেষে, সাইপ্রেস্ গাছ, আইভি লতা, আনারস গাছ, ডুমুর গাছ, দেবদারু গাছ, নেবু গাছ, লাইমন্ গাছ, মার্টেল লতা এবং কুনিং লতা। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীর শেষ ভাগে—মেজিরিণ গাছ, আণিমনিস্ লতা এবং বর্কেলে গাছ। মার্চ্চ মাসে বাদাম গাছ, পিচের গাছ, কর্ণেলি লতা এবং ফুডিং গুল্ম। এপ্রেল মাসে—চেরি গাছ, বদরি, শ্বেতবর্ণের কণ্টক

বিশিষ্ট লেপা লতা, ডুম্বুর (ফ্রেঞ্চ), দ্রাক্ষালতা এবং আতা গাছ। মে ও জুন মাসে, কিছু না দিলেও চলে। জুলাই মাসে—লাইম গাছ, বদরি এবং মেশিং ফলের লতা। অগষ্ট—আপ্রিকর্‌ণ, বদরি, বার্ব্বেরি এবং ফুটি। সেপ্টেম্বর—আঙ্গুর, আতা, পোস্ত, পিচ্, খরমুজ সদৃশ কাটালি ফলের লতা, এবং রেটপি গাছ।

উদ্ভিদান্তরীকরণ।

(TRANSPLANTING.)

একজাতীয় উদ্ভিদকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উঠাইয়া লইয়া যাওয়াকে উদ্ভিদান্তরীকরণ বা Transplanting কহে। যাঁহারা এই কার্য্যে দক্ষ, তাঁহাদের ক্ষমতাকে অদ্ভুত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বিলাত ও আমেরিকার কৃষিতত্ত্ববিদ্ লোকেরা এ বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতা ও কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এ দেশে সেরূপ ক্ষমতার বিকাশ খুব কম দেখা যায়। আমরা একবার গড়ের মাঠ হইতে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষকে এক সাহেব কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইতে দেখিয়াছিলাম, ঐ গাছ মূল সহিত স্বতন্ত্র স্থানে নীত হইয়াছিল। নূতন স্থানে উহা পুনরায় পূর্ব্ববৎ স্থির আছে। প্যাক্‌শ্‌টন্ নামে এক সাহেব একটী লতাকে প্রতি বৎসর স্থানান্তরিত করিয়া প্রায় ৭ বৎসর কাল সাতটী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আশ্চর্য্য কৌশল দ্বারা ফলোৎপাদন করাইয়াছিলেন। "Magazine of Botany" নামক ইংরাজী পুস্তকের ৯ম খণ্ডের ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, চেষ্টা করিলে সকল প্রকার লতা ও গাছকে এইরূপ স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে।

আমাদের দেশের মালীরা গাছ তুলিবার সময় বিশেষ যত্ন স্বীকার করেনা। শক্ত বা বড় বড় মূল প্রায়ই কাটিয়া দেয়। গাছ বা লতা তুলিয়া জলে, রৌদ্রে বা প্রচণ্ড বাতাসে ফেলিয়া রাখা উচিত নহে। ছোট ছোট চারা গাছ বা লতাকে ভূমি হইতে তুলিয়া টবে রাখা কর্ত্তব্য; ঐ টব তরল মৃত্তিকা ও জল দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। তদনন্তর অন্ধকার ঘরে সমস্ত দিন উহা রাখ, রাত্রিকালে খোলা বাতাসে ও শিশিরে রাখিয়া দাও। দুই চারি দিন পরে ঐ টব ছায়ায় স্থাপন করিতে হইবে, তথায় উহার মূল জন্মিবে এবং

পাতা গজাইবে। বড় বড় টবে বড় বড় গাছ রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়ম অবলম্বন করা উচিত।

২০ গ্যালন জল ধরে এমন একটী বড় টবের বার আনা অংশ জলে পূর্ণ করিয়া, তদনন্তর ১০ সের পরিমাণ গোমূত্র ও ১০ সের পরিমাণ পরিষ্কার উর্ব্বরা মাটি দাও। এইগুলি একত্রে মিশাইয়া খুব পাৎলা কর, তাহার পরে (সুবিধা হইলে) পাৎলা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লও। ইহাতে যে পদার্থ পাওয়া যাইবে, তাহা ঐ টবের মধ্যে উত্তমরূপে রাখিয়া দাও। ইহার উপরে গাছ বসাইয়া দিলে গাছের পূর্ব্বশক্তির হ্রাস হয় না। টবে ১০ দিন রাখিয়া তদনন্তর জমীতে উহা আজ্জাইয়া দিলে গাছ নষ্ট হইবে না এবং Transplanting খুব উত্তম হইবে। অশ্বত্থ, বট, তিন্তিড়ী প্রভৃতি বৃহদাকার তরু সমূহের Transplanting সম্বন্ধে অন্য প্রস্তাবে বিশদরূপে লিখিত হইবে।

উদ্যানের বাহার।

পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা বিলাতী ধরণের উদ্যান প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বিবিধ প্রকার পুষ্প, লতা, ফল, মূল ও গুল্মের গাছ আজ্জাইতে ইচ্ছা করেন; তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথমে উদ্যান নির্ম্মাণ বিষয়ে মনোনিবেশ করা একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমরা "বার মাসের বিলাতী ফুলের চাষ" নামক প্রস্তাবে, বাগানের মধ্যে কোন্ কোন্ ঋতুতে কি কি প্রকার ফুল, লতা, গুল্ম ও গাছ আজ্জাইতে হইবে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিয়াছি। উদ্যান নির্ম্মিত হইলেই ঐ প্রস্তাবানুসারে তন্মধ্যে বৃক্ষাদি সন্নিবেশিত করা কর্ত্তব্য; কিন্তু বিলাতী ধরণে কি প্রকারে উদ্যান নির্ম্মিত হইলে তাহা অতিশয় মনোরম হইবে এই প্রস্তাবে আমরা তাহাই বিশদরূপে পাঠকদিগকে বুঝাইয়া দিব। পণ্ডিতেরা বলেন, উদ্যানই কুসুমরাজির ভাণ্ডার; সুতরাং উদ্যান যাহাতে উত্তমরূপে প্রস্তুত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পাঠকবর্গের মনোযোগী হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

এ দেশের তালুকদার বা জমিদারেরা অন্যান্য কার্য্যে যে প্রকার অর্থ ব্যয় করেন, তাহাতে তাঁহারা মনে করিলে, এ দেশে অতি সুন্দর উদ্যান সমূহ নির্ম্মাণ করাইয়া সাধারণের জীবনকে সুখাবহ করিয়া তুলিতে পারেন। উৎকৃষ্ট উদ্যান প্রস্তুত করিতে হইলে ৩০ একার (প্রায় ১০০ বিঘা) পরিমাণ ভূমি আবশ্যক; ঐ জমীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। প্রবেশ দ্বারে দূর্ব্বাদল প্রভৃতি

চিরযৌবন (ever-green) উদ্ভিদের জন্য স্থান থাকিবে, তদনন্তর গোলাকৃতি ডেসার্ট করিবার জন্য স্থান রাখিতে হইবে, পরে (main garden) মূল উদ্যানের যায়গা থাকিবে। উভয় পার্শ্বেই রাস্তা ও বাহার করা পথ এবং alleys রাখিতে হইবে। চারি একার প্রথম কার্য্যের জন্য, ছয় একার দ্বিতীয়ের জন্য, চারি একার alleys জন্য, চারি একার পথের জন্য, এবং দ্বাদশ একার মূল উদ্যানের জন্য রাখা প্রশস্ত। অ্যালির স্থানে কাঠের বা টীনের আচ্ছাদন (shade) রাখিতে হইবে, তাহা যেন দ্বাদশ ফুটের উচ্চতার ন্যূন না হয়। বাগানটি চতুষ্কোণ করা উচিত। ইহার চারিদিকে বড় বড় এবং অতি উচ্চাকারে বেড়া দিবে। বাটীর জানালার নীচে বিবিধ প্রকার মৃণ্ময়মূর্ত্তি সাজাইয়া রাখিবার জন্য ব্রাকেট স্থাপন করিতে পারিলে ভাল হয়। বাগানের খিলানগুলি দশ ফুট উচ্চ এবং ছয় ফুট প্রশস্ত হওয়া উচিত; ইহার ধারে ধারে টরেট্, বেলি ও স্পেইস্ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। বেলির উপরে পক্ষীর জন্য এবং কতকগুলি মৃণ্ময়মূর্ত্তির জন্য স্থান রাখিবে। গোলাকার নানাবর্ণের কাচের দ্বারা জানালার সার্সি তৈয়ার করিবে এবং নীচের জানালায় Baucket বসাইবে।

উদ্যানের মধ্যস্থানে জলের ফোয়ারা বসাইবার জন্য চেষ্টা করিবে এবং চেষ্টা করিয়া বসাইতে পারিলে খুব ভাল হয়। বাগানের কোন স্থানে কখন কোন কারণে সেতু নির্ম্মাণ করাইবে না। ফাউণ্টেন্ স্বভাবতঃ তিন প্রকার, স্পাউটীং, শোয়ার এবং বেদিং; তন্মধ্যে প্রথমটীই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। কূপ খনন করিয়া ফোয়ারা বসাইবে, পুকুরের সহিত যোগ করিয়া ফোয়ারা করা ভাল নহে।

ডেসার্ট বা কুঞ্জ প্রস্তুত করিবার সময় বিশেষরূপে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ উহা ভালরূপে তৈয়ার করিতে পারিলে সমগ্র উদ্যানটী মনোরম হইয়া উঠে। কুঞ্জ করিতে হইলে, Sweet-Briar, Honey-suckle, Wild-Vine প্রভৃতি কয়েক প্রকার বন্য গাছ ঘন ঘন করিয়া চতুর্দ্দিকে বসাইবে। ভিতরে Violet, Straw-berries এবং Prim-roses দিবে। এইগুলি এক স্থানে দিবে না, ইতস্ততঃ ওতপ্রোতভাবে সন্নিবিষ্ট করা উচিত। এই সকল কুঞ্জের বহির্দ্দিকে ধারে ধারে উইঢিপির মত মাটীর ঢিপি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে Wild-thyme, Germander, Periwinckle, Violet, Couslips, Daisies, Red-rose, Lilium Convallium, S. Williams, Beares-foot প্রভৃতি ফুল ধারাবাহিক রূপে বসাইবে; ইচ্ছা করিলে দুই একটী ভাল

ভাল ফলের গাছও দিতে পার, একটু দূরে দুই একটী লতাগাছ (যাহাতে ছোট ছোট উত্তমোত্তম ফুল ফুটে) বসাইয়া দিবে।

অ্যালিগুলিতে ফলের গাছ দিবে, মূল উদ্যানেও তাহা দিতে পার। এভিয়ারির জন্য ঝুপি গাছ, গুল্ম ও ভাল ভাল লতা দিবে। লতার ভাগ যেন বেশী থাকে।

নীলকণ্ঠ পুষ্প।

(ACERIEOLIUM.)

উড়িষ্যা দেশে যে সকল কুসুম বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, নীলকণ্ঠ তাহাদের অন্যতম। অহা জিজ্ঞিবার জাতীয় বৃহদাকার গাঢ় লোহিত বর্ণের পুষ্প বৃক্ষ বিশেষ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ আচার্য্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র উড়িষ্যার পুরাবৃত্ত (Autiquities of Orissa) নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সপ্তদশ পৃষ্ঠায় এই পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি নিজ চক্ষে এই ফুল দর্শন এবং নিজের নাসিকায় ইহার সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া বিশেষ প্রীত হয়েন। এই ফুল দেখিতে বড় সুন্দর এবং আকারেও বৃহৎ; ছোট ছোট তেঁতুল ফুলের কোরকের গঠন যেরূপ, ইহার গঠন ঠিক সেইরূপ। উড়িষ্যাঞ্চলে পুরাকাল হইতে এই পুষ্পের যথেষ্ট আদর চলিয়া আসিতেছে এবং গোঁড়া উড়িয়ারা ইহাকে মহাদেবের অতি প্রিয় পুষ্প বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। তথায় প্রবাদ আছে যে, "সমুদ্র মন্থনের সময় দেবতাদিগের মধ্যে যখন সুরার অংশ হয়, তখন মহাদেবের অংশে এই পুষ্প প্রদত্ত হইয়াছিল। মহাদেব এই পুষ্পের মধু দেখিয়া ইহা গলাধঃকরণ করেন। সেই জন্য ইহার নীলকণ্ঠ নাম হইয়াছে এবং মহাদেবও সেই অবধি নীলকণ্ঠ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।" প্রবাদের সত্যাসত্য নির্ণয়ীকৃত করা দূরে থাকুক, ফলতঃ এই পুষ্প যে অতি উৎকৃষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নীলকণ্ঠ পুষ্পের গাছ অত্যন্ত বড় হয়; বড় বড় গোলঞ্চ বৃক্ষ হইতেও উচ্চ এবং স্থূল হইয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠে উত্তম উত্তম দারুময় গৃহ প্রস্তুত হইতেছে। এই কাষ্ঠ কঠিন অথচ দীর্ঘকাল স্থায়ী। মৎস্যপুরাণে দেখা যায়—

"চৈত্রে ব্যাধিমবাপ্নোতি যো গৃহং কারয়েন্নর।
বৈশাখে ধনরত্নানি জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুং তথৈব চ॥

আষাঢ়ে ভৃত্যরত্নানি পশুবর্গমবাপ্নুয়াৎ।
শ্রাবণে মিত্রলাভং তু হানিং ভাদ্রপদে তথা॥
পত্নীনাশং চাশ্বযুগে কার্ত্তিকে ধনধান্যকং।
মার্গশীর্ষে তথা ভক্তং পৌষে তস্করজং ভয়॥
লাভন্ত বহুশো বিদ্যাদগ্নিং মাঘে বিনির্দ্দিশেৎ।
কাঞ্চনং ফাল্গুনে পুত্রা নিতিকালবলং স্মৃতং॥
অশ্বিনী রোহিণী মূলমুত্তরাত্র যমৈন্দবং।
স্বাতী হস্তানুরাধা চ গৃহারম্ভে প্রশস্যতে॥" ইত্যাদি।

বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থ পাঠে দেখা যায়—

"পাঞ্চাল-কলিঙ্গ সুরসেনাঃ কাম্বোজোঙ্গো কিরাত শস্ত্রবার্ত্তাঃ।
জীবন্তি চ যে হুতাশনবৃত্যতে পোঢ়ামুপয়ান্তি মেষসংস্থে॥"

অন্যত্রে—

"ক্ষেত্রেষু চিত্রকর লেখ্যকগেয় সক্তান্,
রূপোপজীবিনি সমজ্ঞা হিরণ্য পণ্যান্।
পৌণ্ড্রৌঙ্গকৈক যক্তনানথ চাস্মকাংশ্চ,
তাপঃ স্পৃশত্যমরযো'ত বিচিত্র বর্ষো॥" (বৃহৎসংহিতা)

উপরি উক্ত শ্লোকসমূহ দ্বারা জানা যাইতেছে, গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবার পক্ষে কোন্ কোন্ মাস ও কোন্ কোন্ রাশি বিশেষ প্রশস্ত। নীলকণ্ঠ কাঠের দারুময় গৃহাদি প্রস্তত করিতে হইলে, উড়িষ্যা দেশের লোকেরা এখনও এই সকল নিষেধ বিধি মান্য করিয়া থাকে। নীলকণ্ঠ গাছের কাষ্ঠে সৌগন্ধ পাওয়া যায়; ইহাতে কৌটা, খেলানা, বাক্স প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর দ্রব্য প্রস্তত হইতে পারে। কাষ্ঠগুলি কিছুদিন জলে ভিজাইয়া রাখিলে, আরও শক্ত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নীলকণ্ঠ ফুল দেখিতে সিন্দূরের ন্যায় গাঢ় লাল, রাধাপদ্ম ফুলাপেক্ষাও ইহা আকারে এবং ওজনে বড় হইয়া থাকে। ইহাতে ৫টী গর্ভকেশর ও ৮টী পরাগকেশর দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলের আকার অর্দ্ধ গোলাকার। কাঁটা ধুতুরাফলের ন্যায়। ইহাতে বড় বড় মোটা মোটা ফল ধরে, তাহাতে কৃষ্ণতিলের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র যে বীজ জন্মে, তাহা হইতেই গাছ জন্মে। বর্ষার পরেই অর্থাৎ শরতের মধ্যকালে ইহার বীজ আজাইতে হয়। ইহার কলম হয় না. আলগা মাটিতে বীজগুলি ফেলিয়া চারাইয়া দিবে, তাহার পর প্রতিদিন বিন্দু বিন্দু করিয়া জল ছড়াইবে। যে সকল স্থানের

মাটি কলিকাতার ন্যায় লোণা এবং আর্দ্র, এই ফুল তথায় ভালরূপে হয় না এবং ইহার গাছও তেমন সতেজ হইতে দেখা যায় না।

ভুলল ফুল।

ভুলাল ফুল তুলসীজাতীয়। ইহার যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল হয়, তাহাকে ফুল না বলিয়া মুঞ্জরী বলা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল মুকুলের মধ্যে অদৃশ্যভাবে থাকে, তাহাতে কোন প্রকার গন্ধাদি কিছুই থাকে না। কিন্তু ভুললের পাতা বিলক্ষণ গন্ধযুক্ত; এরূপ সুগন্ধ আছে বলিয়াই বোধ হয় ইহাকে (যথার্থ ফুল না হইলেও) লোকে ভুলল ফুল বলিয়া থাকে। ভুলল ফুলের পাতায় উত্তম এসেন্স প্রস্তুত হয়; অৰ্দ্ধ ছটাক কাঁচা পাতা ও অৰ্দ্ধ ছটাক প্রুভ্ স্পিরিট (Proof Spirit) একটী কাচের শিশিতে করিয়া ভালরূপে ছিপিবদ্ধ করিয়া ২৪ ঘণ্টা কাল রাখিতে হইবে; মধ্যে মধ্যে শিশি নাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। তদনন্তর ফিলটার পেপার (Filter-paper) দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেই ভুললের এসেন্স প্রস্তুত হয়। ইহার কয়েকটী মহৎ গুণ আছে, কার্ব্বলিক এসিড ছড়াইয়া দিলে যেমন ঘরে সাপ আসিতে পারে না, ভুললের এসেন্স ছড়াইয়া দিলেও সেই-রূপ ঘরে সাপ আসিতে পারে না। সাপের মুখের নিকট ভুললের একখানা শিকড় ধরিলে আর সাপ মাথা উঁচু করিতে পারে না। অনেকের বিশ্বাস সাপে কামড়াইলে ইহার শিকড় এবং পাতা বাটিয়া ক্ষতস্থানে দিলে এবং অল্প পরিমাণে খাওয়াইলে সাপের বিষ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। দেশীয় ফকিরগণ জ্বর-বিকারের রোগীকে ইহার পাতার রস পান করাইয়া আরাম করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল জ্বরবিকারে কেন, অনেক প্রকার উৎকট রোগেও ভুলালের পাতা এবং শিকড় দেশীয় ফকিরগণ ব্যবহার করে।

ভুললের পাতা এবং গাছ প্রায় তুলসী গাছের ন্যায়। ফাল্গুন মাসে গাছ মরিয়া যায়, বীজও চারিদিকে আপনাআপনিই ছড়াইয়া পড়ে। বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে নূতন জল হইয়া গেলে আপনিই চারা বাহির হয়; কোন প্রকার পাইট করিতে হয় না। ভুলল ফুল আমাদের দেশীয় কি ভিন্ন দেশ হইতে আনীত তাহা নির্ণয় করা কঠিন; তবে অনুমান হয়; মুসলমান ফকিরগণই যখন ইহার নানাপ্রকার ব্যবহার অবগত আছে তখন সম্ভবতঃ ইহা কোন মুসলমান প্রধান দেশ হইতেই আনিত।

মেটে আলু।

গোল আলু যেরূপ মাটীর উপরে ভাসিয়া উঠে, মেটে আলু সেরূপ নয়। ইহা যত বাড়িতে থাকে ততই মাটীর নীচে যাইতে থাকে; এজন্য ইহার নাম মেটে আলু হইয়াছে। মেটে আলু পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—হরিণপেল; গাঁড়ারনাদ, আল্‌তাপাত, থেম এবং চুপড়ী। হরিণের শিংয়ের ন্যায় পালা বিশিষ্ট আলুকে হরিণপেল, গণ্ডারের বিষ্ঠার আকারের ন্যায় আলুকে গাঁড়ারনাদ, আল্‌তার ন্যায় লাল এবং পাতলা আলুকে আল্‌তাপাত, থামের ন্যায় গোল ও মোটা আলুকে থেম এবং চুপড়ীর ন্যায় আকার বিশিষ্ট আলুকে চুপড়ী আলু বলে। উক্ত পাঁচ প্রকার আলুরই ফল হইয়া থাকে। প্রথমে ইহার চাষ করিতে হইলে, বৈশাখ মাসে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলেই বেলে অথবা দোঁয়াস মাটীতে পুঁতিয়া দিতে হয়। ইহার জন্য বড় অধিক পাইট করিতে হয় না, ২ দুই অথবা ২॥০ আড়াই হাত গর্ত্ত করিয়া আট অঙ্গুলি আন্দাজ গর্ত্ত রাখিয়া অবশিষ্ট মাটী দিয়া পুরাইয়া দিয়া তাহার উপরে ফল পুঁতিতে হয়। ফল পুঁতিয়া মাটী চাপা দিয়া রাখিতে হয়; পরে আর এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলেই চারা গজাইতে থাকে।

মেটে আলুর গাছ লতা জাতীয়; এমন কি ৫০।৬০ হাত পর্য্যন্ত লতাইয়া যায়; এজন্য কোন ডালপালাযুক্ত গাছের নিকটে পোতাই ভাল। এক স্থানে একটী অধিক ফল পোতা অন্যায়। গাছ যত লতাইতে পারিবে আলু ততই মোটা হইবে। একটী বড় গাছের নিকটে ২।৩টী ফল পোতা যাইতে পারে। কোন গাছের নিকটে পুঁতিবার সুবিধা না থাকিলে ফাঁকা জমিতে পুঁতিয়া বাঁশ অথবা কঞ্চি দ্বারা মাচা করিয়া আলুর গাছ তাহাতে তুলিয়া দিলেও চলে। নুতন খানার (পগার) ধারে আলু কিছু অধিক বাড়ে। উক্তরূপে বৈশাখ মাসে ফল পুঁতিলে জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছ হইয়া মাঘ, ফাল্গুন মাসে মরিয়া যায়। মাঘ মাস হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে আলু তুলিতে হয়, কারণ অধিক বিলম্ব করিলে আলু নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। আলু তুলিয়া তাহার মুখের দিকে ৪।৬ অঙ্গুলি পরিমিত রাখিয়া কাটীতে হয়; সেই মুখের দিকের আলুকে আলুর ঝাঁকা বলে। আলু তুলিয়া সেই গর্ত্তে ঐ ঝাঁকা পুঁতিয়া রাখিতে হয়। আলুর ফল পুতিলে এক বৎসরে যত বড় হয়, ঝাঁকা পুঁতিলে প্রায় তাহার ৩।৪ গুণ বড় হয়। মেটে আলুর চাষ করিতে হইলে, প্রথমবারে

ফল পুঁতিতে হয়, কারণ উহার ঝাঁকা কিনিতে পাওয়া যায় না; ফল যথেষ্ট পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বারে সেই প্রথম বারের আলুর ঝাঁকা কাটিয়া লইয়া পোতাই সুবিধাজনক। প্রথমবারে আলু তত মোটা হয় না বলিয়া লাভ খুব অল্প হয়; কিন্তু দ্বিতীয় বার হইতে আলু খুব মোটা হয় এবং লাভও যথেষ্ঠ হয়। মেটে আলু ছায়াতেও যেরূপ হয়, রৌদ্রেও সেইরূপ হয়। এঁটেল মাটীতে আদৌ বাড়ে না, যেরূপ পোতা যায় প্রায় সেইরূপই থাকে। যেখানে মেটে আলু পোতা যায় সেখানে যাহাতে জল না বাধিতে পারে এরূপ করা চাই। জল বাধিলে আলু পচিয়া যায়। একটী গাছের গোড়ায় এক হইতে দশ সের পর্য্যন্ত আলু হইতে দেখা যায়। থেম আলুই সকল অপেক্ষা অধিক বাড়ে; কিন্তু হরিণপেল এবং আল্‌তাপাতের ন্যায় সুস্বাদু হয় না। গোল অপেক্ষা মেটে আলু কিছু গুরুপাক। ইহার বিলক্ষণ পুষ্টিকরী এবং সারকতা গুণ আছে। মেটে আলুর গাছ অনেকটা লাউগাছের ন্যায়। ইহার ডাঁটায় ৩।৪টী করিয়া শীর তোলা থাকে। পাতাও অনেকটা পানের ন্যায়; তবে পান অপেক্ষা ইহার শীরগুলি খুব মোটা। বোঁটা পানের বোঁটা অপেক্ষা মোটা এবং ৩।৪ শীরযুক্ত। মেটে আলু বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক স্থানে এবং উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পশ্চিম অঞ্চলে প্রায়ই পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানের মাটীতেই মেটে আলু হইতে পারে।

শ্রীনন্দলাল দাস ঘোষ,
মামুদকাটী, খুলনা।

আকন্দ।

আকন্দের গাছ এ দেশের পতিত জমীতে, পল্লীগ্রামের রাস্তার ধারে ও নদীর কূলে আপনা হইতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার চাষ এ দেশে কাহাকেও করিতে দেখা যায় না। ইহা শ্বেত ও লাল দুই জাতীয় হইয়া থাকে ও ইহার ফুল মহাদেবের পূজায় ব্যবহৃত হয়। এই গাছ ঝোপের ন্যায়, পাঁচ বা ছয় হাত লম্বা ও মূল হইতে শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া থাকে। ইহার ফল হইতে এক প্রকার তুলা পাওয়া যায়, তাহা শ্লেষ্মা নিবারক; সেই জন্য আবশ্যক হইলে ছোট ছেলেদের মাথায় দিবার বালিস এই তুলাদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে

এবং ইহার আঠা বা দুগ্ধ, পত্র, ছাল ও মূল ঔষধরূপে বিবিধ পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আকন্দের ডাল হইতে আঁশ বাহির হয়, তাহা রেসম বা তুলার সূতার সহিত মিশ্রিত করিয়া সুন্দর কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। এই আঁশ দেখিতে সুন্দর; খুব মজবুত, এ জন্য পুরাকালে ইহার সূতায় ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করা হইত। ইহার আঁশ বাহির করিতে হইলে কলে (Roller) পিষিয়া লইয়া একখানি কাঠের উপর রাখিয়া কাঠের হাতুড়ি দ্বারা থেঁতো করিতে হইবে। ইহা ঢেঁকি কলের দ্বারাও হইতে পারে। পরে জলে ধুইয়া ইহার অসার অংশ বাদ দিতে হয়। একবার ধুইলে যদি সম্পূর্ণরূপে অসার অংশ বাহির না হয় তাহা হইলে পুনর্ব্বার ঐরূপ থেঁতো করিয়া জলে ধুইতে হয়; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত অসার অংশ বাহির না হয়, ততক্ষণ ঐরূপ করিতে হয়। এরূপে সমস্ত অসার অংশ জলে ধুইয়া গেলে পরিষ্কার আঁশ বাহির হইবে। পরে ঐ আঁশকে তিন চারি দিন, দিবসে রৌদ্রে ও রাত্রে শিশিরে রাখিতে হইবে। এই প্রণালীতে প্রস্তুত আঁশ চিক্কণ, দৃঢ় ও কোমল হইবে। এক বৎসরের অধিক বয়সের গাছের পাকা ডালে ভালরূপ আঁশ বাহির হয় না। মৃত্তিকার উপর হইতে ডাল কাটিয়া লইলে, তাহার স্থলে পুনরায় যে নূতন ডাল সতেজে বাহির হয়; সে ডাল সরল হইয়া উঠে। ইহা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে কাটিয়া ইহার ত্বক হইতে আঁশ বাহির করিতে হয়। বৎসরে দুইবার এই ডালে আঁশ বাহির করিতে পারা যায়। এরূপভাবে আঁশ বাহির করিলে গাছে ফল জন্মে না, সুতরাং তুলার সম্ভাবনা থাকে না। তুলার প্রত্যাশা করিতে হইলে, বৎসরে একবার মাত্র ডাল হইতে আঁশ বাহির করা উচিত। এই তুলা ও আঁশে ফ্লানেল বস্ত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আঁশজাতীয় বৃক্ষসমূহের মধ্যে আকন্দের আঁশ কোন অংশে হীন নহে; তথাপি কেন যে অদ্যাপি ইহাকে কেহ ব্যবহারে আনিবার চেষ্টা করেন নাই, বুঝিতে পারি না। অনেকে পরীক্ষা করিয়া ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ডাক্তার ওয়াইট সাহেব মান্দ্রাজে আকন্দ, শন ও কুইয়া প্রভৃতির আঁশ দ্বারা সমান পরিধি বিশিষ্ট রজ্জু প্রস্তুত করিয়া তাহাদের ভারবহনশীলতার পরীক্ষা করিয়াছিলেন; তাহাতে আকন্দ রজ্জু অন্যান্য রজ্জু অপেক্ষা অধিক ভার সহ্য করিতে পারিয়াছিল। শন ৪০৭, কুইয়া ৩৬২, তুলা ৩৪৬, মুর্গা ৬১৬, মেস্তা পাট (Hibiscus Cannabimes) ২৯০ ও নারিকেল কাতা ২২৪ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ভার বহনে সক্ষম হইয়াছিল; কিন্তু আকন্দ ৫৫২ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিয়া-

ছিল। শুনিতে পাই অনেক দিন হইল আলিপুর জেলে ঐরূপ পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতেও আকন্দ রজ্জুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে আমাদিগের বিনা চেষ্টায় যে পরিমাণে আকন্দ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, তাহা যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ইহারই উৎপন্ন আঁশে আপাততঃ অনেকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। আকন্দ গাছ যেরূপ প্রচুর পরিমাণে আপনা হইতে জন্মিয়া থাকে, তাহাতে উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহার স্বতন্ত্র চাষ না করিলেও চলে; তবে যাঁহারা বিস্তৃতভাবে ইহার ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আবাদ করিলে প্রতি বিঘায় তিন হইতে চারি মণ পর্য্যন্ত আঁশ পাইতে পারেন। ইহার মূল্য সচরাচর পঞ্চাশ টাকা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আকন্দের চাষে বিশেষ কোন ব্যয় বা কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না, অথচ ইহার ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক। কেবল তিন হাত অন্তর এক একটি চারা রোপণ করিলে আপনা হইতেই গাছ হইয়া উঠে। তাহার পর, উপরে যেরূপভাবে আঁশ বাহির করিবার কথা লিখিত হইয়াছে, তদনুরূপে আঁশ বাহির করিতে হইবে। ইহার চাষের নিমিত্ত বিশেষ ব্যয় না থাকায় সামান্য মূলধনেই বেশ ব্যবসায় চলিতে পারে। শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ সরকার মহাশয় ইহার আঁশ প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষার জন্য অনেকগুলি সূতাও কাপড়ের কলে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে সেই সকল কলের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া আরও পাঠাইবার নিমিত্ত লিখিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। যদ্যপি কেহ ইহার রীতিমত ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ভারতীয় শিল্পসমিতিতে পত্র লিখিলে তাঁহাকে এ বিষয়ে সাধ্যমত আরও বিস্তারিতরূপে সমাচার দেওয়া যাইবে। আর যগুপি কেহ কেদার বাবুর নিকট এ সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনিও তাঁহাকে যত্নের সহিত সমস্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য কেদার বাবুর নিজের এ সকল ব্যবসায় করা উদ্দেশ্য নহে, কেবল আমাদের দিন দিন যেরূপ অর্থাভাব ও হীনাবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে যাহাতে অভিনব প্রণালীর ব্যবসায় উদ্ভাবন দ্বারা দেশে অর্থাগম ও আমাদের দারিদ্র্য দূরীকৃত হয়, তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

(বসুমতী)

লীক।

ইহাকে ইংরাজীতে Leek, বৈজ্ঞানিক মতে Alliumporrum বলে। ইহার উৎপত্তি স্থান সুইজরলণ্ড। ইহার আকার আমাদের দেশীয় লসুন বা রসুনের স্থায়, তবে রসুন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ লম্বা হইয়া থাকে। ইহার আবাদ অবিকল পেঁয়াজ-রসুনের স্থায়। তবে পার্থক্য এই যে, আমরা পেঁয়াজ-রসুনের কোষ হইতে চারা উৎপন্ন করিয়া থাকি, আর লীক বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর ইয়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে ইহার বীজ এ দেশে আনীত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে উহার বীজ ভাল হয় না।

কপি, সালগাম, বীট, গাজর, সিলেরী লেটিউস্ প্রভৃতি বিদেশীয় শাক-সবজীর স্থায় ইহাও অক্টোবর, নভেম্বর (আশ্বিন ও কার্ত্তিক) মাসে রোপণ করিতে হয়। কপির স্থায় প্রথমে ইহার চারা প্রস্তুত করিয়া, পরে আবাদী ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। ইহার চাষের জন্ত বালুকা মিশ্রিত হাল্‌কা মাটীই উত্তম বলিয়া বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। কারণ কঠিন মৃত্তিকায় আবাদ করিলে উহার আকার তেমন বৃহৎ হয় না। আমাদের দেশে যেরূপ মৃত্তিকায় পিয়াজ-রসুনের আবাদ হইয়া থাকে; সেইরূপ মৃত্তিকাই আবশ্যক।

নীকের বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র সুতরাং উহা ক্ষেত্রে বপন করা উচিত নহে। প্রথমে টবে কিম্বা হাপরে চারা প্রস্তুত করাই বিধেয়। সামান্যরূপ আবাদ করিতে হইলে টবে চারা প্রস্তুত করাই ভাল। কিন্তু যাহারা ইহার রীতিমত আবাদ করিবেন তাহাদের হাপরে চারা প্রস্তুত করিতে হইবে।

চারা উৎপাদন জন্য পার্শ্বস্থ জমী হইতে একটু উচ্চ করিয়া একটী ছোট চৌকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহাতে উত্তমরূপে সার মিশ্রিত করিতে হইবে। এরূপ চৌকাকে চলিত ভাষায় হাপর কহে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে উক্ত চৌকার মৃত্তিকা ধূলার ন্যায় গুঁড়া করিয়া তাহার সহিত ভেড়ার সার অথবা পুরাতন গোময়ের সার উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে নিয়মমত বীজ ছড়াইয়া বেশ হালকা মাটী দ্বারা চাপা দিতে হইবে। এরূপ পরিমাণে মাটী দেওয়া উচিত, যেন ঐ মাটীতে জল দিলে মাটীর ভারে বীজগুলি নীচে বসিয়া না যায় পক্ষান্তরে আবার মাটী কম হইলে বীজগুলি উপরে বাহির হইয়া থাকে এবং রৌদ্রের উত্তাপে শুকাইয়া যায় কিম্বা পিপিলিকা প্রভৃতি অন্যান্য কীট পতঙ্গগণও তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। অতএব এই দুই অবস্থার মধ্যবর্ত্তী করিয়া মাটী চাপা দেওয়া কর্ত্তব্য। বীজ বপনের দুই দিবস পর হইতেই হাপরে অল্প অল্প জল-সিঞ্চন করা আবশ্যক। তিন চারি দিবসের পরই বীজগুলি অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়। যে পর্য্যন্ত চারাগুলি দুই অঙ্গুলি পরিমিত না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে হাপরে রাখিতে হইবে ও মধ্যে মধ্যে সামান্য পরিমাণে জল-সিঞ্চন করিয়া জিবীত রাখিতে হইবে।

চারাগুলি দুই অঙ্গুলি পরিমিত হইলে, উহাদের মধ্যে তেজস্বীগুলি বাছিয়া লইয়া আবাদীক্ষেত্রে জুলি কাটিয়া ৮।১০ অঙ্গুলি ব্যবধানে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রোপণ করিতে হইবে। হাপর হইতে চারাগুলি স্থানান্তরিত করিবার সময় এরূপ যত্ন ও সাবধানে কার্য্য করিতে হইবে যেন, উহাদের মূলের সহিত পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা কিয়ৎপরিমাণে উঠিয়া আইসে অর্থাৎ উহাদের শিকড়ে কোনরূপ আঘাত না লাগে। চারাগুলি বসাইয়া জুলিগুলিতে পুরাতন গোময়ের সার (ভেড়ার সার হইলে ভাল হয়) দিয়া পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা দ্বারা জুলিগুলি ঢাকিয়া দিতে হইবে। মৃত্তিকা জমাট বাঁধিবার জন্য তৎক্ষণাৎ জল-সিঞ্চন করিতে হইবে এবং গাছগুলি যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে সেইরূপ প্রতি মাসে উহাদের মস্তক ছাঁটিয়া দিতে হইবে।

পৌষ মাসে যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঐ সকল বৃক্ষের দুই একটী

পত্রের অগ্রভাগ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইতেছে তখনই উহা উত্তোলন করিয়া লই-বার উপযুক্ত হইয়াছে এরূপ অনুমান করিয়া উহাদিগকে মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া লইতে হইবে। ইহার আবাদ আমাদের দেশীয় পেয়াজ-রসুনের ন্যায় সুতরাং বাহুল্য বোধে ইহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল।

শ্রীহরিদাস ঘোষ,
পালপাড়া,—বেলুড় (হাওড়া)

তুরঙ্গী লতা।

(MARE PLANT)

মেয়ারপ্ল্যান্ট্ নামীয়লতার বাঙ্গালা নাম আমরা অবগত নহি। ইহা এতদ্দেশজাত লতা নহে বলিয়া বঙ্গভাষায় ইহার সংজ্ঞা আবিষ্কারের কখন প্রয়োজন হয় নাই। বার্টণ সাহেব তৎপ্রণীত "লতাতত্ত্ব" নামক ইংরাজী ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট পুস্তকের স্থান বিশেষে ইহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "লতা-সমূহের স্বাভাবিক প্রকৃতি এই যে, ইহারা ভূমির উপরে শয্যা স্থাপন করিয়া থাকে অর্থাৎ লতাইয়া বেড়ায়। লতা মাত্রেরই এইটি প্রাকৃতিক রীতি। কোন কোন লতাকে উর্দ্ধে উঠিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু মনুষ্যাকৃত সাহায্য সাপেক্ষ বলিয়াই তাহা এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আশ্রয় স্থাপন না করিলে লতাসকল উপরে উঠে না, অর্থাৎ প্রাচীর, মঞ্চ বা স্তম্ভোপরি উত্থিত হয় না। তুরঙ্গী লতা (Mare plant) ভূম্যপরি লতাইয়া যায়না, উর্দ্ধে উত্থিত হওয়াই ইহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ঠিক লতার সমগ্র প্রকৃতি ও আকৃতি লইয়া ইহা অতীব মনোহর এবং কৌতুকময় ভাবে উর্দ্ধে উঠিয়া যায়; দূর হইতে ইহাকে দেখিলে, বোধ হয় যেন বিস্তার নাই অথচ দৈর্ঘ্য আছে এমন কোন পদার্থ শূন্যে লম্বমান হইয়া রহিয়াছে। জ্যামিতির রেখার ইহা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।" পাঠক! বার্টণ সাহেবের বর্ণিত বিবৃতিটির কিঞ্চিৎ সরলব্যাখ্যা আপনাকে প্রদান করিতেছি। ইহার তুরঙ্গীলতা নামের ব্যাখ্যাস্থলে সাহেব মহাশয় বলিয়াছেন, ঘোটক যেমন দণ্ডায়মান হইয়াই নিদ্রা যায়, আহার করে, এবং জীবনাতিপাত করে, অথচ কখন শয়ন করে না, এই লতাও তেমনি যাবজ্জীবন উর্দ্ধে থাকে অথচ

নিয়ে লতাইয়া বেড়ায় না। স্বজাতীয় উদ্ভিদ সকলের প্রকৃতি ও আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াও ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে বলিয়া, পণ্ডিতেরা অথবা ইহার আবিষ্কারক মহাশয়েরা ইহাকে ঘোটকী লতা (Mareplant) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

প্রস্তাবশীর্ষোক্ত লতা বিলাত-জাত এবং স্কটলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এপ্রেল ও মে মাসে ইহারা অত্যন্ত সরস হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণের কুসুম সমূহে পরিপূরিত হইয়া বিশেষ শোভা সম্পাদন করে। ইহাদের পুষ্প, ধুতুরা ফুলের ন্যায় শুভ্র এবং বৃহৎ হয় না বটে, কিন্তু আকৃতি ঠিক্ সেই প্রকারের। গাঢ় কাল বর্ণের ছোট ছোট ফুলগুলির শীর্ষ দেশের প্রান্তভাগে অর্থাৎ ডগের চতুর্দ্দিকে গাঢ় লাল বর্ণের গোলাকার রেখা দৃষ্ট হয়, তাহা যেমন সুন্দর তেমনি সৌগন্ধযুক্ত। ইহা বসন্তের ফুল এবং বসন্ত কালেই বিশেষ সৌন্দর্য্য বিস্তার করে। প্রত্যেক ফুলে পরাগকেশর দুইটির অধিক থাকে না, গর্ভকেশর অনেকগুলি দেখা যায়। ইহার আঘ্রাণ সুরভিপূর্ণ বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ নাসিকাগ্রভাগে রাখিলে (শুনা যায়) মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া থাকে। পত্রগুলি নিম্ববৃক্ষের পাতার ন্যায় এবং ফলের আকার ঠিক রঙ্গণ গাছের ফলের মত। পাকিলে তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ইহা জন্মে না এবং অগ্নির উত্তাপ পাইলেই লজ্জাবতী লতার ন্যায় ইহা সঙ্কুচিত, বিশুষ্ক ও পরিম্লান হইয়া থাকে। ইহার কলম হয় না, বীজ আজ্জাইলে লতা জন্মে। ক্ষুদ্রাকার টবে সারল মাটি স্থাপন করিয়া তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে জল-সিঞ্চণ করিতে হয়, তাহার উপরে বীজ ছড়াইয়া দিলে প্রায় তিন সপ্তাহ মধ্যে অঙ্কুর জন্মে। ঘাসের ন্যায় চারা দেখা গেলে তাহা টব হইতে উঠাইয়া ভূমিতে রাখিতে হয়। এই লতার একটি চমৎকার গুণ এই যে ইহা অতি দীর্ঘকাল বাঁচে এবং উচ্চতায় অতি দীর্ঘ হয়। ক্ষীণাকার লতাগুলি সরল ভাবে আকাশ ভেদ করিয়া এরূপে দাঁড়াইয়া থাকে যে, দেখিতে আমোদ জন্মে এবং পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়। এই লতার অতি উৎকৃষ্ট ছড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আসামপ্রদেশে ইক্ষুর আবাদ।

অনেক বৎসরের পতিত জঙ্গলময় জমী লইয়া ইক্ষুচাষ করিতে হইলে আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে জঙ্গল কাটিতে আরম্ভ করিতে হয়। প্রথম ক্ষুদ্র জঙ্গলাদি কাটিয়া পরে, বৃহৎ বৃক্ষগুলি কাটা উচিত। শুষ্ক জঙ্গলাদি পুড়াইয়া দিলে সহজে জমী পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু তাহাতে অধিকাংশ উদ্ভিজ্জ সার নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং খরচ কিছু অধিক হইলেও জঙ্গলাদি স্থানান্তরিত করিয়া জমী পরিষ্কার করা ভাল। অতি বৃহৎ বৃক্ষগুলি ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকিলেও জমীর অপব্যয় ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অনিষ্ট হয় না, বরং সেগুলি পচিয়া ক্রমে জমীর উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকে। এইরূপে জঙ্গলাদি পরিষ্কারের পর, অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে গর্ত্ত খনন করিতে হয়। গর্ত্ত সকল চতুষ্কোণ ১ ফুট এবং ৯ ইঞ্চি গভীর করা আবশ্যক। জমীর উপরের কিছু সার মৃত্তিকা গর্ত্তে ফেলিয়া তাহা চূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। সমসাড়া এবং বোম্বাই (মোটা আখ) বসাইতে হইলে, এক সারি হইতে অন্য সারি, চারি ফিট্ ব্যবধানে এবং এক গাছ হইতে অন্য গাছ দুই ফিট্ অন্তর বসাইতে হইবে। সেই অনুসারে একটী চিহ্নিত রজ্জু ধরিয়া গর্ত্ত খুলিতে হয়। সারির মধ্যে এত স্থান খালি রাখিবার আবশ্যক কি? বলিয়া অনেকে আপত্তি করিতে পারেন; কিন্তু আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে ইক্ষু বৃহদাকার ও স্থূল হয়, আর ইক্ষু গাছগুলি ৪।৫ হস্ত পরিমাণ উচ্চে বাড়িলেও ক্ষেত্র মধ্যে কোদাল চালাইবার অসুবিধা ঘটে না। মাঘ মাস হইতে বৈশাখ মাসের মধ্যে ইক্ষু রোপণ করিবার প্রশস্ত সময়। এ সময়ে প্রত্যেক গর্ত্তে দুইটী করিয়া চোকবিশিষ্ট ডগা রোপণ করিয়া ৫ ইঞ্চি আন্দাজ মাটি চাপা দিতে হইবে। রোপণের সময় গর্ত্তে কিছু সার দেওয়া ভাল। রোপণ করিবার পরে বৃষ্টি না হইলে মৃত্তিকা ভেদ করতঃ গাছ বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত ৫।৬ দিন অন্তর গর্ত্তে জল দেওয়া উচিত। গাছগুলি এক হস্ত পরিমাণ উচ্চে বাড়িলে, একবার ৬।৭ ইঞ্চি গভীর করিয়া ক্ষেত্র কোপাইয়া দিতে হয়। আবার ১৫।১৬ দিন পরে দ্বিতীয়বার ক্ষেত্র কোপাইয়া মৃত্তিকা চূর্ণ করতঃ গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হয়। মাটি দেওয়ার পূর্ব্বেই গর্ত্তের তৃণাদি উঠাইয়া ফেলা উচিত। সারির মধ্যের চূর্ণ মৃত্তিকা ফেলিয়া গর্ত্ত সকল সমান করিয়া ভরাইয়া দিতে হইবে, যেন গর্ত্তের চিহ্নমাত্রও না থাকে। যে পর্য্যন্ত চারাগুলি বড় না হয়, অর্থাৎ গাঁজী করিয়া গাঁইট বহির্গত না হয়, সে পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে

ক্ষেত্র কোপাইয়া দিতে হয়। বৎসরের মধ্যে ৪।৫ বার ক্ষেত্র কোপাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে। বৃষ্টির জল জমিয়া পাছে অনিষ্ট হয়, সেজন্য ক্ষেত্রমধ্যে নালা কাটিয়া দিতে হয়। সমসাড়া এবং বোম্বাই আখের বীজ এক বৎসর রোপণ করিলে সেই ক্ষেত্রে তিন বৎসর ফসল পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ক্ষেত্র কোপাইয়া গাছের গোড়ায় সার দিতে হয়; কিন্তু প্রথম বৎসরের ন্যায় দ্বিতীয় বৎসরে ক্ষেত্র সমান করিয়া না রাখিয়া সারির মধ্যের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া গাছের গোড়ায় মাটী দিতে হইবে। দুই সারির মধ্যস্থলে নালা কাটিতে হইবে। সেই ক্ষেত্রে পুনরায় বিনাচাষে ইক্ষু রোপণ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত নালার মৃত্তিকা কোপাইয়া চূর্ণ করতঃ তাহাতে ইক্ষু রোপণ করা যায়। অগ্রহায়ণ মাস হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে, ইক্ষু কাটিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে। উপরে যে, ইক্ষু রোপণ-প্রণালী লিখিত হইল উহা যে, ইক্ষু চাষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী তাহা নহে। তবে আমার ন্যায় যাঁহারা অতি বৃহৎ বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ জঙ্গলময় উর্ব্বরা জমী লইয়া বহুল পরিমাণে ইক্ষুর চাষ করিতে সূত্রপাত করেন, তাঁহারা ক্ষেত্রের বৃহৎ বৃক্ষ এবং শিকড়াদি পচিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত উপরোক্ত প্রণালীতে চাষ করিলে অনেক সুবিধা পাইতে পারেন।

ইক্ষুর মহা শত্রু।

নিম্নে যে ইক্ষু রোগের (রিণ্ড ও রুট ফাংগাস) বিবরণ লিখিলাম, ইহা ইক্ষুর মহা শত্রু। প্রথমে কোন এক ইক্ষুক্ষেত্রে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া ক্রমশঃ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহা একবার জন্মিলে (যে জাতীয় ইক্ষুকে ধরে সেই জাতি) প্রায় শেষ করিয়া ফেলে। ১১।১২ বৎসর পূর্ব্বে আসাম প্রদেশের সকল স্থানেই কাল বোম্বাই জাতি ইক্ষুর চাষ হইত, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রোগে ৩।৪ বৎসরের মধ্যে আসাম প্রদেশের অনেক স্থান হইতে ঐ জাতির আবাদ উঠিয়া গিয়াছে। তখন, সমসাড়া জাতিকে এই রোগ ধরে নাই এখন ২ বৎসর হইল সমসাড়াকেও ধরিয়াছে। ইহা এতই সংক্রামক যে, রোগাক্রান্ত ক্ষেত্র হইতে বাছিয়া নীরোগ ডগা লইয়া গিয়া অন্যত্র রোপণ করিলেও সেই স্থানে রোগ জন্মিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত এরোগ নিবারণের কোনও উপায় আবিষ্কার না হয় সে পর্য্যন্ত, কাহাকেও ইক্ষু চাষে প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিতে আমার সাহস হয় না। এই রোগ উৎপত্তির কারণ কি? কি উপায়ে ইহা নিবারণ হইতে পারে? যাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছু জানেন, কৃপা করিয়া আমাকে জানাইলে, আমার এবং

সর্বসাধারণের মহৎ উপকার সাধিত হইবে।* চারা অবস্থায় (গাঁইট জন্মাইবার পূর্ব্বাবস্থায়) যে গাছ রোগাক্রান্ত হয় সেই গাছ আর বাড়িতে পারে না, পাতাগুলি প্রথমে হরিদ্রা বর্ণ হইয়া, পরে শুকাইতে থাকে, ৩।৪ দিনের মধ্যে গাছটি নষ্ট হইয়া যায়। কোন স্থানে ঝাড়ের একটিমাত্র গাছ, কোন স্থানে সমুদায় ঝাড়ই এরূপে নষ্ট হইয়া যায়। ক্রমশঃ রোগ ক্ষেত্রময় ব্যাপিয়া পড়ে। প্রত্যহ অনেক গাছ রোগাক্রান্ত হইয়া নষ্ট হইতে থাকে, ইক্ষু গাছে ২।১টি করিয়া গাঁইট হইলে যে গাছ রোগাক্রান্ত হয়, সেই গাছের পাতাগুলি ক্রমশঃ শুকাইতে থাকে, আর ইক্ষুদণ্ডের প্রত্যেক গাঁইট হইতে অনেক সাদা শিকড় বাহির হইয়া ক্রমে গাছটী পচিতে থাকে ; এরূপে ৭।৮ দিনের মধ্যে সমগ্র গাছটী নষ্ট হইয়া যায়। এই অবস্থায় প্রত্যহ অনেক আখ নষ্ট হইতে থাকে। রোগাক্রান্ত আখ কাটিয়া দেখিলে ভিতরে লালবর্ণ দেখা যায়। পরিপক্ক ইক্ষুদণ্ড রোগাক্রান্ত হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে তাহারও পাতা শুকাইয়া যায়, আর গাঁইট হইতে সাদা শিকড় বাহির হয় ; কিন্তু ৭।৮ দিনের মধ্যে নষ্ট হইয়া যায় না। রোগাক্রান্ত হইয়া ২৫।৩০ দিন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় থাকিয়া অবশেষে শুকাইয়া যায়।

শ্রীদেবেশ্বর গোস্বামী,

বরপথার ফারম, বাহুলীপার পোঃ আঃ, আসাম।

চিনি-কামরাঙ্গা।

(AVERRHOA CARAMBOLA.)

আমাদের দেশের লোকেরা কামরাঙ্গা ফলের নাম শুনিলে বোধ হয়, কুইনাইনকে স্মরণ করেন। এই ফল অতীব অম্ল এবং জ্বরের পরম মিত্র। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বালকেরা এই ফল খাইয়া দশ ঘণ্টার মধ্যে জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার উপদ্রবে যে স্থানের লোকেরা অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, সেস্থানে কামরাঙ্গা ফলের কল্যাণে দুই তিন ঘণ্টা মধ্যে জ্বরাসুরের দর্শনলাভ করা যায়। বাস্তবিক এই জন্যই কামরাঙ্গা ফল খাইতে অনেকে আপত্তি করেন। কিন্তু এই প্রস্তাবের শীর্ষ দেশে যে কামরাঙ্গা ফলের নামোল্লিখিত হইয়াছে, তাহা শর্করার ন্যায় মিষ্ট এবং ইহাতে আদৌ অম্লরস নাই।

* পরবর্ত্তী সংখ্যায় এই রোগের বিবরণ ও উহার প্রতিকার করিবার উপায় বিশেষরূপে লিখিত হইবে। (সম্পাদক)

ইহার এরূপ গুণ আছে বলিয়াই চিনি-কামরাঙ্গা নাম হইয়াছে। ফার্ম্মিণ্জার সাহেব তাঁহার প্রণীত "Manual of Gardening in India" নামক ইংরাজী গ্রন্থের ২৩৪ পৃষ্ঠায় এই ফলের উল্লেখ করিয়াছেন। কামরাঙ্গা বৃক্ষ সর্ব্বপ্রথমে মলকা দ্বীপে আবিষ্কৃত হয়। এ দেশে এখন প্রচুর পরিমাণে ইহা জন্মিতেছে। ইহার বৃক্ষ কখন কখন দ্বাবিংশ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয় এবং প্রচুর পরিমাণে ইহাতে ফল ধরে। ডাক্তারেরা বলেন, ইহার শাখায় ও পাতায় লজ্জাবতী-লতার গুণ আছে; ইহার ফুল আকারে ছোট।

সাধারণতঃ কামরাঙ্গা ফলের আকার যেমন হয়, চিনি-কামরাঙ্গা ফলের আকার তাহার অর্দ্ধেক; কিন্তু ঐরূপ সুন্দর হয় না। ইহাতে আদৌ অম্লত্ব নাই এবং খাইতে বড় সুমিষ্ট ও রসনাতৃপ্তিকর। এই গাছ প্রায় মাদা হইয়া থাকে, অর্থাৎ অন্য গাছের উপরে জন্মে।

দ্বাদশ মাসিক আঞ্জির ও পেয়ারা।

আঞ্জির ও পেয়ারা এই দুই শব্দ যাবনিক। মুসলমানেরা ভালবাসার জিনিসকে "পেয়ারা" কহিয়া থাকে; আঞ্জির শব্দের অর্থ "প্রভু"। একটী ফল স্নেহের আর একটী ফল শ্রদ্ধার জিনিস। উভয় ফলই সুস্বাদুজনক, মুখ-রোচক এবং উপাদেয়; উভয় ফলই যথেষ্ট পরিমাণে এ দেশে জন্মিয়া থাকে; এবং যত্ন ও উদ্যমে উভয় ফলই বঙ্গদেশে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। সংস্কৃত পারু শব্দকে অনেকে পেয়ারা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। মহাভারতে উত্তর গোগৃহ পথে পারুবতী ফলের বিবৃতি পাঠ করিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ইহাই পেয়ারা ফল। যাহা হউক, পেয়ারা যে, যাবনিক শব্দ, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পেয়ারা অপেক্ষা আঞ্জির খুব বড় হয় এবং আস্বাদেও শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়া থাকে। কাটোয়ায় বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রোৎসাহে যে, কৃষিপ্রদর্শনী মেলা হইত, তাহাতে আমরা একবার একটা অর্দ্ধ সের ওজনের আঞ্জির দেখিয়াছিলাম। পেয়ারা খুব বড় হয় না।

এ দেশে পেয়ারা গাছ অপরিমিত সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় পেয়ারা কিম্বা আঞ্জির গাছের রীতিমত আবাদ কোথাও হয় না। পেয়ারা-কাঠ, বিশেষ কোন প্রয়োজনে লাগে না; সুতরাং এই গাছের ফল খাওয়া ব্যতীত ইহাতে আর কোন উপকার দেখা যায় না। ফলের সংখ্যা এত অধিক

এবং তাহার মূল্য এত কম যে, তজ্জন্য পেয়ারাকে আদর করিতে কেহই চেষ্টা পায় না। একজন প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবিদ্ পণ্ডিত বলেন, ভাদ্র মাসে উত্তরপাড়ার নিকটে কোন প্রান্তরস্থিত একটা পেয়ারা গাছে তিনি গণনা করিয়া এক সহস্রেরও অধিক ফল দেখিয়াছিলেন। আঁজির এত বেশী ফলে না; জলে পেয়ারা এবং রৌদ্রে আঁজির নষ্ট হইয়া যায়।

পেয়ারা কিম্বা আঁজির গাছ তৈয়ার করিতে হইলে, বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হয় না। ইহার জন্য ভূমির পাইটের আবশ্যকতা নাই, কিম্বা কোন প্রকার দহরম মহরম নাই। কিন্তু তাহা হইলে, এই গাছে বারমাস ফল হয় না, ঋতু বিশেষে ফল ফলিয়া থাকে। আমরা এই প্রস্তাবে পাঠকদিগকে দেখাইব যে, চেষ্টা করিলে আঁজির এবং পেয়ারা গাছে সকল ঋতুতেই ফল ফলাইতে পারা যায়। এই প্রস্তাবে আমরা দ্বাদশমাসিক অর্থাৎ বারমেসে আঁজির ও পেয়ারার কথা বলিতেছি। ইহা কয়েক বার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল, অবশেষে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যতা লাভ করা গিয়াছে। একটা বোতলে বিশুদ্ধ স্পিরিট্ আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয় এবং খানিকটে শুষ্ক, শুভ্র, পরিষ্কার একটু কঠিন অথচ পাৎলা কাপড়ে পেয়ারা ও আঁজিরের বীজ একত্র মিশ্রিত করতঃ খুব শক্ত করিয়া বাঁধিবে; কাপড়ে বাঁধা হইলে তাহা স্পিরিট্ পূর্ণ বোতলের মধ্যে ফেলিয়া দিবে। কিছুদিন এইরূপে রাখা উচিত; কেবল একটু সাবধানতার সহিত দেখা কর্ত্তব্য—বোতলে যেন জল প্রবেশ না করে। ঐ বীজ বোতল মধ্যে এইরূপে এক মাস কাল রাখিয়া তাহা বাহির করিবে, তদনন্তর কোদালি দ্বারা মাটিকে উত্তমরূপে খনন করিয়া তাহাতে (গোমূত্র ও গোবিষ্ঠা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া) সার দিবে। যখন মাটি শুষ্ক হইয়া কঠিন হইয়া যাইবে, তখন পুনরায় কোদালিদ্বারা তাহা খনন করিয়া সরস করিতে হইবে। এই বারে বীজ ফেলিয়া দাও। এই স্থানে একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছি। প্রথমকার মাটি যখন শুষ্ক হইতে থাকিবে, তখন বীজগুলি বোতল হইতে বাহির করিয়া রৌদ্রে দিবে। দশ মিনিট কালের অধিক বীজগুলি রৌদ্রে রাখিবে না। দ্বিতীয়বারের মাটি প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন বীজগুলিকে ঐরূপে রৌদ্রে শুকাইবে। যখন বীজ ফেলিবে তখন আঁজির ও পেয়ারার বীজ পৃথক করিয়া পুঁতিবে না, এক সঙ্গে ফেলিয়া দিবে। বর্ষার প্রারম্ভেই বীজ ফেলা কর্ত্তব্য। এই বীজের গাছ বড় হইয়া ফলবান হইতে আরম্ভ হইলে, গাছের কতকগুলি শাখা (পল্লব সহিত) মধ্যে মধ্যে কাটিয়া

ফেলিয়া দিবে; সকল শাখা কাটিবে না; ফল পাকা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ফল পাড়িবে এবং তাহার বীজ পুনরায় ঐ প্রক্রিয়াবলম্বনে ভূমিতে বপন করিবে। এইবারের বীজে যে গাছ জন্মিবে, তাহাতে যদি একটু যত্ন প্রকাশ করিতে পার, তাহা হইলে এক গাছে পেয়ারা এবং আঁজির ফলিবে। ঋতুর বশবর্ত্তী না হইয়া বারমাস ইহাতে ফল ফলিতে থাকিবে। দশ বার বৎসর পর্য্যন্ত এই গাছ বাঁচিয়া থাকে; কিন্তু ফল অধিক হইবে না।

রঙ্গণ ও কলিকাপুষ্প।

এদেশীয় পুষ্প সকল দুই সংজ্ঞায় আখ্যাত, (১) সাময়িক বা ঋতুবর্ণ, এবং (২) সর্ব্বসাময়িক বা অনির্দ্দিষ্ট কালজ। যে সকল ফুল কেবল ঋতু বিশেষে বা প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ সুবিধামত জন্মগ্রহণ করে এবং নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যেই লীলা সম্বরণ করে, তাহা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। যে সকল পুষ্প এই শ্রেণীর ভুক্ত নহে, তাহা দ্বিতীয় সংজ্ঞায় অভিহিত। এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথম শ্রেণীর ফুল শুকাইয়া নষ্ট হইয়া গেলেও পর বর্ষে আবার সেই বৃক্ষে ফুল ধরিতে থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর পুষ্প শুষ্ক হইয়া মরিতে আরম্ভ করিলে, আর সেই লতা বা বৃক্ষে ফুল ধরেনা। এই শ্রেণীর ফুল শুকাইলেই বৃক্ষের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে জানিতে হইবে। রঙ্গণ ও কলিকাপুষ্প দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ইংরাজীতে উপরি উক্ত সংজ্ঞাদ্বয়ের নাম (১) Season flower এবং (২) evergreen। যে বৃক্ষ বহুকাল বাঁচে এবং সকল ঋতুতেই পুষ্প প্রসব করে, তাহাকেই এভারগৃণ বলা যাইতে পারে। রঙ্গণ ও কলিকা পুষ্পের গাছে বারমাসে, সকল ঋতুতে, সমভাবে, পর্য্যায়ক্রমে, ফুল ফুটে এবং এই গাছ বহুকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফল ফুল প্রদান পূর্ব্বক শেষে উদ্ভিদলীলা সম্বরণ করে। আমরা দেখিয়াছি রঙ্গণবৃক্ষ ৩৬ বর্ষ এবং কলিকাপুষ্পের বৃক্ষ ৩ পুরুষ পর্য্যন্ত বাঁচে। উভয় গাছেই ফল ধরে এবং সেই ফলে বীজ হয় কিন্তু উভয় বৃক্ষের ফলই বিষময়। রঙ্গণ গাছের বীজগুলি ঠিক ছোট ছোট লাল পুঁইমেচুড়ী, কুঁচ কিম্বা বঁইচ্ ফলের ন্যায় দেখায়, তাহার ভিতরে কালরঙ্গের বীজ থাকে। ফল পাকিলে অত্যন্ত তরল ও অত্যন্ত লাল হয়। কলিকাফল আকারে বড়, ওজনে কখন কখন ৩ তোলা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার ভিতরে

বাদামের ন্যায় বীজ হয়; বীজের আকার গঠন ও কাঠিন্য ঠিক তদ্রূপ। বৎসরের যে কোন সময়ে বীজ আজ্জাইলে চলিতে পারে। কলমে ও গাছ হইতে দেখা গিয়াছে কিন্তু তাহাতে বড় বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধ হয়। পাঠকেরা বোধ হয় জানেন, এদেশে দুইপ্রকার কলম করার প্রণালী প্রচলিত আছে, এক প্রকারের নাম Cutting (কটিং) এবং আর এক প্রকারের নাম Layering (লেয়ারিং) এই দুই বৃক্ষে লেয়ারিং কলমের প্রয়োজন হয় না। কলিকা ফুল দেখিতে ঠিক্ তামাকু খাইবার "কল্কে"র মত; মুসলমানেরা তজ্জন্য ইহাকে ঝিলাম্ গোল্ কহিয়া থাকে। পারস্য ভাষায় পুষ্পকে গোল্ কহে। প্রত্যেক ফুলে ৫টি করিয়া দল থাকে, তাহা এরূপ সুগোল ভাবে পর্য্যায় ক্রমে বিন্যস্ত যে ঠিক যেন ঝিলাম্‌টি ভালে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অধিকাংশ ফুল হরিদ্রাবর্ণ, কোন কোনটী ঈষৎ শ্বেতাভঃ। রঙ্গণপুষ্প ঘোর লালরঙ্গের ফুল এবং আকারে ঝিলাম্ গোল্ হইতে অনেক ছোট, ইহার পত্রদলের সংখ্যা ৪টি এবং তাহা চারিদিকে ছড়ান থাকে। পত্রদলের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে তাহার ভিতর লম্বাকৃতি একটি সুণ্ডায় মধুর সঞ্চার হয়। রঙ্গণফুলের গাছে পিপিলিকা ও মধুমক্ষিকা সদতই দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাছ উচ্চতায় ৫ হস্ত পর্য্যন্ত উঠে; মধ্যে মধ্যে কেয়ারি করিয়া দিলে আরও বাড়িতে পারে এবং তৎসঙ্গে বৃক্ষের অসীম শোভা হইতে থাকে। উভয় পুষ্পই বারমাস ফুটে। রঙ্গণফুলের উৎকৃষ্ট মালা হয় তাহাতে সুতার প্রয়োজন হয় না। ইহার মনোহর মালাকে (গড়ে) আদর করিয়া স্ত্রীলোকেরা "মোহন মালা" কেহবা "বিনা সুতার হার" (ওরফে মিনি সুতোর হার) কহিয়া থাকে।

গন্ধরাজ।*

(CAPE JASMINE.)

ইহা দেখিতে বড় সুন্দর উদ্ভিদ্; ছোট ছোট কণ্টক না থাকিলে আরও সুন্দর দেখাইত। ইহার পাতা গোলাকার এবং প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা। মার্চ্চ এবং এপ্রেল মাসে বড় বড় সুগন্ধ পরিপূর্ণ শ্বেতবর্ণের ফুল ফুটে; ফুলের আকার Camellia পুষ্পের সদৃশ। এই উদ্ভিদ্ ৮ ফিট্ উচ্চে উঠে; কিন্তু

* "Botanical Register" for 1846.

পেষণে আকার ছোট করা যায়, আবার ছাড়িয়া দিলে বা কাটিয়া দিলে পূর্ব্ববৎ বড় হয়। শুনা যায় চীনে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ফুল বড় বড় হইলে পুষ্পের পত্রদল বড় হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে গাছের পাতাও অত্যন্ত বড় হইয়া থাকে। পুষ্পের পরিধি দশ হইতে দ্বাদশ ফিট্ হইতে দেখা যায়।

কর্চিউইন্ সাহেব কলিকাতার এগ্রিকলচারাল সোসাইটির তত্ত্বাবধানে আলিপুরে ইহা একবার আজ্জাইয়াছিলেন। উদ্ভিদ্, চীন দেশ হইতে আনীত হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, গাছ অত্যন্ত লম্বা হয় নাই; কিন্তু পুষ্প অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চীন দেশজ গাছের ফুল হইতেও বড় হইয়াছিল। গন্ধরাজের ফুল যেমন সৌগন্ধ বিশিষ্ট তেমনি নয়নানন্দদায়ক। এই গাছ অনেক ঔষধে লাগে।

পিপুলের চাষ।

অলস-প্রকৃতি বাক্য-বাগীশ বাঙ্গালী কিছুরই তথ্য অনুসন্ধান করেন না। অনুসন্ধান করেন কেবল চাকুরীর। তৈলমর্দ্দন যাহাদের জাতীয় ব্যবসায়; যাহাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরাধীনতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা আবার স্বাধীনজীবি হইবার চেষ্টা করিবে কেন? প্রকৃতি আমাদের জন্য তাঁহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা অন্ধ, তাই তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাই না। এই যে "বনে-বাদাড়ে", "ঝড়ে-জঙ্গলে" পিপুলের লতা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার আবাদ করিলে যে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হয়, তাহার কি কোন খোঁজ খবর রাখেন? ঐ অযত্ন-সম্ভূত বন্যপিপুলের লতা সংগ্রহ করিয়া তদ্দারা উদ্যান প্রস্তুত করিলে তাহা হইতে যে, প্রচুর পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে, ইহা কয়জন বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে? বাঙ্গালী আমরা, আমাদের জাতিগত ব্যবসায় চাকুরী, আমরা তাহারই খোঁজ করিয়া বেড়াই; এতদ্ব্যতীত অন্য কোন খোঁজ খবরে আমাদের দরকার কি? দরকার নাই বলিয়াই আমাদের আজ এত দুর্দ্দশা।

আমাদের দেশের নিরক্ষর কৃষকেরাই চাষ আবাদ করিয়া জীবন যাপন করে। দেশের ভদ্রসন্তানগণের এই কার্য্যে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি নাই; এই জন্য দিন দিনই কৃষিকার্য্যের অবনতি হইতেছে। কৃষকেরা পুরুষপরম্পরাগত

আবহমান কাল হইতে যে প্রণালী অনুসারে চাষ আবাদ করিয়া আসিতেছে, বর্ত্তমান সময়েও ঠিক সেই সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া চাষ আবাদ করিয়া থাকে। নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া তাহারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম নহে। সুতরাং ক্রমশঃই আমাদের দেশে কৃষির অবনতি বই উন্নতি হইতেছে না। কৃষকেরা প্রায়ই নির্ধন, ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা অর্থাভাবে আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেনা। দেশের কৃতবিদ্য ভদ্রসন্তানগণ যদি কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে ইহার অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং তাঁহারাও ঘরে বসিয়া দুবেলা দুমুঠা অন্ন সংস্থান করিতে পারেন; তাহা হইলে চাকুরীর জন্ত লালায়িত হইয়া, অন্যের অধীনতা স্বীকার করিতে হয় না। কিন্তু আমাদের সে চেষ্টা কোথায়? পিপুলের চাষের বিষয় লিখিতে গিয়া এত আড়ম্বর ও ভূমিকার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে বলিয়াই আজ এত কথা বলিতে হইল। আজ না হ'ক, আর কিছু দিন পরে এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবে।

পিপুল নানাবিধ ঔষধে ব্যবহৃত হয় বলিয়া কলিকাতার বাজারে ইহা উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এমন কি কোন কোন সময়ে ১০০৲ টাকা করিয়া পিপুলের মণ বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে। অত্যন্ত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইলেও ইহার মণ ৪০৲ টাকার কম কখন বিক্রয় হয় না। রীতিমত বাগান প্রস্তুত করিয়া চাষ করিতে পারিলে প্রতি বিঘায় ৫⁄ মণ শুষ্ক পিপুল হইতে পারে। অন্ততঃ ৪০৲ টাকা করিয়া মণ বিক্রয় হইলেও এক বিঘার পিপুল হইতে বার্ষিক অন্যূন ২০০৲ টাকা আয় হওয়ার সম্ভাবনা। পিপুল যে কিরূপ লাভজনক কৃষি, তাহা কৃষিকার্য্যেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইহার চাষ করিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন। সকলস্থানে পিপুল চাষের পদ্ধতি প্রচলিত নাই। নদীয়া জেলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গা ও তন্নিকটবর্ত্তী মুন্সিদ্দিয়া প্রভৃতি স্থানের কোন কোন কৃষকে ইহার চাষ করিয়া বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

সচরাচর তিন জাতীয় পিপুল দেখিতে পাওয়া যায়। গজপিপুল, ঘোড়া-পিপুল ও সাচিপিপুল। গজপিপুল পাহাড়ের জঙ্গলে জন্মে। ইহার লতা খুব মোটা হয় এবং বড় বড় গাছ বাহিয়া উঠে, কেহ ইহার চাষ করেনা। গজ-পিপুলের লতার সহিত ঘোড়াপিপুল ও সাচিপিপুলের লতার কোন সাদৃশ্য নাই। ঘোড়া ও সাচিপিপুলের লতায় কোনই পার্থক্য লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু উহাদের ফল বিভিন্ন জাতীয়। ঘোড়াপিপুলের আকৃতি ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা এবং

দেখিতে পাটল বর্ণ। ইহার ফল জন্মিবার কিছুদিন পরে, লতা হইতে ঝরিয়া পড়ে অথবা পচিয়া যায়; সুতরাং ইহা আমাদের কোন প্রয়োজনে আইসেনা। সাচিপিপুল বড় হইলেও ২ ইঞ্চির অধিক লম্বা হয় না। ইহার ফল প্রথমাবস্থায় ধূসর বর্ণের হইয়া ক্রমশঃ হরিত বর্ণে পরিণত হয় এবং শুষ্ক হইলেও গাঢ় হরিত বর্ণ দেখা যায়। এই প্রবন্ধে সাচিপিপুলের চাষের বিবরণ উল্লেখ করা হইতেছে।

প্রথম চাষ করিবার পূর্ব্বে যেস্থানে অধিক পরিমাণে পিপুলের লতা আছে, তাহার ফল দেখিয়া সাচিপিপুলের লতা চিনিয়া রাখিতে হয়। (আষাঢ় মাসে ফল ধরে এবং পৌষ মাঘ মাসে ফল পাকে) তাহার পর জমি প্রস্তুত হইলে ঐ সমস্ত লতা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে রোপণ করিতে হয়। প্রথমেই ধান্যাদির মত বিস্তৃতরূপে চাষ করা যাইতে পারে না। কারণ ইহার বীজ হইতে গাছ (লতা) জন্মে না। লতা সংগ্রহ করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। লতাও সচরাচর একস্থানে অধিক পরিমাণে পাওয়া সুকঠিন। সুতরাং ক্রমশঃ ইহার আবাদ বৃদ্ধি করিতে হয়। একবার ক্ষেত্রে ইহার লতা জন্মাইতে পারিলে পরে উহার জন্য আর অন্য স্থানে খোঁজ করিতে হয় না। সেই লতার দ্বারাই অন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যায়। পিপুলের ক্ষেত্রকে "পিপুলের বাগান" বলে। এ স্থলে আমরাও "বাগান" বলিয়া উল্লেখ করিব।

যে স্থানে পিপল-বাগান করিতে হইবে, তাহার মাটী দো-আঁশ হওয়া আবশ্যক। বাগানের জমি উচ্চ হওয়া উচিত এবং সেই জমিতে, যাহাতে বৃষ্টির জল আট্‌কাইতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। পিপুল-বাগান প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে তাহার চতুর্পার্শ্বে ১ কি ১॥০ ফিট্ গভীর নালা কাটিয়া জমি চিহ্নিত করিয়া লইতে হইবে এবং তাহার উপর বেশ মজবুত করিয়া এরণ্ড কিম্বা চিতা গাছের বেড়া দিতে হইবে। সেই জমিতে যাহাতে গরু বাছুর প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার উপায় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তৎপরে পৌষ মাস হইতে লতা রোপণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, মাসের মধ্যে ৩।৪ বার করিয়া লাঙ্গল দিয়া ঐ জমি উত্তমরূপে চষিতে হয়। বাগানের জমি ন্যূণ কল্পে ১৫।১৬ অঙ্গুলি খনিত হওয়া আবশ্যক। পিপুলের জমিতে অত্যল্প পরিমাণে গোবরের সার দেওয়াও এক প্রকার মন্দ ব্যবস্থা নয়। অগ্রহায়ণ কিম্বা পৌষ মাসের মধ্যে এইরূপে বাগান প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। এই সময়েই নালার ধারে ধারে বেড়া দেওয়া উচিত।

পিপুললতার সহিত "ধঞ্চে" গাছের প্রণয় বড়ই বেশী। ধঞ্চে গাছের শীতল ছায়ায় পিপুললতা বেশ সতেজে জন্মিয়া থাকে এবং ঐ সমস্ত গাছ আশ্রয় করিয়া প্রচুর পরিমাণে ফলোৎপাদন করে। অতএব পিপুলচাষ করিবার পূর্ব্বে বাগানের মধ্যে ৫ হাত অন্তর এক একটী ধঞ্চের গাছ লাগান আবশ্যক। জমি প্রস্তুত হইলে ফাল্গুন মাসের প্রথমে ঐ জমিতে দীর্ঘ প্রস্থ সমানে ৪ হাত অন্তর ছোট ছোট "থানা" করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে ৩।৪টী করিয়া ধঞ্চের বীজ পুঁতিয়া দিয়া তাহার উপর একটু একটু জল দিলে আপনা আপনিই চারা জন্মে। ঐ চারাগুলি ৮।১০ অঙ্গুলি বড় হইলে অপেক্ষাকৃত সতেজ একটীমাত্র চারা রাখিয়া বাকীগুলি তুলিয়া দিতে হয়। পরে চৈত্র মাসের শেষে পিপুলের লতা সংগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের প্রথমেই সেই সমস্ত লতাগুলিকে ১৫।১৬ অঙ্গুলি পরিমিত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহার ৫।৬ গাছি লতা একত্র করতঃ "আঁটী" বাঁধিতে হয়। এইরূপ "আঁটী" বাঁধিবার সময় লতাস্থ গাঁইটগুলি যাহাতে উল্টা পাল্টা হইয়া না যায় এবং তাহা বিপরীতভাবে রোপিত না হয় এরূপ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। পরে সেই সমস্ত "আঁটী"গুলির গোড়ায় গোবরগোলা মাখাইয়া ঐ ধঞ্চে গাছের ফাঁকে ফাঁকে এক হাত অন্তর দীর্ঘ প্রস্থ সমানে সার করিয়া ৪।৫ অঙ্গুলি মাটীর নীচে খাড়াভাবে পুঁতিয়া যাইতে হয়। আঁটীগুলি পুঁতিবার পর বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহার গোড়ায় কিছু কিছু জল দেওয়া কর্ত্তব্য। আঁটীগুলি পুঁতিবার কিছুদিন পরে (জল না পাইলে) "আঁওরাইয়া" যায় শেষে বৃষ্টি হইলে "গজাইয়া" উঠে। কৃষকেরা সাধারণতঃ এই প্রণালী অনুসারে পিপুলের চাষ করিয়া থাকে। কিন্তু এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এবং সুপ্রণালীসিদ্ধ পিপুলচাষের বৃত্তান্ত নিম্নে বর্ণিত হইল। ইহাতে বিদ্যা বুদ্ধির বিশেষ কোন দরকার হয় না। কোন প্রকারে বাগানে লতা জন্মাইতে পারিলেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

লতা সংগ্রহ হইলে সেইগুলি কিছুদিন একস্থানে "জমা" করিয়া রাখিয়া, পরে তাহা হইতে বোঁটাসুদ্ধ পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয় এবং তদ্দ্বারা ৮।৯ অঙ্গুলি ব্যাস বিশিষ্ট ছোট ছোট "বেঁড়ো" পাকাইয়া অথবা ৯।১০ অঙ্গুলি পরিমিত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার এক হাত ব্যবধানে কিছু কিছু মাটী খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে মধ্যে এক একটী ঐ "বেঁড়ো" এবং খণ্ডীকৃত ৩।৪ গাছি লতা ২ আঙ্গুল মাটীর নীচে পুঁতিয়া দিতে হয়। ঐ সকল "বেঁড়োয়" এবং লতায় অন্ততঃ ৫।৬টী করিয়া গাঁইট থাকা আবশ্যক। এইরূপে লতা পুঁতিলে

কিছুদিন পরে উহা হইতে সতেজে পিপুলের চারা জন্মে। চারাগুলি কিছু বড় হইলে পর বাগানের সমুদায় জমি অল্প অল্প খুঁড়িয়া দিতে হয় এবং ইহার পর জমিতে ঘাস জন্মিলে তাহা নিড়াইয়া দিতে হয়, অন্য কোন যত্নের আবশ্যক করে না। চারাগুলি বড় হইয়া ক্রমে ক্রমে ধঞ্চে গাছ বাহিয়া উঠে এবং আষাঢ় মাসের শেষ হইতে ভাদ্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত ফল প্রদান করে। এই সময় লতা-গুলির মধ্যে মধ্যে "জাফ্‌রী" প্রস্তুত করিয়া দিলে তাহা ঐ "জাফ্‌রীর" গা বাহিয়া উঠিয়া আরও অধিক পরিমাণে ফলদান করিতে পারে। লতা বেশী ঘন হইলে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ লতাগুলি কাটিয়া ফেলিয়া তাহা পাত্‌লা করিয়া দিতে হয়।

ধঞ্চের গাছগুলি ৩।৪ মাসের হইলে বাগানে ছায়াদানের উপযুক্ত হয়। আবার ওদিকে পিপুলের লতা বাড়িয়া উঠিয়া সেই সমস্ত গাছ আশ্রয় করে। এই-জন্য পিপুলচাষে প্রথম বৎসর কিছুমাত্র লাভ হয় না। কেবল খরচ করাই সার হয়। কারণ বৈশাখ মাসে লতা পুঁতিয়া তাহা হইতে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ফল-প্রাপ্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। প্রথম বৎসর ধঞ্চে গাছ ও পিপুলের লতা বড় হইতেই ৪।৫ মাস সময় লাগে। সুতরাং লতা হইতে ফল জন্মিবার উপযুক্ত সময় অতীত হইয়া যায়। দ্বিতীয় বৎসর হইতে, পিপুল চাষে লাভ আরম্ভ হয়। যত্ন করিয়া রাখিলে ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত, পিপুলের বাগান রাখা যাইতে পারে। এই সময়ের মধ্যে লতা পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। ফল তুলিবার পর লতা-গুলির গোড়া কাটিয়া দিলে সেই গোড়া হইতে আপনাআপনি নূতন লতা গজাইয়া উঠে। ক্রমে বাগানের ধঞ্চে গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া গেলে নূতন গাছ লাগাইয়া পুরাতন গাছগুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। ৪।৫ বৎসর পরে ধঞ্চে গাছ বুড়া হইয়া যায় তখন তাহাতে বাগানের ছায়াদানের উপযুক্ত পাতা জন্মেনা।

আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত লতায় পিপুল ধরে এবং পৌষ মাসের প্রথমেই পাকিতে আরম্ভ হয়। একসঙ্গে সমস্ত পিপুল পরিপক্ক হয় না, অগ্র পশ্চাৎ হইয়া পাকিতে থাকে। অতএব এক দিনে অথবা এক সময়ে সমস্ত পিপুল উঠাইতে হয় না, ক্রমশঃ তুলিতে হয়। পিপুল তুলিবার সময় টান লাগিয়া লতাগুলি যাহাতে ছিঁড়িয়া না যায় এরূপ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। পিপুল পাকিতে আরম্ভ হইলে, তাহার মধ্য হইতে বীরপাক্ (সুপক্ক) পিপুলগুলি তুলিয়া তাহা রৌদ্রের উত্তাপে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। ১০।১২ দিন সম্যক্ রৌদ্র পাইলেই পিপুল শুকাইয়া যায়। অপক্ক পিপুল তুলিয়া শুষ্ক করিলে তাহা

চিম্‌সে হইয়া যায় এবং দানা বাঁধেনা। পিপুলের দানা না বাঁধিলে তাহা অত্যন্ত অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়।

পিপুল উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া তাহা কুলা দ্বারা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করতঃ বিক্রয়ার্থ বস্তাবন্দী করিয়া রাখিতে হয়। সুবিধামত দর পাইলে তখন তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলা উচিত।

অতিরিক্ত কথা—(১) কোন কোন স্থানে "ধঞ্চে" গাছের পরিবর্ত্তে পিপুল ক্ষেত্রে 'জন্তী' গাছ রোপণ করে, কিন্তু এ ব্যবস্থা তত ভাল নহে। কারণ ধঞ্চে গাছে অধিক পরিমাণে পাতা হয় না অধিকন্তু এক বৎসরের মধ্যেই উহা মরিয়া যায়। গাছে অধিক পাতা না হইলে ক্ষেত্রে ভালরূপ ছায়া হয় না সুতরাং লতাগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। লতা নিস্তেজ হইলে তাহাতে ভাল ফল ধরে না। (২) প্রথমাবস্থায় লতা নিস্তেজ হইতে দেখিলে তাহার উপর পাতলা পাতলা করিয়া পোয়াল চাপা দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে লতাগুলি সতেজ হইয়া উঠে। (৩) লতা তুলিয়া তাহা সদ্য সদ্যই ক্ষেত্রে রোপণ করাই সুব্যবস্থা। তুলিবার লতাগুলি বেশী দিন থাকিলে তাহা শুষ্ক হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা; শুষ্ক লতা রোপণ করিলে তাহাতে চারা জন্মে না। (৪) যে স্থানে পিপুল শুকাইতে হইবে তাহার চতুর্দ্দিকে ভাল করিয়া বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখা উচিত; নতুবা শিয়ালে সমস্ত পিপুল খাইয়া ফেলিবে।

শ্রীহরিপ্রসন্ন মৈত্র,

শিলচর।

লাহার চাষ।

১। লাহা কৃষি—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রেই লাহার চাষ চলিতে পারে। মুরশিদাবাদের ন্যায় বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানই বিলময় ও নদীসঙ্কুল। পলী, দোরসা এবং খেয়ার মাটী সকল প্রদেশেই আছে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতু যে, দেশে সমভাবে আবির্ভূত হয়, ভূমির অবস্থাও যে দেশে একরূপ, একই শস্যের বীজ সকল দেশে উৎপন্ন হইলে, কৃষকগণ চেষ্টা করিলে তাহা জন্মাইতে পারিবে না কেন?

২। লাহা বীজ—কুল গাছ হইতে লাহা উৎপন্ন হয়। সকল দেশেই "কুলের" আদর আছে, কিন্তু "কুলগাছের" আদর কেহই জানেন না। সচরাচর

কুল গাছের শাখা প্রশাখায় অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অতি সুন্দর রক্তবর্ণের এক প্রকার কীট দেখিতে পাওয়া যায়। উহাই "লাহা-কীট।"

বৎসরে দুইবার কুল ফলে। কুল হইবার পূর্ব্বে যখন গাছটী নূতন শাখা পল্লবে সুশোভিত হয়, তখন লাহা কীটসকল তাহাদের পুরাতন বাসস্থান ত্যাগ করিয়া নূতন শাখায় যাইয়া নূতন আবাস প্রস্তুত করে। এবং রক্তবর্ণ সুন্দর বাসার উপর সাদা ও কাল শেহালা (ছেদলা) বিস্তার করিয়া, মানুষের অজ্ঞ চক্ষুর অন্তরালে লুকায়িত থাকে। তাই উহাতে লাহা আছে বলিয়া কেহ অনুমান করিতে পারেন না। ছেদলাটি চাঁছিয়া দেখুন, তাহার নীচে রক্তবর্ণ আঠাময় লাহা। কুল ফলিয়া গেলে যখন শাখাগুলি স্থানে স্থানে বন্ধুর এবং শেহালাপূর্ণ হইয়া যায়, তখন চেষ্টা করিলে সকল কুলগাছ হইতেই লাহা এবং লাহা-বীজ সংগ্রহ হইতে পারে। কিন্তু যিনি কখনও এ বিষয়ে ব্রতী হয়েন নাই, আমোদজনক হইলেও, তাঁহার পক্ষে জীবিত কীটের আবাসস্থান এবং ঠিক লাহা অনুসন্ধান করিয়া লওয়া দুরূহ।

এই কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে, বীজপরীক্ষা এবং লাহা প্রস্তুত কৌশল; মুরশিদাবাদ, জঙ্গিপুর, আরঙ্গাবাদ অঞ্চলে যাইয়া উৎসাহশীল ব্যক্তিগণ শিক্ষা করিতে পারেন। উক্ত প্রদেশ হইতে লাহা-বীজ বাঁশের চোঙ্গায় করিয়া ১৫।২০ দিনের জন্য অন্যান্য স্থানে লইলেও তাহাতে বীজ নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। ছয় মাস কি এক বৎসরের জন্য এক জন লাহাকৃষিজ্ঞ কৃষক ৪।৫৲ টাকা বেতন স্বীকার করিলেই পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় এই কৃষির প্রচলন নিতান্ত সহজসাধ্য। উক্ত প্রদেশে লাহাবীজ বিক্রীত হইয়া থাকে।

এই কৃষিপ্রণালী অতি সহজ এবং যথেষ্ট লাভজনক; এই জন্য, ঐ জেলার কৃষকবর্গ পলী, দোরসা, পানী জমির আইলে এবং মধ্যে, ১০।১৫ হাত অন্তর এক একটি কুল গাছ যত্নসহকারে জন্মাইয়া থাকে। জমিদারগণও প্রত্যেক কুলগাছ ডাকসূত্রে পত্তন করিয়া বিশেষ আয় করিয়া থাকেন। কঠিন খেয়ার মাটিতেও ঐ দেশে যেখানে কুলগাছ সেই স্থানেই লাহা জন্মিয়া থাকে।

৩। কৃষি-প্রণালী—ভাদই কুল ফলিয়া গেলে, লাহা কর্ত্তিত গাছটি আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে যখন নূতন শাখা পল্লবে শোভিত হয়, তখন কৃষকবর্গ বীজশাখা তাহাতে বাঁধিয়া দেয়। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মাসের মধ্যেই লাহা-কীটের বাসানির্ম্মাণ শেষ হইয়া যায়। এই কালে কৃষকগণ সতর্কতার সহিত কোন গাছের বীজ কম হইল, কি মরিয়া গেল, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখে। বীজ কম হইলে

খা ঝরিয়া গেলে আবার বীজ-শাখা বাঁধিয়া দিতে হয়। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, এই তিন মাসের মধ্যেই লাহা উঠান শেষ হইয়া যায়। যখন শীত কালের কুল ফলিয়া যায়, এবং যখন কৃষকেরা উহাদের লাহা-পূর্ণ বাসা উত্তমরূপ হইয়াছে জানিতে পারে, তখন গাছ ও শাখা হইতে লাহা কর্ত্তন করিয়া, উপরের শেহালামিশ্রিত লাহা মধ্যম ও নীচের বিমিশ্র লালবর্ণের লাহা উত্তম করিয়া রাখে। তরল ও গাঢ় লাহা একত্র মিশ্রিত করিলেই লাহার দোষ দূর হয়। এইরূপে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে কার্য্যারম্ভ করিয়া অতিবর্ষণের পূর্ব্বেই, পুনরায় লাহার কার্য্য শেষ হইয়া থাকে।

কৃষকগণ লাহা বীজের জন্য পৃথক্ কুলগাছ রাখিয়া, লাহা জন্মাইবার জন্য কুলগাছগুলি (বৎসরে দুইবার লাহা উঠাইবার সময়) উত্তমরূপে ছাঁটিয়া দেয়। কারণ, গাছটী বন্ধ্যা রাখিতে পারিলে, তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র শাখা পল্লব জন্মে, এবং লাহা কচি কচি কুলপাতা খাইয়া পুষ্ট হয় ও সরস গাছ হইতে প্রচুর রস (আঠা) সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদের অধিকতর পুরু বাসা নির্ম্মাণ করিতে পারে।

৪। আয়-ব্যয়—প্রত্যেক কুল গাছে অন্তিকম ।৹ দশ সের হইতে ঊর্দ্ধ ৩।৹ সাড়ে তিন মণ পর্য্যন্ত লাহা প্রতি খন্দে জন্মিয়া থাকে। প্রতি মণ লাহা ১০৲ দশ টাকার কম কখনই বিক্রীত হয় না। বাজার অনুসারে ১৪।১৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেও দেখা যায়। ১৫।১৬৲ টাকা দরেই লাহা প্রায়শঃ বিক্রীত হয়।

যদি অনায়াসে ।৹ দশ সের লাহাও জন্মে, তাহা হইলে, অতি কম মূল্যেও, প্রত্যেক গাছে বৎসরে ৫৲ টাকা লাভ হয়, অন্তত ৫০ পঞ্চাশটি গাছে লাহা জন্মাইতে পারিলে, অতি কম লাহা হইলেও ২৫০৲ টাকার লাহা পাওয়া যায়। মুরশিদাবাদ হইতে একজন লাহাকৃষিদক্ষ কৃষক চাকর আনাইয়া রাখিলে, তাহার বেতন ৫৲ টাকা হিসাবে ৬০৲ টাকা, এবং লাহা-বীজ ৫০টী গাছের উপযুক্ত আনাইলে তাহার মূল্য ১০৲ দশ টাকার বেশী লাগে না। অবান্তরিক খরচ আরও ৩০৲ ত্রিশ টাকা বাদ দিলেও, ১৫০৲ দেড় শত টাকা লাভ থাকে। এরূপ লাভজনক কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে কেহ প্রয়াসী হইয়াছেন কি ?

যদি কেহ এই কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে চাহেন, আমার নিকট লিখিতে পারেন, আমি কৃষক ও বীজ আনাইবার উপায় করিয়া দিতে ও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। (প্রতিবাসী)

শ্রীমন্মথরঞ্জন চৌধুরী,
কাকিনা—রঙ্গপুর।

রোটিকা বৃক্ষ।

(BREAD FRUIT TREE.)

কলিকাতা ষ্টেট্‌শম্যান যন্ত্র হইতে প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান এগ্রিকল্‌চুরিষ্ট নামক কৃষিবিষয়ক একখানি ইংরাজি মাসিকপত্রে রোটিকা নামধেয় এক প্রকার অত্যদ্ভুত বৃক্ষের বিবৃতি প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা স্বচক্ষে এই বৃক্ষ কখন দেখি নাই কিম্বা এতদপূর্ব্বে ইহার কথা শ্রবণও করি নাই। ইহার কৌতূহলী বিবরণ আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমাদের মনে হইল, বিশ্বপতির বিশাল রাজ্যে বিচিত্র হইতেও বিচিত্রতর কত কোটি প্রকার যে পদার্থ আছে, তাহার সকল বিষয় জানিতে হইলে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলির শত সহস্রবার আবর্ত্তনের আবশ্যক। সূর্য্যের নিম্নে (পৃথিবীতে) যাহা আছে তাহারই সংখ্যা করা যায় না, অপরাংশের কথা বাহুল্য মাত্র। আমরা জানিলাম, এগ্রিকল্‌চুরিষ্ট পত্রের কোন লেখক রোটিকা বৃক্ষ স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং এই বৃক্ষের অস্তিত্ব বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকিতে পারে না। রোটিকা-বৃক্ষ আমেরিকা দেশজাত এক প্রকার তরু বিশেষ, তথাকার লোকেরা ইহাকে "রুটিফলের গাছ" বলিয়া আখ্যাত করে। এই বৃক্ষ ৭।৮ হস্ত উচ্চ হয় এবং ইহার শাখা প্রশাখা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। রোটিকা তরুর কৃষ্ণবর্ণের বড় বড় ফলের ভিতর ছোট ছোট গোলাকৃতি বীজ থাকে, সেগুলি ভূমিতে আজ্জাইতে হয়। বীজবপনের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া চারি বৎসর কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে, চারি বর্ষ পরে বৃক্ষ সুদীর্ঘ সতেজ এবং ফলবান হইয়া থাকে। এই বৃক্ষের পরমায়ু ৪০।৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত গণিত হয় এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফল প্রদান করিতে পারে; ফলগুলির আকারের কথা শুনিলে পাঠকগণ আশ্চর্য্য হইবেন। ফলগুলি ঠিক বৃহদাকার রুটির (Bread) মত এবং আস্বাদনও ঠিক তদ্রূপ। একটি ছোট গৃহস্থ একটি বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ঘরে বসিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। রোটিকা ফলের ওজন তিনপোয়া; রুটির যে পুষ্টিকারীতা গুণ আছে, ইহাতেও তাহা পাওয়া যায়। এই ফল কিঞ্চিৎকাল আগুনের তাপে রাখিয়া শর্করার সহিত খাইতে হয়, তাহা হইলে চাউল বা ময়দার আর প্রয়োজন থাকে না। গৃহস্থেরা কিঞ্চিৎ শর্করা, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ, কিঞ্চিৎ ফল মূল ও কিঞ্চিৎ আমিষভোজ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলে এই বৃক্ষের সাহায্যে বহুকাল পরম সুখে

উদর পোষণ করিতে সমর্থ হয়েন। এগৃকল্‌চুরিষ্ট পত্রের লেখক মহাশয়ের কথাটা আমাদের দেশের লোকের একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। এই দুর্ভিক্ষ-প্লাবিত দেশে গবর্মেণ্টের এ বিষয়টা কি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয় না?

বিহারে নীল।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশে প্রথম নীলের কার্য্যের সূত্রপাত হয়। বিগত শতবর্ষে এখানে অন্ততঃ ৪০০ কুঠি স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১০০ প্রায় সদর অর্থাৎ বড় কুঠি এবং ন্যূনাধিক ৩০০ ফাঁড়ি অর্থাৎ শাখা কুঠি, তাহা হইলে প্রত্যেক বড় কুঠির অধীনে গড়ে ৩টা করিয়া ছোট কুঠি আছে বলা যাইতে পারে। দাযুদপুর, সাপুর, ঢুলী, সরাইয়া, মতিপুর, কাঁটী, দেউরিয়া, আথয় প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কুঠি। বিহারে বৎসর বৎসর ৫০,০০০ হইতে ৬০,০০০ মণ নীল উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রত্যেক মণ গড়ে ২২৫৲ হইতে ২৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। পাঠক মহাশয় বুঝিয়া দেখুন বিহার হইতে বৎসরে কত টাকার নীল বিক্রয় হয়। কলিকাতাস্থ সওদাগর কিলবরণ কোং, বেগডন্‌লপ্, এণ্ডারসন্ রাইট, টমাস ও মোরাণ কোম্পানি এ অঞ্চলের কুঠি সমূহের এজেণ্ট বা মাহাজন; কুঠির কার্য্য এই সকল মাহাজনের টাকায় হইয়া থাকে। নীল প্রস্তুত হইলে কলিকাতায় প্রেরিত হয়, বিক্রীত টাকা হইতে মাহাজনের সুদ সমেত প্রাপ্য টাকা বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই কুঠির লাভ হইয়া থাকে।

নীলকুঠির সত্বাধিকারী অধিকাংশই ইংরেজ, স্থানে স্থানে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা প্রভৃতি দেশীয় ধনী লোকেরও কুঠি আছে। ইংরেজের কুঠির ত কথাই নাই। দেশীয় লোকের কুঠিতেও কার্য্য সম্পাদনের জন্য ইংরেজ ম্যানেজার আছেন। যে সকল জমীতে নীল উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে কতক সত্বাধিকারীর মিল-কিয়ৎ অর্থাৎ জমীদারী, কতক মকরোরী বা মৌরুসী, অবশিষ্ট মেয়াদী পাট্টার অধীন। প্রথমোক্ত দুই প্রকার অপেক্ষা শেষোক্ত প্রকারের জমীই অধিক; এমন অনেকও আছে যেখানে সমস্তই মেয়াদী পাট্টাভুক্ত। মালিকগণ (জমীদার) নীলকরদিগকে পাট্টা বন্দোবস্ত করিবার সময় পেসগী অর্থাৎ অগ্রিম টাকা পাইয়া থাকেন, সচরাচর ২।৩ বৎসরের খাজনা পেসগী দেওয়া হয়, অধিকন্তু নীলকরগণ খাজনার নিরিখও বেশী দিয়া থাকেন, এই সকল প্রলোভনেই মালিকগণ আগ্রহের সহিত কুঠিতে স্ব স্ব মিলকিয়ৎ অধিকদিন মেয়াদে পাট্টা

দিয়া থাকেন। কেবলমাত্র নীলোৎপাদনের জমী হইলেই কুঠি চলিতে পারে না, মাঠের জমীর যেমন আবশ্যক তেমনি সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী প্রজাপূর্ণ গ্রামও নিতান্ত প্রয়োজনীয় নতুবা কুঠির কার্য্য কখনই সম্পন্ন হয় না। ইহার প্রশস্ত বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

দুই প্রকার নিয়মে নীলের আবাদ হইয়া থাকে, জিরাত ও রায়তী। জিরাত শব্দে ক্ষেত্র (উর্দ্দু) কিন্তু কুঠিতে ইহা ইংরাজী শব্দের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জিরাত আবার দুই প্রকারে বিভক্ত; কুঠির চতুষ্পার্শ্বস্থ যে সকল জমী তাহার নাম কুঠি জিরাত, কুঠির হল বলদ প্রভৃতিতে তাহার কার্য্য হয়; কুঠি হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে যে সকল জমী, তাহার কার্য্যভার টোকদারদিগের উপর, টোকদারগণ কুঠির বেতনভোগী; তদ্ব্যতীত প্রতি বিঘায় ৪॥০ টাকা হিসাবে পায়। ইহাদিগের বেতন ২ বা ২॥০ টাকা; বিঘায় ৪॥০ টাকা খরচ হয় না, ইহার দরুণও ইহারা কিছু কিছু লাভ করে। বীজ ও বপনের ব্যয় কুঠির, বপনের পর হইতে কাটনী পর্য্যন্ত সমস্তই টোকদারদিগের তত্ত্বাবধারণের অধীন, বপনের পূর্ব্বে ক্ষেত্রও ইহাদিগকে বপনোপযোগী করিতে হয়। রায়তী নীলেরও দুই প্রকার বন্দোবস্ত আছে, ঠিকা ও খুসকী। কি ছোট কি বড় নীল কুঠির প্রজা হইলেই তাহাকে কিছু না কিছু নীল করিয়া দিতে হয়। এরূপ নিয়মে প্রত্যেক প্রজাকে প্রতি বিঘায় ৩ কাঠা হিসাবে নীল করিতে হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুঠির এক বিঘা জমী জোত করে তাহাকে ৩ কাঠা নীল করিয়া দিতে হয়, তাহার পারিশ্রমিক বিঘায় ১২৲ টাকা হিসাবে পাইয়া থাকে; কুঠির কেবল বীজ এবং বপনের ব্যয় মাত্র। কুঠির প্রজাই হউক বা অন্য জমীদারের প্রজাই হউক নিজের ইচ্ছামত ভিন্ন এলাকায় নীল করিলে তাহাকেই খুসকী নীল বলে, ইহার দরও প্রতি বিঘা ১২৲ টাকা, তবে পেসগী দেওয়া হইয়া থাকে. ঠিকার ন্যায় খুসকী নীলেরও বীজ এবং বপন কার্য্য কুঠি হইতে হইয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রকার জমীতেই নীল বপন হইতে পারে সর্ব্বাপেক্ষা দোরস মৃত্তিকাই নীলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কুঠির জমীদারী, মৌরসী বা মেয়াদী পাট্টাভুক্ত জমীর মধ্যে যাহা নীল জন্মাইবার উপযুক্ত নয় তাহাই প্রজাদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য পাটোয়ারী, গোমস্তা, তহশীলদার প্রভৃতি অনেক কর্ম্মচারী আছে। নীলের কার্য্যের পক্ষে জমীদারী একটী প্রধান অঙ্গ, ইহার সবিশেষ বিবরণ ক্রমশঃ বিবৃত হইবে।

নাগাকচু।

নাগাকচু একটী উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু তরকারী। গোলআলুর ন্যায় ইহার পুষ্টিকারিতা গুণ আছে এবং ইহা সর্ব্ববিধ ব্যঞ্জনে ব্যবহার করা যাইতে পারে। পার্ব্বতীয় প্রদেশে নাগা, কুকী ও লুসাই প্রভৃতি অসভ্য বন্যজাতিরা এই কচুর আবাদ করিয়া থাকে। খাদ্যাদির অভাব হইলে, ইহারা কেবল এই কচু খাইয়াই জীবনধারণ করিতে পারে। যত্নপূর্ব্বক আবাদ করিলে এই কচু সকল স্থানেই জন্মিতে পারে। কিন্তু পার্ব্বতীয় প্রদেশে যত বড় হয় অন্য স্থানে সেরূপ হয় না। পূর্ব্বোক্ত অসভ্য বন্যজাতিরা রীতিমত ইহার চাষ করে না, জঙ্গল কাটিয়া তাহা আগুন দিয়া পোড়াইয়া কতকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়া লয় ইহাকে "জুম" বলে। পরে সেই পরিষ্কৃত স্থানের (জুমের) মধ্যে অন্যান্য শস্যের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে নাগাকচুর গাছ পুঁতিয়া দেয়। রীতিমত আবাদ করিয়া নাগাকচুর চাস করিলে যে কোন স্থানেই হউক না কেন, প্রতি বিঘায় ১০০/ মণের অধিক কচু জন্মিতে পারে। জুমের মধ্যে আরও অধিক হওয়ার সম্ভাবনা, কারণ জুমের কচু যত বড় হয়, অন্য স্থানে তত বড় হয় না। এক একটী কচুর ওজন আধসের হইতে ১৫।১৬ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

নাগাকচুর মুখী হয় না "মুড়া" হয়। মুড়ার গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ২।৪টী মুখী থাকে তাহা দ্বারাও বীজ করা যাইতে পারে। কিন্তু মুড়ার গায় যে সমস্ত চোক থাকে তাহা হইতেই গাছ জন্মে সেই গাছ রোপণ করিলে কচু জন্মিয়া থাকে। বীজের জন্য ভাল দেখিয়া কচু রাখিয়া দিতে হয়। যেমন তেমন করিয়া রাখিয়া দিলে কচু পচিয়া যায় বীজ হয় না। বীজের জন্য যে সমস্ত কচু রাখিয়া দিতে হইবে, তাহা ঘরের মধ্যে শিকায় করিয়া ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। ক্রমশঃ ঐ কচুগুলি শুকাইয়া গিয়া তাহার চোক হইতে চারা বাহির হইতে থাকে। পরে উপযুক্ত সময়ে ঐ চারাগুলি ক্ষেত্রে রোপণ করিলে তাহা হইতে কচু জন্মে। সাধারণ কচু অপেক্ষা নাগাকচুর গাছগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর। ইহার পত্রগুলি পদ্মপত্রের ন্যায় পুরু হয়, কিন্তু তত গোল হয় না।

নাগা, কুকী, লুসাই প্রভৃতি বন্যজাতিরা যখন এই কচুর আবাদ করিয়া থাকে তখন ইহার নাম 'নাগাকচু" হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। বোধ হয় নাগাদের দ্বারাই প্রথমে ইহার আমদানী হইয়াছিল বলিয়া ইহার "নাগাকচু" নাম হইয়া থাকিবে। কচু অখাদ্য বলিয়া আমরা

কখন কখন "কচুপোড়া খাও" বলিয়া গালি দিয়া থাকি। কিন্তু নাগাকচু পোড়া খাইলে ঐ ভ্রান্তি দূরীভূত হইবে। নাগাকচু পোড়াইয়া খাইলে অতি সুস্বাদু বোধ হয়, তাহাতে একটু একটু "সোঁদা" "সোঁদা" গন্ধ বাহির হয় এবং খাইতেও বেশ মিষ্ট লাগে। পূর্ব্বোক্ত অসভ্য বন্যজাতিরা অতি উপাদেয় সামগ্রী বলিয়া প্রায়ই কচুপোড়া খাইয়া থাকে। এ দেশে সচরাচর এই কচুর মণ ১।০ করিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে; অন্যান্য স্থানে বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলে আরও বেশী দরে মণ বিক্রয় হইলেও এক বিঘা কচুর আবাদ করিলে তাহা হইতে বৎসর ১৫০৲ টাকা আয় হইতে পারে।

জুমের মধ্যে কচু রোপণ করিলে কোন রূপ পাইট করিতে হয় না; গাছ পুঁতিয়া দিলে তাহা নিজে বড় হইয়া কচু জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ স্থানে এই কচুর আবাদ করিতে হইলে উত্তমরূপে জমি কোদলাইয়া সেই জমিতে বারম্বার লাঙ্গল দিয়া তাহা ধুলার মত করিতে হইবে। পরিশেষে চৈত্র কি বৈশাখ মাসে ঐ জমিতে এক হাত অন্তর এক একটী চারা পুঁতিয়া দিতে হয়। গাছগুলি একটু বড় হইলে তাহাদের গোড়ায় কিছু কিছু মাটি উঠাইয়া দিলে বড়ই ভাল হয়। কচুগাছে মুড়া বাঁধিতে আরম্ভ করিলে তাহার গাত্র-সংলগ্ন পচা পাতাগুলি বাছিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। জমিতে সার দেওয়ার তত আবশ্যক নাই, তবে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কিছু কিছু ছাই দিতে পারিলে কচুগুলি অপেক্ষাকৃত কিছু বড় হয়। মাঘমাসের প্রথমে কচুগুলির সমস্ত পাতা শুকাইবার পূর্ব্বে কচু উঠাইলে তাহা অধিক দিন থাকে না সত্বরে পচিয়া যায়।

শ্রীহরিপ্রসন্ন মৈত্র,
শিলচর।

ডার্লিংটোনিয়া।*

(DARLINGTONIA)

ইহা সারাশিনিয়া নামক লতার তুলনায় এক পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা নহে, ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের লতাবিশেষ। সারাশিনিয়া যে স্থানে আদৌ জন্মগ্রহণ করিতে পারে না, ডার্লিংটোনিয়া তথায় অবলীলাক্রমে নিজ

* এই প্রস্তাবটি ১৮৮৪ খৃঃ অব্দের ২২এ নবেম্বর তারিখের "Indian Agriculturist" হইতে সংগৃহীত হইল।

দেহের পুষ্টিসাধন করিতে পারে। কালিফোর্ণিয়ার শিরানেবেদা নামক গিরির ৫ সহস্র ফিট্ উচ্চে ইহা জন্মিয়া থাকে। এই লতার কিশোরাবস্থা একপ্রকার এবং প্রবীণাবস্থা অন্য প্রকারের। প্রবীণাবস্থায় ইহা অত্যন্ত উগ্র, বলিষ্ঠ ও বিস্তৃতাকার হইয়া থাকে। ইহার ফুলের ও পত্রদলের বর্ণ এক প্রকার। পত্রের আকার ঠিক কলসের বা কুজোর মুখের মত। পত্রদলের ভিতরে আঠাবৎ তরল পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে মাখান থাকে, এবং ঐ আঠার গন্ধ বড় উত্তম। কীটকুল সুগন্ধে মোহিত হইয়া উহার ভিতরে প্রবেশ করিলেই, পাতার মুখ বন্ধ হইয়া যায় এবং অতি তেজে ঐ পাতা ঐ পোকাকে পেষণ করিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে। এই জন্য ইহার নাম Carnivorous plant বা মাংসাশী লতা; ইহার বৃত্তান্ত অদ্ভুত; প্রতিদিন অসংখ্য অসংখ্য কীট ইহার উদরসাৎ হইয়া থাকে। আফ্রিকায় এই লতা প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং এই জাতীয় লতার প্রায় একবিংশ প্রকারের বৃত্তান্ত আচার্য্য ডারউইন তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

মক্কা বা ভূট্টা (MAIZE.)
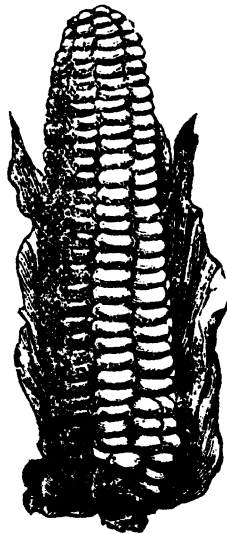
আমেরিকার মানবগণের ব্যবহারোপযোগী যত প্রকার শস্য আছে; তন্মধ্যে ভূট্টা প্রধান। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীবৃন্দ অত্যন্ত ভূট্টা প্রিয়।

মার্কিণদেশজাত ভূট্টা অনেক প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই অসংখ্য প্রকার ভূট্টা একজাতীয় শস্য হইতে বিভিন্ন প্রকার আকার ধারণ করিয়াছে কি না তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। দেশভেদে, মৃত্তিকাভেদে, জল-বায়ুর প্রভেদে কিম্বা চাষ আবাদের বিভিন্নতায়ও একজাতীয় আদিম শস্যকে বিভিন্ন প্রকারে রূপান্তরিত হইতে দেখা যায়। পেরু এবং মেক্সিকোর প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন যে, ইহা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে প্রথম ইয়ুরোপীয় নাবিকগণের দ্বারা আনীত হইয়াছিল এবং সেই অবধিই ইহার আবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। অনেকে বলেন এসিয়া ইহার আদিম জন্মস্থান, কিন্তু এ বিষয় কোনও প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমেরিকার প্যারাগুয়ে নামক স্থানে ইহা বন্যভাবে জন্মিয়া থাকে; কিন্তু বন্যজাতীয় ভূট্টার দানা সকল একপ্রকার আবরণের মধ্যে থাকে, যেমন ধান্যের খোসা ছাড়াইয়া শস্য বাহির করিয়া লইতে হয় ইহারও তদ্রূপ; তবে ঐ বন্য-জাত শস্য সকল আবাদ করিলে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া অবিকল ক্ষেত্র-জাত শস্যের ন্যায় হইয়া থাকে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে আমেরিকাই ইহার জন্মস্থান; যেহেতু উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ আদিম অধিবাসীরা উহার আবাদ করিয়া থাকে এবং ইহাই তাহাদের 'প্রধান খাদ্য বলিয়া ইহাকে Indian corn বলে।

পেরুর অন্তঃপাতী অ্যারিকুইপা নামক স্থানে কোন একটী কবরে মৃত ব্যক্তির সহিত মৃত্তিকাপাত্রে রক্ষিত একটী ভূট্টা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ ভূট্টায় ১৩ সের দানা পাওয়া গিয়াছিল। ভূট্টাটীর কতকাংশ ভাঙ্গিয়া যাইয়া ৪॥• ইঞ্চি পরিমিত ছিল। উহাকে স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়মে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা হইয়াছে। একদা একজন ডাক্তার অ্যারিজোনা নামক স্থানের কোনও পর্ব্বতগুহায় কতকগুলি ভূট্টা পাইয়াছিলেন; তাহারও দুইটী উক্ত মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ঐতিহাসিকতত্ত্বে আরও দেখা যায় যে, কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন তিনি কিউবা নগরে পদার্পণ করিয়াই তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে মকার বিস্তৃত আবাদ করিতে দেখিয়াছিলেন।

পিল্‌গ্রিমস্ ফাদারগণ যখন প্লিমাউথে প্রথম উপস্থিত হন, তখন তাঁহারাও ইণ্ডিয়ানগণকে ইহার আবাদ করিতে দেখিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই অনুমান

হইতেছে যে, পূর্ব্বকাল হইতেই দক্ষিণ আমেরিকায় ইহার আবাদের প্রচলন ছিল।

সমগ্র পৃথিবী অন্বেষণ করিলে ভূট্টাকে ধান্যের পরেই স্থান দেওয়া যায়। যেহেতু নূতন মহাদেশে উত্তরে কানেডা হইতে দক্ষিণে প্যাটাগোনিয়া পর্য্যন্ত, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, স্পেন, পর্টুগাল, ফরাসী সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশে, ইটালি, ভূমধ্যসাগরস্থ উপকূল সকলে, হঙ্গেরি, তুরুস্ক, গ্রীস, এসিয়ামাইনর, পারস্য, মধ্যএসিয়া, ভারতবর্ষ, চীন, সিংহল প্রভৃতি ভারত-সাগরস্থ সমস্ত দ্বীপে ইহার বিস্তৃতরূপে আবাদ হইয়া থাকে।

ভূট্টা সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান (Tropical Climate) দেশেই নিম্নভূমিতে জন্মিয়া থাকে। অনেকে সমুদ্রগর্ভ হইতে ৯০০০ ফিট্ উচ্চ ভূমিতেও ভূট্টার আবাদ দেখিয়াছেন। ধান্য যেমন কেবল উত্তাপ ভিন্ন শীত সহ্য করিতে পারেনা এবং এক ঋতুতে একটীবার মাত্র ফল প্রদান করিয়াই মরিয়া যায়; ভূট্টা সেরূপ নয়। ভূট্টা শীত গ্রীষ্ম উভয়ই সহ্য করিতে পারে। কিন্তু সহ্য করিতে পারে বলিয়াই উচ্চ অক্ষাংশের শীতলতা সহ্য করিতে সক্ষম হয় না। ভূট্টা এক ঋতুতে তিনবার ফল প্রদান করে। অধ্যাপক এমিল উল্ফ্ ভূট্টার মিশ্র পদার্থের দুইটী বিশ্লেষণ করিয়া ছিলেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

ভূট্টার শস্যে যে যে পদার্থ আছে—

নাম	১ নং	২ নং
জল	১৪.৪	৯.০
ছাই	২.১	১.২২
অ্যালবিউমিনিয়স্	১০.০	১০.০০
(ডিম্বের শ্বেতাংশ)	......	০০
কার্ব্বো হাইড্রেট	৬৮.০	৭১.৪০
আঁশ	৫.৫	৩.৪০
চর্ব্বি প্রভৃতি	৭.৯	৪.৯৮

ভূট্টার দানার আবরণে যে যে পদার্থ আছে—

পটাশ	২৮.৩৭	......
সোডা	১.৭৪	......
লবণ	আভাসমাত্র	......

চূণ	০.৫৭	...
অক্সাইড অফ্ আয়রণ	০.৪৭	...
ম্যাগ্নিসিয়া	১৩.৬০	...
সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড	......	আভাসমাত্র
ফস্‌ফরিক্ ঐ	৫৩.৬৯	...
বালুকা	......	১.৫৫

ভুট্টার পাতা ও ডাঁটায় যে যে পদার্থ আছে—

পটাস	......	৩৫.২৬
সোডা	......	১.১৪
লবণ	......	২.২৯
চূণ	......	১০.৫৩
ম্যাগ্নিসিয়া	......	৫.৫২
অক্সাইড অফ্ আয়রণ	......	২.২৮
সল্‌ফিউরিক্ অ্যাসিড	......	৫.১৬
ফস্‌ফরিক্ ঐ	......	৮.০৯
কার্ব্বনিক্ ঐ	......	২.৮৭
বালুকা	......	২৭.৯৮

গমে যে সকল পুষ্টিকর পদার্থ আছে তাহার অধিকাংশই ভুট্টায় পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ প্রাণীগণের প্রাণধারণার্থ যে সমুদয় দ্রব্যের আবশ্যক ভুট্টাতে তৎসমুদয়ই আছে। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের মধ্যে গম যেরূপ, আমেরিকায় ভুট্টা সেরূপ আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভুট্টার ময়দা যে বিলক্ষণ পুষ্টিকর তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পিণ্ট সাহেবের মতে অর্দ্ধেক গম ও অর্দ্ধেক ভুট্টা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইটালি, টুরিণ ও মিলান্ প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীগণ এইরূপে মিশ্রিত ময়দার রুটী ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইদানীং আমাদের দেশে গমের সহিত ভুট্টা মিশ্রিত করিয়া ময়দা প্রস্তুত হইতেছে। রয়েল পার্ক ফারমের অধ্যক্ষ লেলুর সাহেব বলেন যে, অষ্টাদশ লুই ও ওয়াশিংটন প্রভৃতি অনেক রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা ভুট্টার ময়দা ব্যবহার করিতেন। ডাক্তার এণ্ড্রিয়া হাঁসপাতালে রোগীগণকে ভুট্টার ময়দার রুটী খাওয়াইবার

ব্যবস্থা করিয়াগিয়াছেন। অধ্যাপক ইউভেলার 'একাডেমি অফ্ মেডিসিন' নামক সভায় ভুট্টার গুণাগুণ সম্বন্ধে একখানি বিস্তৃত বিজ্ঞাপন প্রদান করিয়াছিলেন, বাহুল্য বোধে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল না।

যাহা হউক ভুট্টা নানা প্রকারে আমাদের ব্যবহারে আসে। পৃথিবীর বার-আনা লোকে ইহা পরম উপাদেয় খাদ্য বলিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। অশ্ব, গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগণ ইহার গাছ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ দুগ্ধবতী গাভীকে ইহার গাছ খাওয়াইলে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীগণ ভুট্টা হইতে একপ্রকার পুষ্টিকর মদ প্রস্তুত করে, যাহা তাহারা পোর্ট ওয়াইনের পরিবর্তে ব্যবহার করে। কাঁচা মক্কা কলাইশুঁটীর ন্যায় অনেকে রন্ধন করিয়া খাইয়া থাকেন। বিশেষতঃ ইয়ুরোপ ও আমেরিকার লোকেরা পরম আদরের সহিত সুখাদ্য বোধে রন্ধন করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের হিন্দুস্থানীগণকে অনেকে কচি মক্কা পোড়াইয়া খাইতে দেখিয়া থাকিবেন। তাহারা উহাকে এত উপাদেয় বোধ করে যে, দুই পয়সায় একটী দগ্ধ মক্কা ক্রয় করিতে বিরত হয় না। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার লোকেরা অপক্ক ভুট্টার দানা দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ মাখনে ভাজিয়া লইয়া তাহা কিঞ্চিৎ গোলমরিচের গুঁড়া ও লবণ সহযোগে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ভুট্টার খোসা হইতে (যাহাদ্বারা উহারা আবৃত থাকে) জর্ম্মনী, অষ্ট্রীয়া এবং হঙ্গেরি প্রভৃতি অনেক দেশে একপ্রকার কাগজ প্রস্তুত হয়। এই কাগজে উৎকৃষ্ট ব্যাঙ্ক-নোট পেপার ও এন্‌ভেলাপ্ প্রস্তুত হইয়া আমাদের দেশে আমদানি হইয়া থাকে। ইহা দেখিতে ঈষৎ হরিদ্রাভ এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে যত প্রকার ভুট্টা আছে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন প্রদর্শনীতে ২০০ দুইশত প্রকারের ভুট্টা প্রদর্শিত হইয়াছিল। ভুট্টার আকৃতি গঠন ও বিভিন্নরূপ দানার পার্থক্য অনুসারে বিভিন্নরূপে বর্ণিত হয়। ইহাদের বীজরোপণ ও পাকিবার সময়ানুসারেও জাতীয় বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সচরাচর যত প্রকার সুমিষ্ট মক্কা দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে ক্রসবি (Crosby), ক'রি (Cory), ইয়েলোপপ্ (Yellow Pop), ডেণ্ট (Dent), হিকরি কিং (Hickory King), ব্রুম (Broom), কাফির (Kaffir), জেপানী (Japanese), রুবী (Ruby) জিগ্‌জাগ্ (Zig Zag), মেক্সিকান (Mexican) স্কোয়ানটম্ (Squantum) প্রভৃতি প্রধান।

কুজো মেজ নামক একপ্রকার ভূট্টা আছে ; তাহার ডাঁটা হইতে ইক্ষুর ন্যায় গুড় হইয়া থাকে। কর্ণেল চেম্বারলেন বিহিয়ার চিনির কলে ৮॥০ মণ কুজো ভূট্টার ডাঁটা পাঠাইয়া ১৫ সের গুড় প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। ১৮৭৫ সালে ভারত গবর্মেণ্ট ১৫সের কুজো ভূট্টার বীজ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরীক্ষার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত বীজ সকল Agricultural and Horticultural Society কর্ত্তৃক পঞ্জাব, উত্তর পশ্চীম প্রদেশ, মধ্যভারত, ত্রিহুত, বিহার ও বাঙ্গালার ৬০ জন প্রার্থীকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ফলতঃ সর্ব্বত্রেই সমান ফল পাওয়া গিয়াছিল। কোন স্থানেও ফল ফলে নাই কেবল গাছ হইয়া তাহাতে ফুল ধরিয়াছিল মাত্র ; দানা উৎপন্ন হইতে দেখা যায় নাই। কথিত আছে ইহা হিমালয় প্রদেশে কাশ্মীর অঞ্চলে উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে।

ভূট্টা যে কেবল মানবগণই ভক্ষণ করিয়া থাকে তাহা নহে। অশ্বাদির আহারের সহিত ভূট্টা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইয়ুরোপে প্রতিবৎসর আমেরিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে ইহা আমদানী করা হইয়া থাকে। ১৮৭০ হইতে ১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত এই নয় বৎসরের আমদানীর তালিকা দেখিয়া জানিতে পারা যায় যে, প্রতি বৎসর গড়ে ৪,০ ৬,০ ৬, ৮৩৮ বুশেল* করিয়া ভূট্টা আমেরিকা হইতে কেবল ইয়ুরোপে রপ্তানি হইয়াছিল।

আমাদের দেশে মক্কা বেশ জন্মাইয়া থাকে এবং আমরা ইচ্ছা করিলে যে, এই মক্কার ব্যবসায়ে আমেরিকার সহিত প্রতিযোগীতা দেখাইতে পারি সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের উদাসীন শিক্ষীত যুবকগণ সামান্য চাকরীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া এরূপ কৃষিকার্য্যদ্বারা স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বনে চেষ্টা করিবেন কি ?

আদ্র উর্ব্বরা ক্ষারযুক্ত দোয়াস মাটিতেই ভূট্টা জন্মিয়া থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলেই ভূট্টার বীজ বপনের প্রশস্ত সময়। অর্থাৎ পাট বপনের সময়ই ভূট্টা বপন করিতে হয়। মাঘ ফাল্গুণ মাসে বৃষ্টি হইয়া যাইলেই জমিতে রীতিমত চাষ দিতে হইবে এবং চৈত্র মাসের শেষাশেষি কিম্বা বৈশাখ মাসের প্রথমেই বারি পতন আরম্ভ হইলেই ভূট্টার বীজ বপন করিয়া তাহার উপর একবার ভাসা ভাসা চাষ দিয়া মৈ টানিতে হইবে।

বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারাগুলি ৪।৫ অঙ্গুলি বড় হইলেই ক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া গাছগুলি ফাঁকা করিয়া দিবে। অর্থাৎ ঘন হইলে চতুস্পার্শ্বের কতক-

* এক বুশেলে প্রায় ২৮ সের।

গুলি চারা উৎপাটন করিয়া দিতে হইবে। কেননা ফাঁকা না হইলে ভাল ফলিবে না। প্রত্যেক গাছটীর চারিদিকে এক হাত পরিসর থাকিলেই যথেষ্ট। এক্ষণে ক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে কেবল নিড়াইয়া দিতে হইবে। আষাঢ় মাসে ভূট্টার ফল ধরিতে আরম্ভ হয় এবং শ্রাবণ ভাদ্র মাসে পাকিয়া থাকে। ভূট্টা পাকিলেই উহা বৃক্ষ হইতে তুলিয়া লইয়া ৮।১০ দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে নচেৎ পচিয়া যাইবে।

আমাদের দেশে সচরাচর প্রতি বিঘায় ১৫।১৬ মণ ভূট্টা জন্মিয়া থাকে। আমরা ভূট্টার যত্ন করি না বলিয়াই আমাদের দেশীয় মকার দানা আমেরিকার দানা হইতে ছোট। এ দেশজাত ৪টী দানা একত্র করিলে আমেরিকার একটী দানার সমান হইয়া থাকে; ইহার কারণ আর কিছুই নহে অর্থাৎ আমরা ভূট্টার জমিতে সার ব্যবহার করি না ও ক্ষেত্রে তত যত্ন করি না। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে আমেরিকার বীজ ছাই ও অস্থিচূর্ণ সারের সহযোগে আমেরিকার দানা অপেক্ষা বৃহৎ হইয়াছে। সুতরাং বেশ দেখা যাইতেছে যে যত্ন ও চেষ্টা করিলে আমরা আমেরিকার সহিত ভূট্টার আবাদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা দেখাইতে পারি।

শ্রীহরিদাস ঘোষ।

বোশিয়া পুষ্প।

(BEAUTIA FLOWER.)

"নিবাস নির্ণয় নাই যথা তথা থাকি।
কোন জাতি বজাতে জগতে নাহি বাকি॥" ঘনরাম।

ফরাসী ও আমেরিকা দেশে পুষ্পের আদর অত্যন্ত অধিক। তত্রত্য সৌখীন পুরুষ এবং বিলাসিনী রমণীরা পুষ্প সঙ্গে না লইয়া পথভ্রমণ করিলে শরীরকে অপবিত্র বলিয়া মনে করে। ফলতঃ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে পক্ষী, পুষ্প, প্রশস্ত-সৌধ, পরিচ্ছদ-বেশভূষা ও পরিষ্কারতা বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে পাখী ও পুষ্প যেমন সুন্দর, বোধ হয় তদ্রূপ আর কিছুই নহে। পুষ্পতত্ত্বের আলোচনায় নিত্য নিত্য নব নব সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া মন প্রাণ মোহিত হইয়া যায়, সদত সৌগন্ধ আঘ্রাণে নাসিকার তৃপ্তি সাধিত হয়

এবং মস্তিষ্ক ও সর্ব্বশরীর শীতল থাকে। যাঁহার গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া এই প্রস্তাব লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি, তিনি বলেন পুষ্পের পরিষ্কারতা, বিবিধ প্রকার বর্ণ, দেবদুর্লভ-সৌগন্ধ এবং মনোহারিণী শোভার বিষয় চিন্তা করিলে প্রকৃত ভাবুকের হৃদয় হরিভক্তি-রসে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে। বাস্তবিক, জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিবার পক্ষে পুষ্পতত্ত্বালোচনা যেরূপ প্রসস্ত বোধ করি তেমন আর কিছুই নহে। এই জন্যই সকল শাস্ত্রে পুষ্পের প্রতি সমাদর করা ও যত্ন প্রদর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। হিন্দু মনীষীগণ পুষ্প দিয়া দেবতার সাধনা করিতেন, মুসলমান সাধুরা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমারোহ স্থলে পুষ্পের ভর্কুমা সাজাইতেন, য়িহুদীরা মন্দিরের চূড়ায় পুষ্পের মালা ঝোলাইয়া দিতেন এবং খৃষ্টানেরা সর্ব্বাঙ্গ পুষ্পে সুশোভিত করিয়া গির্জ্জাভিমুখে উপাসনা করিবার জন্য গমন করিতেন। শ্রাদ্ধ, বিবাহ, সমিতি, উৎসব এ সকলে পুষ্প না থাকিলে শোভা পায়না, এমন কি পলিনেশীয় পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে যে, "যুবতীর শয্যা-পার্শ্বে পুষ্প রক্ষা না করিলে সে স্থানে প্রণয়-দেবতা আসেন না" মহাভারতের কুন্তোপাখ্যানে লিখিত আছে, "উর্ব্বরা সুন্দরীর উপাধানে পুষ্প রক্ষিত হয় নাই বলিয়া মদন তথায় গমন করেন নাই এবং সেইজন্য তাঁহার পতির সহিত অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মনোমালিন্য ছিল।" যাহা হউক মনুষ্যের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পতত্ত্বে মনোনিবেশ করা উচিত। সৌগন্ধ ও স্বরূপ ব্যতীত পুষ্পের নিকট হইতে আর একটী মহৎ বিষয় শিক্ষা করিবার আছে। পাঠকেরা জানেন, পুষ্প নিজে আপনার গন্ধ আপনি জানে না এবং সেই গন্ধ দ্বারা তাহার নিজের কোন উপকার সাধিত হয় না, বরং সেই সুগন্ধ জন্য লোকে তাহাকে অকালে বৃন্তচ্যুত করে ও যথা তথা ফেলিয়া দেয়; কিন্তু তাহার কি উচ্চ স্বার্থ-ত্যাগ, কি উচ্চ নিঃস্বার্থপরায়ণতা কি মহদাদর্শনীয় আত্মোৎসর্গ, পুষ্পগুলি নিজের সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া অপরের মনোরঞ্জন করে এবং পরের সুখের জন্যই ফুটিয়া থাকে। ফুলের নিকট আমাদিগের শিক্ষা করিবার অনেক আছে।

বোসিয়া আমেরিকা দেশজাত অন্যতম পুষ্প। প্রাচীন আমেরিকার মহা-সংগ্রাম সময়ে স্পেনবীরেরা এই পুষ্প সর্ব্বপ্রথমে সংগ্রহ করেন এবং ইহার শোভা ও সৌগন্ধে মোহিত হয়েন। বোসিয়াফুল নদ, নদী, পর্ব্বত, সাগর, বন, মাঠ, গৃহ প্রাঙ্গণ প্রভৃতি সকল স্থানে ফুটে—সুতরাং ইহার নিবাসের নির্ণয় করা যাইতে পারে না। সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে ফুটে বলিয়া আমেরিকার সকল জাতির লোকেরা ইহাকে সমাদরে ব্যবহার করিয়া থাকে—সুতরাং তত্রত্য

কোন জাতিকেই ইহার বজাইতে বাকি নাই। আমেরিকায় যাঁহারা কিছুকাল বাস করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন, ধনীর প্রাসাদে, দীনের কুটীরে, বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের হস্তে, হোটেলে, ক্লবে, তন্তুবায়ের তাঁতে, বেশ্যার সৌখীন ঘরে, রমণীর কেশগুচ্ছে, বালকের খেল্‌নায়; দোকানীর আপনাগারে—কোন স্থানে বা কোন শ্রেণীতে ইহা অজ্ঞাত নাই। এই সব্‌জান্তা ফুল বৎসরে দুইবার ফুটে; একবার শীতে এবং একবার বসন্তে। আমাদের দেশের রাধা-পদ্মের ন্যায় ইহার আকার; বর্ণ ঠিক সোনাচাঁপা ফুলের মত। মধুমালতী ফুলের ন্যায় ইহার গন্ধ। বোসিয়া পুষ্পে উৎকৃষ্ট আতর ও সুগন্ধি জল প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার প্রণালী ঠিক অস্মদ্দেশীয় গোলাপ জল প্রস্তুত করিবার ন্যায়। তবে প্রভেদ এই যে, বকযন্ত্র ব্যবহার করিলে বোসিয়ার জলকে দুইবার উত্তাপে চোয়াইয়া লইতে হয়। বোসিয়া ফুলের নিম্নদেশে শ্বেতবর্ণের যে গোলাকার মাজম্ থাকে, তাহার ভিতরে পদ্মের টাটিবৎ বীজ দেখিতে পাওয়া যায়; সেই বীজ রোপণ করিলে গাছ জন্মে। বাগানে যাঁহারা ইহা রোপণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের সকলকেই বীজ ব্যবহার করিতে হইয়াছে, কিন্তু জলে, ময়দানে, কঠিন মৃত্তিকায় কিরূপে ইহা জন্মে তাহা আজিও নির্ণিত হয় নাই। আমেরিকার অনেক স্থানে বোসিয়ার বীজ বিক্রয় হয় এবং এই বীজে ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডেও আজিকালি ইহার আদর হইতেছে শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা ভরসা করি আমাদের দেশের লোকেরা এই গাছ আনাইবার জন্য যত্ন স্বীকার করিবেন। এরূপ পুষ্পের বৃক্ষ বাগানে রাখিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। পার্কার সাহেব বলেন, "ভারতবর্ষে ইহার পরীক্ষা কখন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ ইহা ভারতে জন্মাইতে পারে।" বোসিয়া দ্বারা কেবল শোভা বৃদ্ধি হয় না, ইহার আওতায় অন্যান্য অনেক গাছ সত্বর বৃদ্ধি পায়। পুকুরে রাখিলে এতদ্দ্বারা পানীয় জল বিকৃত হইতে পারে না। ইহা অশ্ব ও গবাদির পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট আহার।

গাঁদাফুল রহস্য

অর্থাৎ

এক গাছে বড় বড় নানা রকমের গাঁদাফুল প্রস্তুত করিবার প্রণালী।

(MARIGOLD LOTUS)

গাঁদাফুল দেখিতে যেমন সুন্দর এবং আকারে যেরূপ বৃহৎ ইহার সেইরূপ সুগন্ধ থাকিলে, গোলাপাদি পুষ্প বোধ হয় ইহার নিকটে অবনত মস্তক হইত। ইহা যেরূপ অধিক পরিমাণে গাছে ধরে, ইহার ন্যায় এত অধিক আর কোন ফুল ফুটে না। গোলাপাদি পুষ্পের কোরক পূর্ণরূপে বিকসিত হইতে বিলম্ব লাগে, কিন্তু গাঁদাফুলের কুঁড়ি অতি শীঘ্র শীঘ্র বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং অতি শীঘ্র শীঘ্র বড় হইয়া উঠে। অতি সামান্য সময়ের মধ্যে আর কোন ফুলকে আমরা এরূপ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইতে দেখি নাই। বঙ্গদেশে হেমন্ত ও শীত ঋতুতে এই ফুল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যথায় তথায় ফুটিতে দেখা যায়। এক একটী ফুলে শতদল পুষ্পের পত্রদলের ন্যায় বহুল স্তবক দৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহারা যেরূপ কোমল সেইরূপ সুন্দর। মধুও কিয়ৎ পরিমাণে ইহাতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা অলিকুলের মনোরঞ্জক না হইয়া কীটকুলের শরীর পোষক হইয়া থাকে।

সামান্য চেষ্টায় একটী গাঁদা গাছে ৫।৭ প্রকারের বড় বড় ফুল তৈয়ার করিতে পারা যায়। আমরা সংক্ষেপে তাহার প্রক্রিয়া লিখিতেছি। যে স্থানে গাঁদাফুলের ভাল গাছ দেখিতে পাইবে, সেই স্থানের গাঁদাফুলের গাছের একটী ভাল ডাল ভূমিতে আজ্ঞাইতে হইবে। মাটি সরস ও সরল হওয়া আবশ্যক। "ভাল গাছ" শব্দের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যে গাছে বড় বড় ফুল ফুটিয়া থাকে, "ভাল ডাল" শব্দের অর্থও তাহাই বুঝিতে হইবে। পল্লব সহিত ডাল আনয়ন করিবে, শাখা যেন অত্যন্ত স্থূল কিম্বা নিতান্ত সরু না হয়। যাহা-হউক, এইরূপে শাখা আজ্ঞাইয়া গাছ তৈয়ার হইলে, ঐ গাছের ভাল ডাল লইয়া ভূমিতে রোপণ করিবে, এই মত ৫।৭ বার করিতে হইবে। গাছ অতি শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে, এমন কি ভাল ডালের কলমে ৪।৫ দিনে গাছ তৈয়ার হয়। এইরূপে ৭ বার কলম করা হইলে, অষ্টম বারে যে গাছ জন্মিবে তাহাকে কেয়ারী করিবে, এবং সেই গাছের গোড়ায় জল, খৈল ইত্যাদি দিয়া গাছকে

খুব সতেজ করিবে। গাছ যখন বেশ বড় হইবে, তখন তাহা হইতে ডাল শাখা ছুরি করিয়া কাটিয়া পরিষ্কাররূপে কলম (cutting) করতঃ ভূমিতে আজাইবে। এইবারের গাছে দেখিতে পাইবে অতি বৃহদাকার, অতিশয় সুন্দর, অতীব কোমল এবং অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত মনোহর গাঁদাফুল সারিসারি অথবা ওতপ্রোতভাবে ফুটিয়া বাগানের শোভা শতগুণে বর্দ্ধন করিয়াছে। কোন শাখায় মধ্যমাকার, কোন শাখায় অত্যন্ত বৃহৎ, কোন শাখায় নিতান্ত ক্ষুদ্র, কোন শাখায় তাহা হইতে একটু বড়, কোন শাখায় বা অর্দ্ধ গোলাকার পুষ্প ধরিয়াছে দেখিতে পাইবে। কোন শাখায় তপ্তকাঞ্চণ বর্ণের, কোন শাখায় পাকা হরিদ্রাবর্ণের, কোন শাখায় অল্প লালরঙ্গের, কোথাও বা লোহিত এবং পীত মিশ্রিত বর্ণের এবং কোন ডালে বা পাঁশুটে রঙ্গের ছোট ছোট অথচ মলিন-ভাবাপন্ন ফুল দেখা যাইবে। কোন শাখায় ৩ স্তবকের, কোন শাখায় ৫ স্তবকের, কোন শাখায় ৭ স্তবকের, কোন শাখায় বা ১০ স্তবকের ফুল ফুটিয়া থাকে।

রিয়া-আঁশ।

রিয়া নামক এক প্রকার ছোট গাছ আছে। আমাদের দেশে যে বিছুটি হয়, ইহা সেই জাতীয় উদ্ভিদ। চীন দেশের লোকে ইহার ছাল হইতে অতি সুন্দর পাট প্রস্তুত করে। সেই পাটে যে সূতা হয়, তাহাতে ঠিক রেশমের ন্যায় কাপড় প্রস্তুত হয়। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, আসাম প্রভৃতি স্থানে এক প্রকার রিয়া আছে। তাহার পাট হইতে লোকে মাছ ধরিবার জাল প্রস্তুত করে। কিন্তু সে পাট হইতে রেশমের ন্যায় কাপড় প্রস্তুত হয় না।

চীন দেশে যে রিয়া হইতে রেশমের মত পাট হয়, উদ্ভিদ-শাস্ত্রে তাহাকে Boehmeria nivea বলে। ইহার আঁশ অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। বিলাতে ইহার মূল্য কুড়ি টাকা মণ। যাহাতে ভারতবর্ষে এই রিয়ার চাষ হয়, সে জন্ত গবর্মেণ্ট আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন। এই রিয়া সম্বন্ধে দিনকতক রীতিমত এক হুজুক উঠিয়াছিল। শিবপুর ও সাহারণপুরের কোম্পানির বাগানে ইহার চাষ হইয়াছিল। তাহা ব্যতীত অনেক জেল-খানায় পরীক্ষা-স্বরূপ ইহার চাষ করিয়া দেখা হইয়াছিল। কিন্তু কোনও স্থানে রিয়ার চাষ করিয়া লাভ হয় নাই। যে সময় রিয়ার হুজুগ উঠিয়াছিল, সে সময়

কয়েকজন সাহেব ও দেশীয় লোকও ইহার চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরও অনেক অর্থ নষ্ট হইয়াছিল।

রিয়া গাছ যে এ দেশে হয় না, তাহা নহে। অনেক স্থানে আমি সবল, সতেজ গাছ-পূর্ণ রিয়া ক্ষেত্র দেখিয়াছি। রিয়ার চাষ করিয়া তবে কেন এ দেশে লাভ হয় না? যাঁহারা এই সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা স্বহস্তে এই কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, রিয়া গাছের ছাল হইতে পরিষ্কার আঁশ বাহির করা বড় কঠিন, সেই জন্য ভারতবর্ষে ইহার চাষ করিয়া লাভ হয় না। পাট কি শন গাছ জলে ভিজাইয়া দিলাম। পাঁচ ছয় দিন পরে উপরের ছাল পচিয়া গেল, ভিতরের শুভ্র আঁশ বাহির হইয়া পড়িল। তখন তাহার কাঠিগুলি ভাঙ্গিয়া পৃথক করিয়া ফেলিলাম। শুভ্র আঁশ ধুইয়া শুষ্ক করিলেই পাট কি শন প্রস্তুত হইল। রিয়া গাছ হইতে কিন্তু সেরূপ আঁশ বাহির করিতে পারা যায় না। রিয়া গাছের কাঠি দৃঢ়; হাত দিয়া সহজে ভাঙ্গিতে পারা যায় না। ইহা ব্যতীত আর একটী বিশেষ প্রতিবন্ধক আছে। রিয়া গাছের ছালের ভিতর এক প্রকার আটা আছে। সেই আটার প্রভাবে শুভ্র আঁশ ছালের সহিত জড়িত হইয়া থাকে। সে জন্য ছাল হইতে শুভ্র আঁশকে সহজে পৃথক করিতে পারা যায় না। জলে পচাইয়া সে আটাকে দূর করিতে গেলে, সেই সঙ্গে যেটী প্রয়োজনীয় বস্তু, অর্থাৎ শুভ্র আঁশ, সেটীও পচিয়া যায়। এই কারণে পাট ও শন গাছের ন্যায় রিয়া গাছকে পচাইয়া, রিয়া আঁশ বাহির করিতে পারা যায় না। চীন দেশে লোকে কাঁচা অবস্থায় রিয়া গাছকে কর্ত্তন করে। তাহার পর, ছুরি দিয়া গাছের উপর হইতে ছালগুলি তুলিয়া লয়। অবশেষে ভোঁতা ছুরি দিয়া ছালের উপর ও নিম্ন দিক হইতে আটা ও সাঁশ তাহারা চাঁচিয়া ফেলে। এইরূপ করিলে, ভিতর হইতে শুভ্র আঁশ বাহির হইয়া পড়ে।

এক এক গাছি ছাল লইয়া, ভোতা ছুরি দিয়া, আঁশ বাহির করিতে অনেক পরিশ্রম হয়। সে জন্য খরচও অধিক পড়ে। এত খরচ পড়ে যে, রিয়ার চাষ করিলে এ দেশে লাভ হয় না। গবর্মেণ্ট মনে করিলেন যে, কোনরূপে আঁশ বাহির করিবার খরচা যদি কমাইতে পারা যায়, তাহা হইলে এ দেশে এই মূল্যবান দ্রব্যের চাষ হইতে পারে। গবর্মেণ্ট হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, এক মণ রিয়া আঁশ প্রস্তুত করিতে যদি কুড়ি টাকার অধিক খরচা না পড়ে, তবেই এদেশে ইহার চাষ হইতে পারিবে; কুড়ি টাকার অধিক খরচা পড়িলে

এ ব্যবসায় চলিবে না। এই কুড়ি টাকা হইতে চাষের খরচা, পরিষ্কার শুভ্র আঁশ বাহির করিবার খরচা, কলিকাতায় আঁশ পাঠাইবার খরচা, কলিকাতা হইতে জাহাজে করিয়া বিলাত পাঠাইবার খরচা, এই সমুদয় খরচা দিতে হইবে। গবর্মেণ্ট মনে করিলেন যে, ভাল কলের সহায়তায় কুড়ি টাকায় এক মণ রিয়া আঁশ প্রস্তুত হইতে পারিবে ও বিলাত পর্য্যন্ত পাঠাইবার খরচাও তাহা হইতে দিতে পারা যাইবে, আর চাষিদিগের লাভও থাকিবে। এইরূপ মনে করিয়া গবর্মেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে,—"যদি কেহ এরূপ কল প্রস্তুত করিতে পারে, অথবা এরূপ উপায় আবিষ্কার করিতে পারে, যাহার সহায়তায় কুড়ি টাকায় এক মণ রিয়া আঁশ প্রস্তুত হইতে পারিবে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে।"

ইহার পূর্ব্বে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবার কথা হইয়াছিল। কিন্তু সে পরীক্ষা ভালরূপে হয় নাই। পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবার নিমিত্ত যে পরীক্ষা হইয়াছিল, সেই পরীক্ষায় আমি উপস্থিত ছিলাম। এই পরীক্ষা ১৮৭৭ সালে সাহারণপুরে হইয়াছিল। পরীক্ষা দিতে চারি পাঁচটীর অধিক কল উপস্থিত হয় নাই। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে এই কয়টী কল আসিয়াছিল। ইহার মধ্যে যবদ্বীপ হইতে যে কলটী আসিয়াছিল, তাহার কারিগরি দেখিয়া আমি বড়ই চমৎকৃত হইয়াছিলাম। আথার্টন সাহেব নামক একব্যক্তি এই কলটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই কলটীর উপরিভাগে সামান্ত একটু গর্ত্ত ছিল। আখ-মাড়া কলে যেরূপ ইক্ষু যোগাইয়া দিতে হয়, এই গর্ত্ত-পথে সেই রূপ শুষ্ক রিয়া গাছ যোগাইতে হয়। কলে সেই গাছগুলি ভিতরে টানিয়া লয়। কলের ভিতরে গাছের কাষ্ঠ বা কাঠিগুলি ভাঙ্গিয়া যায়, ও ছাল হইতে শুভ্র আঁশ পৃথক হইয়া পড়ে। অবশেষে সেই পরিষ্কৃত শুভ্র রেশমের স্থায় উজ্জল আঁশ কলের নিম্নদেশস্থিত আর একটী গর্ত্ত-পথে আপনাআপনি বাহির হইতে থাকে। পরীক্ষার পূর্ব্বদিন কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমি এই কলের কার্য্য দেখিয়া-ছিলাম। তাহা দেখিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে, এই কলনির্ম্মাতা বোধ হয়, পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরদিন পরীক্ষার পূর্ব্বে কলটী বিকল হইয়া গেল। কলের সহিত আথার্টন সাহেব যে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, কল মেরামত করিবার নিমিত্ত সে কত চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। সে নিমিত্ত এ কলটীর আর পরীক্ষা হইল না। পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত আর আর যে কল আসিয়াছিল,

তাহার মধ্যে কোনটাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। সুতরাং কেহই সে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইল না। সে পুরস্কারের অঙ্গীকার গবর্মেণ্ট তাহার পর তুলিয়া লইলেন।

১৮৮৩ সালে যখন কলিকাতায় মহাপ্রদর্শনী হয়, তখন আলিপুরের বাগানের নিকট আমি অনেকগুলি এইরূপ কল পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে ডি-সোজা সাহেব যে কল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। কলের চারিধারে গোল করিয়া একটা দড়ি বাঁধা ছিল পাট গাছ হউক, রিয়াগাছ হউক, মুরগা পাতা হউক, এই দড়ির গায়ে লাগাইয়া দিতে হয়। যেমন কল ঘুরিতে থাকে, সেই সঙ্গে গাছ সহিত সেই দড়িও ঘুরিতে থাকে। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে তোমার চক্ষুর সম্মুখেই একস্থানে গাছের কাঠিগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, আর একস্থানে ছালের এক পিট চাঁচিয়া যায়, অন্য স্থানে অপর পিঠ চাঁচিয়া যায়। দড়ি যখন চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার গায়ে আর সে গাছ কি পাতা থাকে না, পরিষ্কৃত শুভ্র আঁশে পরিণত হইয়া তাহাই তখন দড়িতে ঝুলিতে থাকে। কিন্তু এই কলে অনেক ক্ষতি হয়। গাছের যে অংশে ভাল আঁশ থাকে, কলের দারুণ আঘাতে তাহাও ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হয়। চীন দেশের ন্যায় হাতে রিয়া আঁশ বাহির করিবার নিমিত্তও অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। কলিকাতার কৃষি-সভার সম্পাদক বেলচিঙেন সাহেব সাহারণপুরে এই উপায়ের পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা শিক্ষিত মজুরগণ রিয়া গাছ হইতে ছুরি দিয়া ছাল বাহির করিয়া, তাহার পর সেই ছাল চাঁচিয়া শুভ্র আঁশ প্রস্তুত করিয়াছিল। কিন্তু সে আঁশ চীনের আঁশের ন্যায় পরিষ্কার হয় নাই। খরচও বোধ হয়, অধিক পড়িয়া থাকিবে। বেলচিঙেন সাহেবকে সে নিমিত্ত গবর্মেণ্ট সে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করেন নাই। কলিকাতায় আমার সম্মুখে আসামের একটী ভদ্রলোক পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হাতি বড়ুয়া। ইনি জাতিতে আহম, অর্থাৎ আসামের রাজার জাতি। ইহার কলের বিশেষত্ব কিছু ছিল না। আক-মাড়া কলে রিয়া গাছ ও ছাল বার বার মাড়িয়া ইনি আঁশ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে আঁশ ভাল হয় নাই।

রিয়া ব্যবসায়ের সম্প্রতি অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। সে জন্য আজ আমি এ প্রবন্ধ লিখিলাম। শুভ্র পরিষ্কৃত আঁশ এখন আর বিলাতে পাঠাইতে

হইবে না। এখন গাছ হইতে ছাল তুলিয়া, সেই ছাল শুষ্ক করিয়া পাঠাইলেই চলিবে। ছুরি দিয়া গাছ হইতে ছাল উত্তোলন নিতান্ত সহজ কাজ, অতি অল্প পরিশ্রমে তাহা হইতে পারে। ছাল তুলিবার একপ্রকার কলও আছে। সে কলের মূল্য ছয় শত টাকা। তাহার সহায়তায় একদিনে তের চৌদ্দ মণ ছাল তুলিতে পারা যায়। কিন্তু ছাল তুলিতে কলের কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই, হাত দিয়া অনায়াসে সে কাজ হইতে পারে। লণ্ডন নগরে থির্কোয়েল কোম্পানি নামক বণিকের কারখানা আছে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে,—"যত ইচ্ছা শুষ্ক ছাল আমাদের নিকট প্রেরণ কর. সে সমুদয় আমরা ক্রয় করিব।" লণ্ডন নগরে উপস্থিত করিয়া দিলে, তাঁহারা প্রতি মণ আট টাকা হিসাবে মূল্য দিবেন। এ অপরিষ্কৃত শুষ্ক ছালের দর, পরিষ্কৃত আঁশের দর নহে। যে স্থানের ভূমি কিছু আর্দ্র, এরূপ সকল স্থানেই রিয়া গাছের চাষ হইতে পারে। মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, পূর্ণিয়া, মালদা, রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি তরাই প্রদেশ ও আসাম ইহার জন্য বিশেষ উপযোগী বলিয়া আমার বোধ হয়। এই সমুদয় স্থান হইতে কলিকাতা ও কলিকাতা হইতে বিলাত পাঠাইতে মণকরা বোধ হয়, দুই কি তিন টাকা খরচ পড়িবে। সুতরাং যিনি ইহার চাষ করিবেন, ঘরে বসিয়া তিনি প্রতি মণে পাচ কি ছয় টাকা মূল্য পাইবেন। এক্ষণে কথা এই যে, পাঁচ কি ছয় টাকা মূল্য পাইলে এ বস্তুর চাষ করিয়া লোকের লাভ হইতে পারে কি না? পাঁচ ছয় টাকা মূল্য পাইলে যদি লাভ না হয়, কিম্বা পাট অথবা অন্য কোন দ্রব্যে যদি অধিক লাভ হয়, তাহা হইলে রিয়ার চাষ এদেশে প্রচলিত হইবে না। এক বিঘা ভূমিতে কত মণ রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে, আর চাষ করিতে ও ছাল তুলিতে, শুকাইতে ও বাঁধিতে কত খরচ হয়, এ সমুদয় কথা একমাত্র পরীক্ষা দ্বারাই স্থির হইতে পারে। (বঙ্গবাসী)

আতা ফল।

(CUSTARD APPLE)

লাটীন ভাষায় ইহার নাম "আনোনা স্কোয়ামোশা।" হিন্দুস্থানীরা ইহাকে সরিফা এবং আতা নামে আখ্যাত করে। এসিয়া দেশে এই বৃক্ষের প্রথম আবিষ্কার হয় এবং আমেরিকাতেও ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশে ইহা অপর্য্যাপ্ত; ইহার ফুলের বর্ণ হরিদ্রা-সবুজ। বৈ মাসের মধ্য সময়ে

ফুল ফুটে। পঞ্জাবে এই গাছ হয় না, ইহা শুনা গিয়াছে। ইহার ফল খুব বড় হয়; সময়ে সময়ে এত বড় হয় যে, গুরুত্বে আপনা হইতেই কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া ভূতলশায়ী হয়। শাখাও কখন কখন ঝুলিয়া পড়ে। ফুলের যেমন সৌগন্ধ, ফলের তেমনি উত্তম আস্বাদ। ইয়ুরোপীয়েরা এতদুভয়েরই যথেষ্ট প্রশংসা করেন। আমেরিকার গাছের ফল হইতে এতদ্দেশীয় গাছের ফল আরও মিষ্ট এবং অধিকতর উপাদেয়। শীত ও বর্ষায় ইহার অভ্যুদয়।

গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ হইলে, জালদ্বারা তাহা আবৃত করিয়া রাখা উচিত। পক্ষী ও কাষ্ঠবিড়াল ইহার প্রধান শত্রু, অর্দ্ধ পক্কাবস্থায় কাক ও শকুনি ইহা গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। ডিম্বের আকৃতি প্রাপ্ত না হইতে হইতে, এক একটী ফলের চারিদিকে পাৎলা শুভ্র কাপড় দিয়া ঘেরিয়া রাখিলে ভাল হয়। পাহাড়ে, গরম এবং অনুর্ব্বর মাটিতে ইহাকে স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় প্রভূত পরিমাণে জন্মিতে ও ফল প্রসব করিতে দেখা যায়। এদেশে ফল পাকিবার অনেক পূর্ব্বেই কৃষকেরা গাছ হইতে ফল পাড়ে এবং তাহা রৌদ্রে পাকাইয়া লয়, কেহ কেহ বা চাউল বা বালুকা রাশির ভিতর রাখিয়া দেয়। কোন কোন স্থানে খড়ের ভিতর রাখিয়া পাকাইতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে আস্বাদনের লঘুতা জন্মে। জামেকা ও পান্নায় যত বড় ফল হয়, পৃথিবীর আর কোথাও তত বড় হয় না। বড় বড় পাহাড়ের গায়ে এবং ভগ্ন প্রাচীরের পার্শ্বেও ইহা জন্মে। এই জন্য অনেকে ইহাকে বন্য গাছ বলিয়া থাকেন।

বীজ হইতে ইহা জন্মে এবং তিন বৎসরের মধ্যে বড় বড় গাছ হয়। শীতকালে মূলে গো বিষ্ঠা কিছু পরিমাণে দিলে সোণায় সোহাগা হয়, অর্থাৎ জমির উর্ব্বরতা, ফলের মধুরত্ব, ফুলের সরসতা, বৃক্ষের পুষ্টিতা এবং গাছের আকারের দীর্ঘতা একেবারে জন্মিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ মতে, সীতাফল মধুর, শীতল, মুখরোচক, রুচিকর, উষ্ণতাঘ্ন, উদরাময়ঘ্ন এবং শিররোগের প্রতিকারক। এই ফল কোমলাবস্থায় কাঁচা খাইলে ঐ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে, এরূপ জনশ্রুতি আছে। সীতাফল শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ফল বিশেষ এবং তজ্জন্য হিন্দু সমাজে ইহা সাদরে গৃহীত হয়। বর্ষাকালে ইহার বীজ আজ্জাইতে হয়।

ভীম-কাঁকুড়।

যদি আমরা একবার জড় জগতের বিষয় আলোচনা করিতে বসি, তবে তন্মধ্যে কত অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত পদার্থ আমাদের নয়নপথে পতিত হয় তাহার

ইয়ত্তা করা বা তাহাদের যথাযথ গুণানুসন্ধান করা সীমাবদ্ধ মানব বুদ্ধির অতীত হইয়া উঠে। যে সকল উদ্ভিদ আমাদের আহারের জন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, যে সকল ফল ফুল নিয়ত আমাদের শরীর পোষণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেছে, আমরা কয় জন এ সকলের স্বভাব, জাতি, জন্ম, প্রক্রিয়া এবং ফলন সম্বন্ধে বিচার করি। অনায়াসলব্ধ যাহা কিছু সম্মুখে দেখি তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকি, পৃথিবীতে অসংখ্য ফল, ফুল, তরু, লতা, আছে, তাহা আমাদের গণনা করিয়া উঠা সম্ভবপর নহে, তবে আমাদের স্বদেশজাত যাহা আছে, আমাদের সেই সকলের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া উচিত এবং আমাদের দেশের যেরূপ উর্ব্বরা ভূমি তাহাতে কি প্রকারে ঐ সকল চাষ করিলে সতেজ হয় ও বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া উৎপাদকের মনের প্রীতি বর্দ্ধিত করিতে পারে, আমাদের ঐকান্তিক যত্ন সহকারে সেইগুলি অধ্যয়ন করা উচিত। প্রাত্যাহিক ব্যবহার্য্য সমুদয় তরকারী, যদি একজনমাত্রও তাহারই কয়েকটা অবলম্বন করিয়া তাহাদের উৎপত্তি বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হয়, তবে দাসত্ব জীবনে পদাঘাত করিয়া সুখে, নিশ্চিন্তে আপন পারিবারিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারে। অদ্য আমি যে বিষয়ের অবতারণা করিতেছি দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের দেশে তাহার চাষ একেবারেই নাই, যদি কেহ উহার বীজ বপন করেন তবে দেখিবেন এটী কেমন সুখাদ্য এবং অল্প পরিশ্রমোৎপন্ন এবং বিশেষ লাভজনক। আমি যে "ভীম-কাঁকুড় বা বাখারির" বিষয় বলিতে যাইতেছি তাহা মুরসিদাবাদ, মালদহ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কোন কোন প্রদেশে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাধারণ ফুটি অপেক্ষা ইহার আকার অনেক বৃহৎ। দৈর্ঘ্যে তিন হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দীর্ঘতা অনুসারে ইহার স্থূলতা কম। দশ বার জন লোকেও ইহার একটী খাইয়া উঠিতে পারে না। অপক্ব অবস্থাতে ইহার উপাদেয় ডাল্‌না ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং পাকিলে ফুটির ন্যায় আহারের ব্যবস্থা। আমরা মুর্শিদাবাদে ইহা ডাল্‌নাতেই প্রায় অধিক সময় ব্যবহার করিয়াছি। এটী যে গৃহস্থ পোষ্য তরকারী ও সুখাদ্য ফল তাহার আর সংশয় নাই। বৎসরে দুইবার করিয়া ইহার আবাদ হইয়া থাকে। একবার পৌষ মাসের শেষভাগ হইতে মাঘের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত, আবার জ্যৈষ্ঠের শেষার্দ্ধ হইতে আষাঢ়ের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ফলিয়া থাকে। বালুকাপূর্ণ ভূমিতেই ইহার ফলন অধিকতর হইয়া থাকে। যে জমিতে 'বাখারি' রোপণ করিতে হইবে প্রথমে তাহা বেশ কোদলাইয়া (ডেলা থাকিলে) সুন্দররূপে চূর্ণ

করিয়া দিতে হয়। মাটি এমন কোমল করিতে হইবে যেন উহার মূল অনায়াসেই ভূমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, ইহার আবাদে বেশী যে কিছু কারকতি করিতে হয় তাহা নহে। প্রথমে উক্ত কর্ষিত ভূমির মধ্যে এক বা দেড় হস্ত অন্তর এক একটী নালা প্রস্তুত করিতে হয় এবং তন্মধ্যে ঠিক ফুটি রোপণের ন্যায় ২।৩টী করিয়া বীজ এমন ভাবে রোপণ করিতে হইবে যে, উহার ঊর্দ্ধভাগের উপরি অর্দ্ধ ইঞ্চি মাত্র মৃত্তিকা থাকে। অধিক পরিমাণে প্রোথিত থাকিলে উহার অঙ্কুরোদ্গমে ব্যাঘাত জন্মে অথবা অঙ্কুর একেবারেই মাটি ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না; অঙ্কুরোদ্গম হইলে ১।২ দিন অন্তর অল্প জলসেচন করা বিধেয়। পরে যখন ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া লতাইয়া যায় তখন উহাদিগকে পৃথক পৃথক করিয়া দিতে হয় যেন সকল গাছগুলি একত্র মিলিত না হইয়া যায়। এই সময় এক প্রকার লোহিত বর্ণের ছোট কীট ইহার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, তখন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। তামাক পাতা চূর্ণ অথবা হুঁকার জল পত্রোপরি কিছু কিছু নিক্ষেপ করা উচিত। তৎপরে ফল ধরিলে উহার নীচে ও উপরে বিচালি বিছাইয়া আবৃত রাখা বিধি। ইহার আর কোন বিশেষ যত্ন করিতে হয় না।

পশুপালন ও পশুচিকিৎসা।

কৃষি বিদ্যার সম্যক্ প্রকারে উন্নতি সাধন করিতে হইলে, যেমন ভূমির উর্ব্বরতা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, কৃষি রক্ষণশীল পশুবর্গের পালন করাও ততোধিক কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করা যায়। পশুদিগকে উপযুক্ত আহার প্রদান করা উচিত এবং অপরিমিত শীতাতপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিহিত যত্ন স্বীকার করা বিধেয়। কেবল তাহাই নহে, উহাদের শরীরে কোন প্রকার রোগ উপস্থিত হইলে, তাহার রীতিমত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, নতুবা অকালে উহারা মরিয়া যাইতে পারে। গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে সময়ে সময়ে আমরা বিশেষ যত্নশীল হইতে দেখিতে পাই। মৃত মহাত্মা প্যারিচাঁদ মিত্রের যত্নে "পশুর প্রতি অত্যাচার নিবারণী সভা" প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে, আমাদের দয়ালু গভর্ণমেণ্ট পশুকুলের প্রতি বিশেষরূপে মনোযোগী হইয়াছেন। কলিকাতা এবং মফস্বলের প্রধান প্রধান স্থানে ঐ সভার শাখা-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তৃষিত পশুকে জল দিবার জন্য প্রকাশ্য পথ-

পার্শ্বে জলাধার স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্য যে রাজবিধি প্রণীত হইয়াছে, তাহাও স্থানে স্থানে প্রচলিত হইতে দেখা গিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশীয় গভর্ণমেণ্টের এতৎ সম্বন্ধে (পশুচিকিৎসা) একটী প্রয়োজনীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে একখানি ইংরাজী পুস্তক ও তাহার দেশীয় অনুবাদ সাধারণে বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে। আমরাও উহার একখানি প্রাপ্ত হইয়াছি, চিকিৎসা সম্বন্ধে আমাদের মতামত পর প্রস্তাবে বিবৃত হইবে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে কেবল মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মত প্রকাশ করা যাইতেছে।

গভর্ণমেণ্ট বলেন, পশুদিগের মধ্যে টীকা (Inoculation) দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, তাহাদের মধ্যে অনেক প্রকার রোগের লঘুতা জন্মিবে। পঞ্জাবের পশুদিগের মধ্যে সময়ে সময়ে ভয়ানক মড়ক উপস্থিত হইয়া বহুসংখ্যক পশু নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া, তত্রত্য গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্টের নিকটে এই প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য লিখিয়া পাঠান ; ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট এই কথা আবার বিলাতে ষ্টেট্ সেক্রেটারীর নিকট জানান। ফরাসীদেশের প্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এম্. এল্. পাষ্টুর সাহেব এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া গিয়াছেন, এতদ্দ্বারা পশুদিগের সম্যক্ মঙ্গল সাধিত হইবে। তিনি দুই সপ্তাহ অন্তরে পশুর টীকা দিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহার ব্যবহৃত জলীয় পদার্থের নাম "Vaccins Charbonneaux ; তিনি "Bacillus anthracis" নামক পদার্থেরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৮১, ১৮৮২ এবং ১৮৮৩ এই তিনবৎসরের পরীক্ষায় তাঁহার সকল প্রকার সন্দেহ অপনোদিত হইয়াছে। পাষ্টুর দেখিয়াছেন, প্রায় পাঁচলক্ষ "টীকা দেওয়া" বৃষ, মেষ, গো এবং অশ্বের মধ্যে গড়ে হাজার করা একটী পশুর অধিক মরে নাই। তাঁহার মতে, ভারতবর্ষে পশু জাতির মধ্যে টীকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইলে, এদেশের কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে সম্যক্ উন্নতি সাধিত হইবে। পাষ্টুরের এই কথা "কৃষিতত্ত্বের" অনেক পাঠকের নিকট নূতন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, একথা ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এক সময়ে এদেশে হিন্দু শাসন সময়ে এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

পাষ্টুর বলিয়াছেন, একটি বুদ্ধিমান শিক্ষিত যুবাকে ফরাসীদেশে এই কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, ভারতে

ইহার কার্য্যালয় খুলিতে হইবে, তাহাতে ৬ সহস্র ফ্রাঙ্কের অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া বোধ হয় না। ইনি ভারতবর্ষে প্রায় দুই সহস্র মেষ, অর্দ্ধশত বৃষ এবং তিন শত হস্তীকে টীকা দেওয়া যাইতে পারে এমন "Vaccins" পাঠাইয়াছেন। জর্ম্মনী দেশেও ইহার ফল উত্তম হইয়াছে। ভিয়ানা নগরের মধ্যে ইহার উপকারীতা লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। তথাকার বৃটীশ দূত বলেন, "১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২৯এ ফেব্রুয়ারী এস্থলে পশুদিগের মধ্যে টীকা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হয়, ইহাতে মেষজাতিদিগের মধ্যে বসন্ত রোগের উদয় হয় নাই। পূর্ব্বে প্রতি বৎসরে তিনবার করিয়া এই রোগের আবির্ভাব দেখা যাইত।" তথায় এ সম্বন্ধে যে আইন প্রচলিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটি ধারা আমরা এস্থলে অনুবাদ করিয়া দিলাম—

৩০ ধারা। সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে, পশু জাতীর মধ্যে টীকা দিতে হইবে এবং যাহারা রোগাক্রান্ত হয় নাই তাহাদিগকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখা যাইবে।

৩১ ধারা। নিকটবর্ত্তী স্থানে মড়ক আরম্ভ হইলেই, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই আইনানুসারে সকল পশুর টীকা দিয়া দিবেন এবং এ বিষয়ে নির্ব্বাচনের তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রহিল।

৩২ ধারা। পুলীস সাহায্য লইয়া ভদ্রলোকেরা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের অধিকৃত (রোগাক্রান্ত) পশুদিগের মধ্যে টীকা দেওয়াইতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। বসন্তরোগাক্রান্ত কোন পশুর মাংস কেহ বিক্রয় বা ভোজন করিতে পারিবে না। টীকা দেওয়ায় যে সকল পশু মরে তাহাদের সম্বন্ধেও এই আইন চলিত রহিল।

৩৪ ধারা। টীকা দেওয়ার পর হইতে, পশুদের মৃত্যু সম্বন্ধে হিসাব রাখা হইবে। (ইত্যাদি)।

আমাদের বিবেচনায়, পাষ্টুরের এই প্রথার অনুমোদন করিয়া বঙ্গ দেশীয় গভর্ণমেণ্ট অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। আমাদের দেশের লোকের ইহা একবার পরীক্ষা করিতে দেওয়া উচিত।

মসীনা বা তিসীর তৈল।

তিসীকে ইংরাজীতে Linseed, বৈজ্ঞানিক মতে Lineæ কিম্বা Linum Usitatissimum বাঙ্গালায় মসীনা বা তিসী বলে। ইহাকে নিষ্পীড়ন করিলে যে তৈল পাওয়া যায় তাহাকে ইংরাজীতে Linseed Oil, বৈজ্ঞানিক মতে Oleum Lini বাঙ্গালায় মসীনার বা তিসীর তৈল বলে। তিসী অনেক প্রকারে আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি যথা:—

(১) Compound Infusion of Linseed মসীনার কাণ্ট—মূত্রকৃচ্ছ্র, মেহ, রক্তাতিসার ও শ্লেষ্মা ইত্যাদি রোগে ব্যবহার্য্য।

(২) Linseed Meal মসীনার খৈল চূর্ণ Linseed Poultice মসীনার পোলটিস—স্ফোটকাদি সুপক্ক করণার্থে ব্যবহার্য্য।

(৩) Linseed Oil মসীনার তৈল চূণ সহযোগে লিনিমেণ্টম্ ক্যাল্‌সিস্ বা ক্যারন্ অইল নামে ঔষধ প্রস্তুত হইয়া অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা দগ্ধস্থানে ব্যবহার্য্য। কাঠ দীর্ঘস্থায়ী হয় বলিয়া আমরা এই তৈলে রং ফলাইয়া আমাদের ব্যবহার্য্য ইমারতের কড়ি, বরগা, সার্শী, খড়খড়ি, কপাট, জানালা প্রভৃতিতে লাগাইয়া থাকি।

স্থায়ী তৈল মাত্রেই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—শুষ্কশীল ও অশুষ্কশীল। শোধিত তিল, শর্ষপ, নারিকেল প্রভৃতি তৈল বেশীদিন রাখিয়া দিলে পচিয়া যায় না কিন্তু অবিশুদ্ধ অবস্থায় থাকিলে বায়ু শোষণ করিয়া শতকরা ৩.৫ অংশ ওজন বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ প্রথমাবস্থা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গাঢ় ও অম্ল হয়। অশুষ্কশীল তৈলের এইরূপ মৃদু মৃদু পরিবর্ত্তন হয়; কিন্তু শুষ্কশীল তৈল ঐরূপ অনাবৃত অবস্থায় রাখিলে দ্রুত গতিতে বায়ু হইতে অম্লজান শোষণ করিয়া ওজনে ৬।৮ গুণ বৃদ্ধি পায়। তিসী, পোস্ত, ওয়াল্‌নট্, হেজেলনট্ প্রভৃতি শুষ্কশীল তৈল মধ্যে তিসীর তৈল বিশুদ্ধ অবস্থাতেই বায়ু হইতে অধিক পরিমাণে অম্লজান বাষ্প শোষণ করিয়া থাকে। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা আমরা বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি যে, তিসীর তৈলে "লিনোলাইন বা লিনক্সাইন" Linoleinc or Linoxine নামক পদার্থ (শতকরা ৮০ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়) থাকায় উহা শীঘ্র বায়ু হইতে অক্সিজেন বাষ্প শোষণ করিয়া বার্নিসের ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয়। গালা, রজন, রুমিমস্তকী, কোপাল, কহরবা, লোবান, ধুনা প্রভৃতি দ্রব্য স্পিরিটে কিম্বা টার্পিনে দ্রব করিয়া যেরূপ বার্নিস প্রস্তুত হয় এই

লিনোলাইনও সেইরূপ। যেমন কাষ্ঠাদিতে বার্নিস্ মাখাইলে বায়ু সংযোগে স্পিরিট উড়িয়া যাইয়া রজন, গালা প্রভৃতির আবরণ পড়ে, এই লিনোলাইনেরও ঠিক সেইরূপ আবরণ পড়ে. তবে বিশেষ এই যে, লিনোলাইন অধিক স্থিতি-স্থাপক ও ইহার আবরণ অধিক দৃঢ় এবং শুষ্ক হইলে অন্যান্য বার্নিসের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া ফাটিয়া যায় না।

বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য লিনোলাইন প্রস্তুত করিতে হইলে, সচরাচর শুষ্কশীল তৈলের মধ্যে তিসীর তৈলই ব্যবহার হয়। মসিনার তৈলে অশুষ্কশীল ওলাইক অর্থাৎ মেদজ অম্ল দূর করিবার জন্য প্রায়ই মুদ্রাশঙ্খ (Litharge) সংযোগ করিয়া লইয়া জ্বাল দিতে হয়। এইরূপ তাপ প্রাপ্তে মুদ্রাশঙ্খ তৈলের অশুষ্কশীল অংশ অদ্রবনীয় বিধায় সাবান জন্মাইয়া কটাহের তলায় জমিয়া যায়। এই কার্য্য সম্পাদনার্থে এরূপ তাপ প্রয়োগের আবশ্যক যেন তৈল ফুটিয়া দগ্ধ হইয়া যায়। যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তৈল দগ্ধ হইয়া ধূম নির্গত হইতেছে এবং কটাহের উপর ফেনা পড়িয়াছে সেই সময়ে একটী পাখীর পালক উক্ত উত্তপ্ত তৈলে নিমগ্ন করিলে দেখা যাইবে যে পালকটী দগ্ধ হইয়া অঙ্গারবৎ হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে, তৈলে আবশ্যকীয় তাপ প্রদান কার্য্য সমাধা হইয়াছে; তখন উহাকে শীতল করণার্থে স্থিরভাবে রাখিয়া দিতে হইবে। এক্ষণে অঙ্গার চূর্ণবৎ দগ্ধ গ্লিসিরিন ও মুদ্রাশঙ্খজ সাবানের অংশ পাত্রের নীচে পড়িয়া তৈল বেশ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হইবে: এবং উপরের তৈলাংশ টুকু ঢালিয়া লইয়া কাপড়, স্পঞ্জ প্রভৃতিদ্বারা ছাঁকিয়া লইলেই লিনো-লাইন প্রস্তুত হইল। ইহা বর্ণহীন গাঢ় ও স্বচ্ছ পদার্থ। মুদ্রাশঙ্খের পরিবর্ত্তে ম্যাগনেসিয়া, লাইম অর্থাৎ চূণ অক্সাইড্ অফ্ জিঙ্ক, অক্সাইড্ অফ্ মেন্‌গেনিজ্ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আমাদের ন্যায় চাকরীগত প্রাণ, পরাধীন, নিরুদ্যম অলস জাতির মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের যত উন্নতি হয় ততই মঙ্গল। প্রতিবৎসর আমাদের দেশ হইতে যে পরিমাণ তিসীর তৈল বিলাতে যাইয়া তথা হইতে জ্বাল দিয়া নানারূপ পেইণ্ট প্রস্তুত হইয়া এদেশে আসিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহা সকলেই অবগত আছেন কিন্তু আমরা এমন অকর্ম্মনা যে এই সামান্য কার্য্য অর্থাৎ তৈলটী রীতিমত জ্বাল দিয়া লইতে পারি না অথবা তাহার নিমিত্ত কোন চেষ্টাও করি না। সম্প্রতি শ্যাম বাজারের তৈল বলিয়া একপ্রকার জ্বাল দেওয়া তৈল আবিষ্কার হইয়াছে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তাহা বিলাতী তৈলের ন্যায় সমান

ফলদায়ক নহে; সেই জন্যই এবিষয় আমাদের পাঠকবর্গের গোচরে আনিলাম। যদি কোন দেশের উদ্যমশীল ব্যক্তি সাধের চাকরী ছাড়িয়া এই কার্য্যে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক স্বদেশীয় স্বাধীন ব্যবসা বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করেন তাহাপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে।

শ্রীহরিদাস ঘোষ,

পালপাড়া, বেলুড়, পোঃ আঃ হাওড়া।

হড়েলী তৃণ

(HURRIALLEE GRASS)

"মেইল" নামক সংবাদ-পত্রে হড়েলী-তৃণ (ঘাস) সম্বন্ধে এক বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং কয়েক বৎসর হইল এ বিষয়ে একখানি বিলাতী পুস্তকও প্রচারিত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া সাম্রাজ্যে এই ঘাসের ব্যবসা হইয়া থাকে এবং তথায় ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা ও প্রবন্ধ লেখক মহাশয়েরা হড়েলী-তৃণ সম্বন্ধে যে ভ্রমাত্মক মতাবলী প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে হাস্য সম্বরণ করা যাইতে পারে না। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে ঐ প্রবন্ধের কথঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়া কৃষি সম্বন্ধীয় ভ্রম পাঠকদিগকে জানাইবার প্রয়াস পাইতেছি।

হড়েলী শব্দ "হরিয়ালী" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। হরিয়ালী সংজ্ঞা হিন্দুস্থানী কথা, ইহা প্রাকৃত হরিয়া এবং সংস্কৃত হরিদ্রা শব্দের অপভ্রংস। ইংরাজীতে এই ঘাসের নাম Cyno-dondactylon এবং রক্সবর্গে ইহা Panicum-dactylon নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। কেজ্ সহরে Agrostislin-nearis সংজ্ঞায় ইহাকে কেহ কেহ অভিহিত করেন। আমাদের দেশে মান্দ্রাজে তামিল ভাষায় এই ঘাস বা তৃণকে Argampilloo, তৈলঙ্গী ভাষায় Gericha-kasavu, উর্দ্দুতে দুব্, উড়িয়ায় দুবাই এবং সংস্কৃত ভাষায় দুর্ব্বা কহা গিয়া থাকে। এই ঘাস প্রচুর জন্মে, এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে ইহা শীতল, কোমল, চক্ষুর জ্যোতির্ব্বর্দ্ধক, পুষ্টিদায়ক, মেহঘ্ন এবং পশুপকারী। পশুদিগকে ইহা

* "Cyno—dondactylon or Hurriallee grass", P. 82, By John Short, Esq., 18884.

রীতিমত খাইতে দিলে তাহারা সবল ও সুস্থ থাকে এবং গোরুদিগকে ইহা নিত্য ব্যবহার করিতে দিলে তাহারা প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ দেয়। রাস্তা, বাগান, ক্রীড়া-স্থান, পুকুর-পাহাড় এবং বৈঠকখানার সম্মুখে এই ঘাস আচ্ছাইলে বড় শোভাজনক দেখায় এবং তাহাতে মনের যথোচিত আনন্দ বৰ্দ্ধন করে। কাটিয়া না দিলে ইহা ২০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে এবং ইহার মূল অত্যন্ত শক্ত, গভীর ও বিস্তৃত হয়। হিন্দুরা পুরাকাল হইতে এই তৃণের আদর করিয়া আসিতেছেন; শাস্ত্রমতে ইহা পবিত্র দ্রব্য এবং গণেশ দেবতার অত্যন্ত প্রিয় পদার্থ। মান্দ্রাজে অশ্বচালকেরা ইহার রীতিমত আবাদ করিয়া থাকে। তথায় বৎসরে ৫।৬ বার ইহা জন্মে এবং প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকর নিকরেও শুষ্ক বা বিরস হয় না। চিকিৎসকেরা নিয়ত ইহা উদ্‌খাত করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহার পত্রদলকে সর্প দংশনের অমোঘ ও অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া স্বীকার করেন। সাহেবেরা হরিয়ালী ঘাসকে (Dog-Grass) কুকুর ঘাস বলিয়া যে অভিহিত করেন, তাহার কারণ আছে। গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন "কুকুরেরা এই ঘাস খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে এবং এই ঘাস ব্যতীত আর কোন তৃণ তাহারা খায় না। মাংসাশীদিগের পক্ষে এই তৃণ বিশেষ প্রশস্ত ও প্রিয়তর এবং তজ্জন্যই ইহাকে তাহারা এতদূর সমাদর করিয়া থাকে।" সাহেবের এই মতটি নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। গ্রন্থকর্ত্তার জানা উচিত, কুকুরেরা এই তৃণকে ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে এবং ইহা তাহাদের উদরস্থ হইলে অথবা ইহার গন্ধ তাহাদের নাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে তাহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বমন বা উদ্গীরণ করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের প্রিয়তর পদার্থ নহে এবং (Carnivorous animals) মাংসাশী জীবের পক্ষে (Herbs or plants) তৃণ বা সব্‌জি কখন উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

এণ্ডির চাষ।

রঙ্গপুর জেলায় গরীব গৃহস্থগণ অবসর সময়ে এণ্ডির কার্য্য করিয়া থাকে। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরাই এণ্ডির কার্য্যে সুদক্ষ। প্রায়ই হাটে বাজারে কাটিতে বাঁধা প্রজাপতি কিনিতে পাওয়া যায়। এক পয়সা মূল্যের (১৫।২০টী প্রজাপতিযুক্ত) কাঠি কিনিয়া পালিতে পারিলে উহাদ্বারা চিরস্থায়ী কারবার এবং

বহু আয় হইতে পারে। বৎসরে আটবার উহারা সূতার "কোয়া" (বাসা) প্রস্তুত করে। এই অষ্টম পুরুষ পরিবর্ত্তনে লক্ষ লক্ষ কীট জন্মায়, এবং ক্রমেই কার্য্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত হয় যে, গৃহস্থগণ সংসারের কাজ ফেলিয়া, উহা একাধিক্রমে পালিতে পারে না। এণ্ডির কারবার "রেশমের" ব্যবসায়ের ন্যায় চিরস্থায়ী লাভজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এণ্ডির কার্য্য অত্যাশ্চর্য্য এবং আমোদজনক। একটী প্রজাপতি চারি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (১) ডিম্ব (২) কীট (৩) কোয়া (৪) প্রজাপতি।

(১) এণ্ডিপালন। ডিম্ব—প্রজাপতি ৪।৫ দিন কাঠিতে বাঁধা থাকিলে, ঐ কাঠিতে ক্রমে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ঐ ডিম্বগুলি সন্তর্পণের সহিত শুষ্ক পরিষ্কার নেকড়ায় "জলসরার" উপরে রাখিতে হয়। মাছি এবং পিপিলিকা উহাদিগের বিশেষ শত্রু—তজ্জন্য বস্ত্রাবরণে "জলসরার" উপর রাখা প্রয়োজন। ডিমগুলি ৫।৭ দিন মধ্যেই ফুটিয়া একপ্রকার সবুজবর্ণ কীটে পরিণত হয়। তখন উহাদিগকে অন্য পরিষ্কার বস্ত্রে লইয়া ডালিতে রক্ষা করিতে হয়। এণ্ডিপোকার আহার্য্য "এরণ্ড-পত্র"। এরণ্ড পত্রভোজী কীট, এই জন্যই ইহার নাম "এরণ্ডী বা এণ্ডিকীট," কলিকাতার অপভ্রংশ নাম "এঁড়ি"। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এণ্ডি পোকার আহারের জন্য অতি সুকোমল এরণ্ড-পত্র টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ডালিতে ছড়াইয়া দিতে হয়। ক্রমে পাতাগুলি খাইয়া ফেলিলে, পুনরায় পাতা দেওয়া এবং এই সময়ে পরিষ্কার করিয়া দেওয়াই ইহার কার্য্য। কারণ ময়লার সহিত থাকিলে কীট মরিয়া যায়। যাহারা এই কীটের কার্য্য করে, তাহাদিগকে খুব পরিষ্কার থাকিতে হয়। কোনরূপ তীব্র দ্রব্য ও গন্ধের দ্বারাও কীট বিনষ্ট হইতে পারে। ইহার পরম শত্রু লবণ, গন্ধক, ধূলা ইত্যাদি খেজমতগারগণ ঐ সকল দ্রব্যের সংস্পর্শদোষ হইতে কীট রক্ষা করিয়া থাকে।

(২) কীট।—ডিম ফুটিয়া গেলে ৪।৫ দিন মধ্যেই কীটগুলি দুই ইঞ্চ পরিমাণ লম্বা হয়। চারি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত কীটগুলিকে দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। ক্রমেই কীট বড় হইলে পুরু পাতা বড় বড় টুক্‌রা করিয়া দিতে হয়। কীটগুলি ২।৩ দিন পরে অল্প সময়ের জন্য রৌদ্রে রাখা প্রয়োজন। সর্ব্বদাই বস্ত্রাবরণে রাখিতে হয়। রৌদ্রের উত্তাপে কীটগুলি ঈষৎ গরম হইলেই পুনরায় ঘরে উঠাইতে হয়। ৭।৮ দিনের মধ্যে কীট সকল বড় হইলে "জলসরার আড়ে" ৫।৭টী এরণ্ডপত্র একত্র বাঁধিয়া তাহাতে পোকাগুলি ছাড়িয়া দিতে হয়। এই "আড়ের" নীচে একখানা "দরমা" বা চেটাই রাখিতে হয়। কীটগুলি

হঠাৎ পাতা হইতে পড়িয়া গেলে পুনরায় তুলিয়া রাখা আবশ্যক। প্রতিদিনই নূতন পাতার "থোপনা" বাঁধিয়া দিতে হয়; কিন্তু শুষ্ক পত্রের থোপনা আড়েই থাকে। এণ্ডী কীট এই সময়ে শুষ্ক পত্রের শিরায় শিরায় "কোয়া" অর্থাৎ বাসা করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হয়।

(৩) কোয়া।—এণ্ডী কীটের "কোয়া" প্রস্তুত শেষ হইলে, কোয়াগুলি "থোপনা" হইতে লইয়া ডালায় করিয়া রৌদ্রে (প্রতিদিন গরম না হওয়া কাল পর্য্যন্ত) রাখিতে হয়। এইরূপে ৫।৭ দিন রৌদ্রের তাপ পাইলে কোয়ার মুখ ফুটিয়া একপ্রকার ঈষৎ হরিদ্রাভ, মেটে ও সাদা বর্ণের প্রজাপতি বাহির হইয়া থাকে; খেজমতগারগণ এই প্রজাপতিগুলি লইয়া ক্রমে উহার পাখা দুইটী একত্র করিয়া কাঠিতে বাঁধিয়া রাখে। অনেক প্রজাপতি কোয়া হইতে ফুটিয়া ডালিতেই ডিম পাড়ে। ডালির ও কাঠির ডিম উভয়ই রাখিতে হয়। ডিম পাড়া শেষ হইলে প্রজাপতিগুলিকে ছাড়িয়া দিলেই যথেচ্ছ চলিয়া যায়।

সূতা প্রস্তুত—কোয়াগুলি ফুটিয়া গেলে তাহা উত্তমরূপে জলে সিদ্ধ করিতে হয়। পরীক্ষা এই যে, সিদ্ধ কোয়ার মুখ ধরিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিলে যদি সহজে পারা যায়, তাহা হইলেই হইল; নচেৎ পুনরায় সিদ্ধ করা আবশ্যক। সুসিদ্ধ কোয়াগুলির মুখ টানিয়া প্রসারিত করিয়া উহার ভিতরের প্রবিষ্ট কীটগুলি এবং ময়লা ফেলিয়া পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া "আলতা পাতের" ন্যায় রাখিতে হয়। এদেশের এণ্ডি নির্ম্মাণকারিগণ এই "কোয়ার পাত" ভাল করিয়া ধুইতে জানেনা, তাই বস্ত্র ও সূতা মলিন হয়। ব্যবসায়ীগণ ঐ কোয়ার পাত যতই পরিষ্কার করিয়া ধুইতে পারিবে, সূতার কাটতি এবং মূল্য ততই বেশী হইবে।

এতদ্দেশে কোয়ার পাত হইতে সূতা বাহির করিবার সময় উহা জলে ভিজাইয়া একখানা কাঠির অগ্রভাগে জড়াইয়া লয়, এবং ক্রমে টানিয়া "টাকুয়া" (টেকো) নামক একপ্রকার দণ্ড সাহায্যে সূতা কাটে। অন্য দেশে উহাকে "টিপ" বলে। ব্যবসায়িগণ "রেশমের" কারবারে যেরূপে সূতা প্রস্তুত করে, তদুপায় অবলম্বন করিতে পারেন।

এদেশে সাধারণতঃ এণ্ডি সূতার (২০ গণ্ডা তারযুক্ত ১॥০ দেড় হাত দীর্ঘ)০ "মোড়ক" ১৲ টাকা, ১॥০ দেড় টাকায় বিক্রীত হয়। পল সূতায় এক এক খানা ৬×৩ হাত (রেপার) চাদর প্রস্তুত হয়।

বৈশাখ হইতে আশ্বিন এই ছয় মাসে ছয়বার এবং শীতকালে অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন এই দুইবার সাকল্যে আটবার ইহাদের "কোয়া" জন্মে।

গরীব গৃহস্থগণ প্রয়োজনানুসারে দুই এক পয়সার কীট ২।৩ মাস পালন করিয়া পরিধেয় ও শীতবস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া লয়। কেহ কেহ বিক্রয় করিয়া থাকে। বার মাস এই কার্য্য করিতে পারিলে বহু লাভ হইবারই কথা। ঐ দেশে গরীব স্ত্রীলোক পোকা পালন জন্য রাখিলে থাকিতে পারে। জিজ্ঞাসায় জ্ঞাত হইয়াছি, ॥০ আনা ১৲ টাকাতেই পালিকা পাওয়া যাইতে পারে। এ ব্যবসায়ের লাভালাভ সাধারণেরই বিবেচ্য।

এরণ্ডপত্র ব্যতীত এণ্ডী কীট, মাকই, কাউয়াটুকী (আটেশ্বরী) পাতা খাইয়া থাকে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের পূর্ব্বে উহা জন্মাইতে হইবে।

(প্রতিবাসী)

সর্ব্বজ্বারক।

এই গাছ দেখিতে ছোট, কখন এক হস্তের উর্দ্ধ হইতে দেখা যায় না। সয় গাছ বা হৈমন্তিক ধান্য গাছের ন্যায় ইহার আকার কিন্তু ইহাতে ফল বা ফুল হয় না। কবিরাজ মহাশয়দিগের নিকট সর্ব্বজ্বারক গাছ বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে, ইহাতে অনেক দুশ্চিকিৎস্য রোগাদির ধন্বন্তরী বিশেষ ঔষধি প্রস্তুত হয়। ফোড়া, ঘা, খোস, চুলি প্রভৃতি গৃহ চিকিৎসা সামান্য পীড়াদিতে ইহার নিত্য ব্যবহার হয়, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বর্ষার শেষ হইতে চৈত্র অথবা বসন্ত ঋতু পর্য্যন্ত সর্ব্বজ্বারক গাছের তেজ ও শোভা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নিদাঘের প্রখর রৌদ্রে এবং বর্ষার প্লাবনে ইহা শুষ্ক এবং পূত হইয়া থাকে। ইহার মূল ঠিক খাগ্‌ড়াই সয় গাছের ন্যায়, কিন্তু তদ্রূপ কঠিন হইতে দেখা যায় না। প্রথমাবস্থায় ইহার মূল মৃণালের ন্যায় অতি কোমল এবং সুস্বাদু থাকে। ইহার পাতা ঠিক ডাক্তারদিগের লেন্চুলা ছোরার ন্যায় হয় এবং ইহাদের গায়ে সুঙ্গার ন্যায় একপ্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ থাকে; অসাবধানতা সহকারে সেই পাতায় হাত দিলে হঠাৎ মাংস কাটিয়া যায়। এই বৃক্ষ সচরাচর পাওয়া যায় না; প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺রামনাথ সেন একবার তিন টাকা দিয়া একটী সর্ব্বজ্বারক গাছ ক্রয় করিয়াছিলেন।

মোহন ফুল।

কৃষিতত্ত্বের অনেক পাঠক বোধ হয় জানেন, বালিদ্বীপে এখনও হিন্দুশাসন-প্রণালী বর্ত্তমান আছে। সেই দেশের ব্যবহার শাস্ত্র মনুসংহিতা এবং রাজকীয় ভাষা সংস্কৃত। তত্রত্য তরু, লতা, গুল্ম, পুষ্প প্রভৃতির নামও এতদ্দেশীয় সংস্কৃত ভাষানুযায়ী হইয়াছে। উপরে যে ফুলের নাম লিখিত হইয়াছে তাহা জানিনা, কিন্তু প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন "প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের শিবঠাকুরের গাজনে সন্ন্যাসীরা আপনাদের গলায় এক প্রকার লাল ফুলের মালা ব্যবহার করিত, তাহা প্রায় আজি কালি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ ফুলকে অনেকে মোহন ফুল বলিত।" এই প্রস্তাব লেখক কখনও মোহন পুষ্প দর্শন করেন নাই, কিন্তু ওয়াট্‌সন্‌ সাহেব তৎপ্রণীত জাবা ও বালিদ্বীপের ইতিহাস নামক গ্রন্থে মোহন ফুলের যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে ইহার আকার প্রকার আমাদের দেশের লাল বর্ণের স্থলপদ্মের ন্যায় বোধ হয়।

এক একটি গাছে ২০।২৫টী ফুল ফুটিতে দেখা যায়, প্রভাতে ইহা ফুটিয়া থাকে। এক একটি করিয়া ফুলগুলি শুষ্ক হইয়া না গেলে আর ফুল ফুটেনা; একটি ফুল ফুটীল, কিছুদিন সরস রহিল, তাহার পর শুষ্ক হইয়া পড়িয়া গেল। শুকাইয়া ভূমিসাৎ হইলে তৎস্থানে আবার ফুল ফুটিবে, এইরূপে ধারাবাহিক প্রণালীতে এই গাছে বারমাস ফুল থাকে। একটা গাছ ৫।৬ বৎসরের অধিক বাঁচেনা; গাছগুলি দেখিতে ঠিক্ জিয়ল গাছের ন্যায়, ফুলে গন্ধ বেশ আছে কিন্তু ভাল শোভা নাই। ইহার ফল পাকিয়া উঠিলে অনেকে তাহা পাড়িয়া লয় ও উত্তমোত্তম ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করে। এই গাছ বীজে জন্মে, ইহার কলম হয় না।

নেপেন্থীশ্।

(NEPENTHES)*

ইহা একপ্রকার মাংসাশী লতা, ইহার গাত্রে কণ্টক দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা উচ্চস্থানে উঠিতে বড় ভালবাসে। প্রাচীরের গায়ে উঠাইয়া দিলে ইহারা অত্যন্ত তেজে বর্দ্ধিত হয়। বর্ণিও হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে ইহা

* Vide Indian Agriculturist :, P. 578 (22 Nov., 1884)

প্রচুর পরিমাণে জন্মে, এবং আফ্রিকার সেচিলি ও কেনেডা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ইহা বহুসংখ্যক দেখা যায়। ইহার পাতা খুব বড় এবং তাহা দেখিতে ছোট কলসের ন্যায়, এমন সুন্দর যে, একটি মধ্যমাকার পক্ষী তাহাতে লুকাইয়া রাখা যায়। এই সকল পাতা কলস, বাটী, ঘটি, গেলাস ইত্যাদি আকারের হইয়া থাকে; জন্তু মারিবার জন্য অথবা ইহার মাংসাশী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্ত বোধ হয় ঈশ্বর ইহার পাতাকে এরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। এই লতায় কীট, পতঙ্গ কিম্বা পক্ষী বসিলে নিস্তার নাই; অনির্ব্বচনীয় প্রাকৃতিক শক্তি বলে এই লতা জীব মাংস আহার করিয়া থাকে।

নেপেন্থিশের জীর্ণকারিণী শক্তি আশ্চর্য্যজনক। ইহার পাতার ভিতরে সিদ্ধ-মাংস, দগ্ধ-আলু, ডিমের শ্বেতাংশ এবং ময়দায় শ্বেতসার রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, ২৪ ঘণ্টা পরে কেবল মাত্র অস্থি ও পরিত্যক্ত পদার্থ পড়িয়া আছে, সার পদার্থ যেন কাহারও উদরসাৎ হইয়া গিয়াছে। সিদ্ধ মাংস অতি সহজেই হজম্ করিয়া ফেলে; দুই তিন গ্রেণ অতি কঠিন ভিনিরিয়ম্ নামক পদার্থ ইহা তিন দিবসে পাক করিয়া ফেলিতে পারে। একটী আঙ্গুর ৩২ ঘণ্টায় খাইয়াছে।

বোর্নিও দ্বীপের মাংসপ্রিয় অধিবাসীরা বলে, এই লতাকে পাক করিয়া খাইলে ঠিক মাংসের আস্বাদ পাওয়া যায় এবং ইহার "কারি" ঠিক মাংসের কারি বলিয়া প্রতীত হয়। ঈশ্বরের অনন্ত বিশ্বে কত অনন্ত লীলা খেলা আছে, বিশ্বেশ্বর ভিন্ন কে তাহার নির্ণয় করিবে? লতা পাতার জীবন আছে এবং তাহারা জীবের ন্যায় আহার বিহার ও সুখ দুঃখ ভোগ করিতে পারে এ সকল পুরাণের কথা আজি কালি বিজ্ঞানের কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে।

মটর (Sweet Peas.)

ভারতবাসীর দাল, ভাত প্রধান খাদ্য, বোধ হয় এ কথা কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। সুতরাং কি উপায়ে আমরা তাহা প্রচুর পরিমাণে পাইতে পারি, তাহা আমাদের প্রত্যেকেরই বিশেষরূপে জানা উচিত। অদ্য আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে মটরের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উপরে যে মটরের প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল, উহা আমাদের দেশীয় নহে, আমেরিকা জাত। ইহাকে ইংরাজীতে ব্লুপিটার (Blue Peter) অথবা সুইট-পিজ্ (Sweet Peas) এবং বৈজ্ঞানিক মতে Pisum Sativum কহে। ইহা এতদ্দেশীয় মটর অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় চতুর্গুণ বৃহৎ হইবে এবং ইহার দানাও বৃহৎ। দেশীয় মটর অপেক্ষা যে, কেবল আকারেই বৃহৎ তাহা নহে, গুণেও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকারক এবং দেশীয় মটর অপেক্ষা সামান্য উত্তাপে শীঘ্রই উত্তমরূপ সুসিদ্ধ হয়। ইহা অনেক প্রকারের আছে, তন্মধ্যে আপেল ব্লসম্ (Apple Blossom) বোরিয়াটন্ (Boreatton) কাউন্টেস্ অফ্ র‍্যাড্নর্ (Countess of Radnor) ডিলাইট্ (Delight) এম্প্রেস অফ্ ইণ্ডিয়া (Empress of India) ইন্ভিন্সিবল কারমাইন্ (Invincible Carmine) লটিএক্‌ফোর্ড (Lottieeckford) দি কুইন্ (The Queen) মিসেস্ গ্লাড্ষ্টোন্ (Mrs. Gladstone) মিসেস্ স্যান্কি (Mrs. Sankey) প্রিমরোজ (Primrose) কুইন্ অফ্ দি আইল্স্ (Queen of the Isles) স্প্লেন্ডার (Splendor) দি সেনেটার (The Senator) আরলি ফ্রেম্ (Early Frame) ইউজিন্ (Euginie) চ্যাম্পিয়ন্ অফ্ ইংলণ্ড (Champion of England) প্রভৃতিই সর্ব্বোত্তম। এই সকল আমেরিকান মটর এক্ষণে

আমাদের দেশের অনেক স্থানে উৎপন্ন হইতেছে। বিশেষতঃ দারজিলিং প্রদেশে ইহা অবিকল আমেরিকার ন্যায় জন্মাইতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহা আমেরিকা জাত ফসল অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে বরং অনেক গুণে উৎকৃষ্ট।

ইহা বালুকা মিশ্রিত দোয়াঁশ মাটিতেই বেশ জন্মিয়া থাকে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস বপনের প্রশস্ত সময়। ৺ শ্যামাপূজার পর যখন বৃষ্টিপতনের সম্ভাবনা না থাকে, তখন জমিতে উত্তমরূপে দুইবার চাষ দিয়া তাহাতে বিঘা প্রতি ২০ মণ করিয়া গোবরের সার ছড়াইয়া দিয়া আর একবার চাষ দিতে হইবে। সারগুলি মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইবার জন্য প্রায় একপক্ষ অপেক্ষা করিতে হইবে। পরে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই কিম্বা কার্ত্তিক মাসের শেষাশেষি জমিতে ১ ফুট্ গভীর জুলি কাটিয়া ঐ জুলির উভয় পার্শ্বে ১ ফুট্ অন্তর এক একটী বীজ পুঁতিয়া দিতে হইবে। ৩।৪ দিনের মধ্যেই বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়া চারা বহির্গত হইতে দেখা যায়। এক্ষণে ইহা জানা আবশ্যক যে বীজগুলি বপনের পূর্ব্বে ১০।১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া লইতে হয়।

ইহার চারা সকল ৬।৭ হাত পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; সুতরাং চারাগুলি অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত হইলেই উহাদের মূলদেশে কঞ্চি, পাঁকাটি, ধঞ্চেকাটি অথবা তৎসদৃশ কোন অবলম্বন পুঁতিয়া দিতে হয়। পৌষ মাস হইতেই ভক্ষণোপযোগী শুঁটি ফলিতে আরম্ভ করে এবং মাঘ মাসে উহারা পাকিয়া থাকে।

মটরশুঁটি আমরা ব্যঞ্জনার্থে তরকারি স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহাতে অতি উৎকৃষ্ট খেচরান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং কচুরিরও অতি উৎকৃষ্ট পুর হইয়া থাকে। খিচুড়ী রন্ধন করিতে হইলে, প্রথমে শুঁটিগুলি ছাড়াইয়া দানাগুলি বাহির করিয়া লইতে হয় এবং উক্ত দানাগুলিকে যাঁতায় দাল ভাঙ্গার ন্যায় ভাঙ্গিয়া লইতে হয়, তৎপরে ঐ ভাঙ্গা দালগুলি থলিয়া বা চটের উপর বিছাইয়া কিছুকাল রৌদ্রের উত্তাপে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। এক্ষণে উহাদিগকে উক্ত থলিয়ার উপর দুই হস্তে পেষণ করিয়া কুলার দ্বারা ঝাড়িয়া লইলেই খোসাগুলি সহজেই পৃথক্ হইয়া যায়। এক্ষণে উহার সহিত সামান্য পরিমাণে মুগের দাউল কিম্বা খাঁড়িমুসুরির দাউল মিশাইয়া রন্ধন করিতে হয়; নচেৎ খিচুড়ী লপেট হয় না। বাহুল্য বোধে রন্ধনপ্রণালী বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইল না। মটরের আবাদে বিলক্ষণ লাভ আছে। বিঘা প্রতি ২০।২৫ মণ মটর কলাচিৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আড়াই টাকা হিসাবে মণ বিক্রয় হইলেও

বিঘা প্রতি ৫০ ৬০ টাকা আয় হইয়া থাকে ; সুতরাং ইহা যে একটী প্রধান লাভজনক কৃষিকার্য্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীহরিদাস ঘোষ,

পালপাড়া, বেলুড় পোঃ আঃ (হাওড়া)।

নারিকেল।

কোচিন, নারিকেলের জন্মস্থান, তথাকার ৪ লক্ষ লোক কেবল নারিকেলের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কোচিনের ভূমি স্বভাবতঃই উর্ব্বরা ; অপরাপর ফসলও তথায় উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু নারিকেলের চাষে বিলক্ষণ লাভ দেখিয়া কোচিনবাসীরা উহা ব্যতীত অপর কোন চাষ করিতে ইচ্ছুক নহে। কোচিনে ইংরাজদিগের অধিকৃত যে বন্দর আছে, তথায় কেবল নারিকেলের ব্যবসায় হইয়া থাকে। প্রতি সপ্তাহে তথা হইতে জাহাজপূর্ণ করিয়া নারিকেল, নারিকেলের খোল, নারিকেল তৈল, নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি (কাতা) প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে নানাদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

নারিকেল একটী উপাদেয় ও মহোপকারী কৃষিজাত পদার্থ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! এবম্ভূত লাভজনক কার্য্যে আমাদের দেশীয় জনসাধারণ সামান্য অমূলক কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া ইহার চাষে মনোযোগ করেন না। তাহারা কহে, নারিকেল রোপণ আমাদের বংশাবলীতে সহ্য হয় না এবং সেজন্য নারিকেলচাষে তাহারা একপ্রকার ঔদাস্য প্রদর্শন করে। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেককেও এই অমূলক প্রবাদ বাক্যের উপর নির্ভর করিতে দেখা যায়।

এক্ষণে দেখা যাউক নারিকেল গাছ হইতে আমরা কত রূপে, কত প্রকার উপকার পাইয়া থাকি। নারিকেলের পাতা সচরাচর আমরা জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি ; এবং উক্ত পত্রের শিরাগুলি লইয়া সম্মার্জ্জনী প্রস্তুত করি। নারিকেল ফল অপক্কাবস্থায় (অর্থাৎ যাহাকে ডাব বলা যায়) আমাদের যে একটী মহদুপকারী খাদ্য তাহা সকলেই জানেন। ইহা তৃষ্ণানাশক, গুরুপাক অর্থাৎ সহজে পরিপাক হয় না, কিন্তু ইহার জল অত্যন্ত লঘু, শীতল, স্নিগ্ধকারক, মুখরোচক, বায়ু ও পিত্তহারক। কবিরাজেরা রোগবিশেষে নারিকেল হইতে নানাবিধ ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। নারিকেলের পক্কাবস্থায় (অর্থাৎ যাহাকে ঝুনা বলে) শাঁস লইয়া ঘানিতে পেষণ

পূর্ব্বক যে তৈল পাওয়া যায় তাহাকে নারিকেল তৈল কহে। নারিকেল তৈল যে, কেবল এতদ্দেশীয় মহিলাগণ কেশে ব্যবহার করেন তাহা নয়, উহা হইতে অনেক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের দেশীয় অনেক চিকিৎসককে বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল কড্‌লিভার অয়েলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। নারিকেলের শাঁস বাহির করিয়া লইয়া শূন্য খোলটি হুঁকারূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। নারিকেলের সর্ব্বোপরিস্থ আবরণ (যাহাকে ছোবড়া বলে) হইতে উৎকৃষ্ট মজবুত দড়ি প্রস্তুত হয়, উহাকে কাতা কহে।

নারিকেল চাষে বড় একটা অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। একবার জন্মাইতে পারিলেই আজীবন ফলভোগ করা যায়। প্রথমতঃ একটী বেশ সুপক্ব (কাট ঝুনো) নারিকেল লইয়া এমন স্থানে প্রোথিত করিবে যাহাতে সদাসর্ব্বদা জল পাইয়া থাকে। রোয়াক বা দাওয়ার নীচে যেখানে আমরা সচরাচর হাত পা ধুইয়া থাকি সেই স্থানই উহা রোপণের প্রশস্ত স্থান। একমাস বা দুইমাস মধ্যে নারিকেল হইতে চারা বহির্গত হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসই নারিকেল জন্মাইবার উপযুক্ত সময়। পরে যে পর্য্যন্ত না বর্ষাগম হয় তাবৎ চারাটী ঐ স্থানেই থাকিবে। বর্ষারম্ভে উহাকে উঠাইয়া লইয়া নিরূপিত জায়গায় রোপণ করিতে হইবে। নারিকেল নোনা মৃত্তিকায় ভালরূপ জন্মায় বলিয়াই, অনেকে রোপণ করিবার সময় গর্ত্ত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ লবণ নিক্ষেপ করিয়া চারা জন্মাইয়া থাকে।

যেখানকার মাটী যত সরস, তথায় তত অধিক পরিমাণে নারিকেল জন্মিয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি পুষ্করিণীর ধারে নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিলে যেরূপ শীঘ্র ফল ফলিয়া থাকে অপর জায়গায় সেরূপ হয় না।

এক্ষণে দেখা যাউক প্রত্যেক নারিকেল গাছে বাৎসরিক কত লাভ হইয়া থাকে। এক পয়সা করিয়া একটী নারিকেল বিক্রয় করিলেও প্রত্যেক গাছে অন্ততঃ ১২।১৪ টাকা আয় হইয়া থাকে, সেজন্য আমাদের দেশীয় কৃষকগণ সাধারণতঃ এক বিঘা জমির রাজস্বের সহিত একটী নারিকেল গাছের তুলনা দিয়া থাকে। নারিকেল গাছের অপর কোন পাইট করিতে হয় না; তবে বর্ষাগমে উহাদের গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয় এবং বর্ষান্তে গোড়ায় মাটি চাপা দিতে হয়। এজন্য কৃষকমণ্ডলীর মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যথা—

গোড়ে গোবর কলার মাটি।
বৎসরান্তে নারিকেলের শিকড় কাটি॥

অর্থাৎ সুপারিমূলে গোবর, কদলিমূলে মৃত্তিকা ও প্রতিবৎসর নারিকেল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। ইহা ব্যতিত বর্ষাকালে নারিকেলের পাতা কাটিয়া দিতে হয়, যাহাকে চলিত কথায় "গাছ ছাড়ান" কহে। আরও একটী প্রবাদ আছে যে "দাতার ডাব" অর্থাৎ যত ডাব কাটা যায় তত ফলন বৃদ্ধি হয়।

নারিকেলের বৈরী।

পোকা ধরিয়া যেমন বড় বড় সুস্বাদু আম্র ফলকে একেবারে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলে, তদ্রূপ ইন্দুর ধরিয়া ভাল ভাল নারিকেলগাছ এবং নারিকেল ফলকেও নষ্ট করিয়া দেয়। ইন্দুর দ্বারা ইক্ষু ও নারিকেল বৃক্ষের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। আমেকায় ইন্দুরের অত্যন্ত উপদ্রব দেখা যায়; ভারতেও নিতান্ত কম নহে। মান্দ্রাজের কৃষিবিভাগের ডাইরেক্টার শ্রীযুক্ত ডি, মরিশ সাহেব ইন্দুরের উপদ্রব হইতে নারিকেল বৃক্ষকে রক্ষা করিবার জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "Planters' Gazette" নামক সংবাদপত্রে একটী সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা হইতে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কাল এবং ধূসর বর্ণের ছোট ছোট ইন্দুর মান্দ্রাজের নারিকেল বৃক্ষের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। নারিকেল ফল কিশোরাবস্থা প্রাপ্ত হইতে না হইতে উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা কৌতুক বশতঃ বহুসংখ্যক নারিকেল নষ্ট করে। কৌতুক বশতঃ জিনিষ নষ্ট করা খলস্বভাব ইন্দুর জাতির পৈত্রিক ধর্ম। বেজি বা নেউল (Mongoose) ইন্দুরের বিষম শত্রু। নেউল পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেই ইন্দুরেরা নারিকেল বৃক্ষে পলাইয়া নিশ্চিন্ত হয়; কারণ বেজিরা বৃক্ষারোহণ করিতে জানে না। আবাদের সময় ভূমিতে নিরাপদ স্থান না পাইয়া (বিশেষতঃ নেউলের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত) ইন্দুরেরা গাছে আরোহণ করিয়া থাকে। ইহাতে নারিকেল বৃক্ষের প্রভূত ক্ষতি হইতে দেখা যায়। গত বর্ষে প্রায় এক সহস্র টাকার ফল ও গাছ এইরূপে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। পোর্ট মেরিয়ার প্রসিদ্ধ ডাক্তার কার্ণর সাহেব নারিকেল বৃক্ষ ও তাহার ফলকে ইন্দুরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন লিখিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। তাহার নিম্নলিখিত উত্তরগুলি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যোসেফ সিয়ার বলেন, "বৈদ্যুতিক লৌহ (Galvanized Iron) নির্ম্মিত বড় বড় পাত (leaf) প্রস্তুত

করিয়া এবং তাহার মধ্যে মধ্যে বৈদ্যুতিক লৌহের শৃঙ্খল বসাইয়া বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত তাহা ঝোলাইয়া রাখিতাম। সময়ে সময়ে টিনের পাত করা হইত তাহাতেও বৈদ্যুতিক লৌহ প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত থাকিত। এই উপায়ে বহুসংখ্যক ইন্দুর মারা গিয়াছিল, এমন কি দুই বৎসরে আর ইন্দুর দেখা যায় নাই। ইহার উপর দিয়া ইন্দুর গমনাগমন করিলেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইত।” জন ক্লার্ক বলেন, “আমি দস্তার পাত প্রস্তুত করিয়া গাছের ধারে রাখিতাম এবং অন্যান্য পথ একেবারে বন্ধ করিয়া ইন্দুর সকলকে ঐ পাতের উপর দিয়া যাইতে দিতাম। ঐ পাতের উপর দিয়া ইন্দুরগণ সহজে যাইতে পারিত না; যাহারা পারিত তাহারা আর বাঁচিত না। উহার উপরে গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত থাকিত।” কিংস্টনেক্ বলেন, “আমি টেলিগ্রাফের তার খুব সরু করিয়া প্রস্তুত করিয়া গাছের ধারে ধারে টাঙ্গাইয়া দিতাম; কৌতুকপ্রিয় ছোট ছোট ইন্দুরেরা তাহাতে খেলা করিতে আসিত, কিন্তু অধিকাংশই শেষে জীবলীলা সম্বরণ করিত।” উলেট্ সাহেব একটী সহজ উপায় বলিয়াছেন, “নারিকেল গাছের গোড়ায় ফস্‌ফরসের আটা মিশ্রিত (Sandwitechs of bread প্রোথিত করা উচিত এবং গাছের ডালেও উহা দিতে হইবে।”

শ্রীহরিদাস ঘোষ,
বেলুড়, পালপাড়া (হাওড়া)

মাকাল ফল।

“দেখিতে লোহিত ফল অতি মনোহর।
কর্দ্দমে পূরিত দেখি ভাঙ্গিলে ভিতর॥” (উদ্ভট)

পাঠক! তোমার সুশোভিত, সুপ্রশস্ত এবং সুউচ্চ অট্টালিকার ছাদের রেইলিংএর ধারে অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া যে বৃহদাকার লতাটি বাতাসের ভরে একবার এদিক, একবার ওদিক করিয়া দুলিতেছে এবং যাহার ভিতর হইতে মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী সুন্দর এবং সুগোল লাল ফল উঁকি মারিয়া তোমার নয়নযুগলের প্রীতি সম্পাদন করিতেছে, ঐ লতাটি কি জান? উহার শাখায় যে ফল দেখিতে পাইতেছ, উহার মত মনোহর ফল বোধ হয় জগতে আর নাই, কিন্তু উহাকে ভাঙ্গিয়া দেখ, উহার ভিতরে দুর্গন্ধময় কদাকার এবং অপবিত্র এক

প্রকার কর্দ্দমবৎ কৃষ্ণকার পদার্থ অতি কদর্য্যভাবে বিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। নির্গুণ এবং অন্তঃসারবিহীন মনুষ্যের কথা উঠিলেই ভারতীয় কবিকুল পলাশ পুষ্প ও এই ফলকে আসরে আনিয়া হাজির করান। ঐ ফলের নাম মাকাল ফল এবং ঐ লতাটি উহারই লতা। ফলগুলি অত্যন্ত (গাঢ়) লাল এবং সুগোল; ইহার আবরণে উত্তম চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ভিতরে যে কাদার মত কালবর্ণের দুর্গন্ধময় পদার্থ দৃষ্ট হয় তাহাতেই বীজ থাকে। ঐ বীজ বৎসরের যে কোন সময়ে আজ্জাইলেই লতা জন্মিবে। এই লতা চিরকাল সজীব ও সুস্থ থাকে, এই জন্য ইহাকে অনেকে "চিরযৌবন ফল" বা "চিরযুবতী লতা" বলে। বৎসরের সকল ঋতুতেই ইহা ফল প্রদান করে এবং এই লতা প্রায় কখন মরে না; এক একটা লতা ২০।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। লতার পক্ষে এই আয়ু সামান্য নহে, এই জন্য ইহাকে তরুতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা Ever Green Plant কহিয়া থাকেন। মাকাল ফল কবিরাজদিগের নিকট বিশেষ আদৃত; কারণ ইহাদ্বারা অনেক প্রকারের উত্তম ঔষধ প্রস্তুত হয়। আমরা শুনিয়াছি, সর্পদংষ্ট্র ব্যক্তির চিকিৎসায় ও বিসূচিকা রোগগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা সময়ে এই ফলের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বৈদ্যেরা অত্যন্ত প্রশংসা করেন। কোন কোন সময়ে কলিকাতা প্রভৃতি নগরে এই ফল ও লতা ব্যবসায়ীরা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহার পাতা পাঁচনে লাগে, সুতরাং ঔষধ বিক্রেতা বেণেরা ইহা দোকানে রাখে। অন্ততঃ ঔষধের জন্য আমাদের দেশের লোকেরা এক একটা গাছ গৃহপ্রাঙ্গণে রক্ষা করিলে আমাদের মঙ্গল আছে। এই ফলের চমৎকারিণী শোভা দেখা যায় বটে কিন্তু বিষাক্ত। পক্ষীগণ অবাধে ইহা আহার করিয়া শরীরের পুষ্টিতা সম্পাদন করে কিন্তু মানুষে খাইলেই মরিয়া যায়। আমার বিবেচনায় এই লতা সকলের চিনিয়া রাখা উচিত। এদেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা এবং বৃদ্ধ পুরুষেরা বৈদ্যশাস্ত্র সম্মত অনেক গাছের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই, অথচ হয়ত সেই সকল গাছ তাঁহার গ্রামে অন্বেষণ করিলে রাশি রাশি পাওয়া যায়। বিদেশীয় সভ্যতা ও বিদেশীয় শিক্ষার গুণে আমাদের এমনই দুরবস্থা ঘটিল যে, বর্ত্তমান বংশের (Generation) অন্তর্ধান হইলে আমরা হয়ত তুলসী গাছ পর্য্যন্ত চিনিতে পারিব না। মার্শেল নীল কিম্বা জেস্‌মিন্ অনায়াসেই অনেকে চিনিতে পারেন, কিন্তু তৈল কুর্চ্চী নাম্নী অতি প্রয়োজনীয় লতার নাম পর্য্যন্ত হয়ত অনেকে শুনেন নাই !! অপরন্তু কিং ভবিষ্যতি !!

কর্দ্দম।

মৃত্তিকা জলমিশ্রিত ও মর্দ্দিত হইলে কর্দ্দম হয়। ঐ কর্দ্দম পর্য্যুষিত হইলে উহা ঔষধশক্তি ধারণ করে। দিনে সূর্য্যকিরণ ও রাত্রে চন্দ্ররশ্মির বিকীরণ হেতু উহাতে গুণান্তর উৎপন্ন হয়। কৃত্রিম ও স্বভাবিক ভেদে কর্দ্দম দুই প্রকারে উদ্ভূত হয়। (১) মনুষ্য কর্ত্তৃক জলক্ষেপ ও হস্তালোড়ন দ্বারা যে কোনও ঋতুতে উৎপাদিত হয়। (২) বর্ষাকালে ধরাতলে বৃষ্টিপাত ও তদুপরি গো-মনুষ্যাদির পদ নিপীড়নদ্বারা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মৃত্তিকা "ক্ষিত্যপ্ তেজোমরুদ্ ব্যোম" এই পঞ্চভূতের অগ্রগণ্য। মৃত্তিকা হইতে রসগ্রহণ করিয়া অগণিত উদ্ভিজ্জাদি নিজ নিজ অপূর্ব্ব শক্তিনিচয় সংগ্রহ করিতেছে। ইহাতে জল, তেজঃ, মরুৎ রহিয়াছে। পাশ্চাত্যমতে এক মৃত্তিকা ভিন্ন চারিটীর অধিক মৌলিক পদার্থের সংযোগে গঠিত পদার্থ অতীব বিরল। উক্ত মতে, মৃত্তিকার গঠনোপকরণ চতুর্দ্দশটী মৌলিক পদার্থ, তন্মধ্যে আটটী বাষ্পীয় প্রভৃতি নানাবিধাত্মক এবং ছয়টী ধাতব পদার্থ।

কর্দ্দমো দাহপিত্তার্ত্তি শোথঘ্ন শীতলঃ রসঃ।

কর্দ্দমের রস—স্থান ভেদে মধুর, লবণাক্ত ও কষায় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কষায় বায়ুর, লবণাক্ত পিত্তের এবং মধুর মৃত্তিকা কফের প্রকোপক হইয়া থাকে। উক্ত আছে—"কষায়া মারুতং পিত্ত মূষরা মধুরা কফম্।"

বীর্য্য—শীতল;

গুণ—দাহ, পিত্তরোগ ও শোথঘ্ন এবং সারক। দাহঘ্ন অর্থাৎ শৈত্যবশতঃ ইহার প্রলেপ দেহগত বা অঙ্গগত জ্বালা নিবারণ করিতে সমর্থ। পিত্তরোগঘ্ন অর্থাৎ ইহার বাহ্যপ্রয়োগ ভ্রাজক পিত্তের প্রশমক বলিয়া তজ্জনিত ব্রণাদি উদ্গম বিদূরিত করে। ইহা "শোথঘ্ন" উক্ত হইয়াছে, কিন্তু বাতপিত্তজনিত (হস্তপদাদির) স্থানিক শোথে প্রলেপ দিলে, দুই কারণে উপকার দর্শে; প্রথম, ইহা উক্ত দোষদ্বয়ের স্বতঃই প্রশমক; দ্বিতীয়, ইহার প্রলেপ শুষ্ক হইবার কালে সংকোচন ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তদ্দ্বারা শোথের উপশম হইতে পারে।

মৃত্তিকা যে নানাবিধ উৎকট চর্ম্মরোগের উপকারী, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই—অনেক বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসান্তে হতাশ হইয়া পরিশেষে তুলসীতলার মাটী বা গঙ্গাতটের মাটী সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে

অবশেষে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। অবশ্য, এ স্থলে বিশ্বাস এবং দ্রব্য শক্তি দুইই ধরিতে হইবে।

মাটির ঈদৃশী শক্তি থাকিলেও অনাবৃত ক্ষতমধ্যে অসাবধানে মাটি নিক্ষেপ করা উচিত নহে, যেহেতু তন্মধ্যে উহা আবদ্ধ হইয়া চারিদিক হইতে পুরিয়া উঠিলে অভ্যন্তরে পূঁজ ও যন্ত্রণার বৃদ্ধি এমন কি নালী পর্য্যন্ত হইতে পারে।

কর্দ্দম "সারক" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বেল, পেঁপে প্রভৃতি যেরূপ পরিপাক পাইয়া উহাদের নিঃসারাংশ মলরূপে স্বয়ং বহির্গত হয়, অন্য আবদ্ধ মলকেও বহির্গত করে, কর্দ্দমের সেরূপ শক্তি নাই। কর্দ্দম স্বয়ং পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া, উহার প্রায় সর্ব্বাংশই অধঃপথে নির্গত হইয়া যায়, তৎসঙ্গে কোষ্ঠসংলগ্ন মলকেও নিঃসারিত করে।

(১) কলসীতে গঙ্গাজল বা অন্য কোনও স্রোতস্বতীর জল ধরিয়া রাখিলে, নীচে যে কর্দ্দম সঞ্চিত হয়, তাহার শৈত্যগুণ সমধিক। ইহা নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিয়া শয়ান থাকিলে, পেট ফাঁপা ও আবদ্ধবাত ও মূত্ররোধের প্রতিকার হয়।

(২) প্রান্তরে শস্যক্ষেত্রে কলায় উৎপন্ন হইলে, ক্রমে পরিপক্ক ও সংগৃহীত হইবার পর যখন গৃহে আনীত হয়, তখন সেই কলায়স্তূপের মধ্য হইতে মাটির চটা উঠাইয়া রাখিতে হয়। এই চটা উদরে প্রলেপ দিলে কলসীর নিম্নসঞ্চিত মাটির যে যে গুণ, তদপেক্ষা সমধিক গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) কোনও কোনও নদীর তটে যে কোমল পাতলা মৃত্তিকার স্তর পাওয়া যায় তাহারও এই শক্তি আছে।

(৪) আঠালো মাটি দিয়া নিত্য নিত্য দাঁত মাজিলে দাঁত বহুকাল শক্ত থাকে।

(৫) ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর তীরে একরূপ অত্যন্ত আঠালো সুন্দর লালবর্ণ মৃত্তিকা পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকায় পুত্তলিকাদি প্রস্তুত করিয়া শুধু রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলেই পোড়ানো জিনিস বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ শক্তও হয়। এই মাটির গুণ প্রায় গৈরিকের (গিরিমাটির) তুল্য হইয়া থাকে।

(৬) কর্দ্দম শুষ্ক ও দগ্ধ হইলে তাহাতে গুণান্তর উপনীত হয়। পোড়ামাটি শোধক, সঙ্কোচক ও কিয়ৎপরিমাণে রক্তরোধক। ফোলা ও ব্যথাযুক্ত স্থানে পোড়ামাটির গুঁড়া (তামাকের গুল প্রভৃতি দ্রব্যান্তরের সহিত) প্রলেপ দিবার নিয়ম আছে। পোড়ামাটির চূর্ণের সহিত দাঁত মাজিলে মাড়ীর পূঁজ

ফোলা ও রক্ত পড়া নিবারিত হয়। এই চূর্ণ ৩।৪ রতি যথাযুক্ত অনুপানে সেবন করাইলে রক্তপিত্তের রক্তস্রাব নিবারিত হয়। আঠালো মাটি পোড়াইয়া লইলে, এই শক্তি অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মূলকথা এই—মৃত্তিকার মধ্যে যে স্বাভাবিক ধাতব অংশ আছে, উহা অগ্নিদগ্ধ হইলে অন্যান্য অংশের হ্রাস প্রাপ্তি হেতু সেই ধাতবাংশের সমধিক প্রকটন হইয়া থাকে; এই ধাত্বংশই উল্লিখিত শক্তির হেতুভূত। চরকসংহিতায় সূত্রস্থানে শোণিতাস্থাপক দশবর্গ যথা—"মধু মধুক রুধির মোচরস মৃৎকপাল লোধ্রগৈরিক প্রিয়ঙ্গু শর্করা ইতি দশেমানি শোণিতস্থাপকানি ভবন্তি।" মৃৎকপাল শব্দের অর্থ "খাপরা বা খোলা।"

(৭) স্ত্রীলোকেরা পোড়া মাটী খাইতে ভালবাসে। ধাতুবিশেষে ইহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর হইয়া থাকে, ইহা রজঃসংকোচক ও পাণ্ডুরোগজনক। ঋষি—২য় বর্ষ—১ম সংখ্যা।

শর্কর পারা।

ইহা কাবুল দেশ-জাত একপ্রকার বৃক্ষের ফল; সেখানকার লোকেরা ইহাকে সাধারণতঃ "শর্কর পারা" বলিয়া থাকে। সংস্কৃত শর্করা এবং পারস্য সকর শব্দের বাঙ্গালা অর্থ "চিনি"; বাস্তবিক এই সুমধুর ফলের আস্বাদ ও উপকারিতা এত প্রশংসার যোগ্য, যে ইহার শর্কর নাম ব্যর্থ হয় নাই। এই ফল কাবুলী মুসলমান ব্যবসায়ীরা কলিকাতা এবং অপরাপর স্থানে বিক্রয় করিয়া থাকে; প্রায় প্রধান প্রধান সহরে কাবুল দেশ-জাত-ফল-ব্যবসায়ীর দোকানে 'শর্কর পারা' পওয়া যায়। শীত ঋতুতে কাবুলীয় পাঠানেরা দেশবিদেশে অন্যান্য ফলের সহিত ইহা বিক্রয় করিয়া থাকে। কোন কোন সময়ে এক একটী ফল তিন পয়সা হইতে চারি পয়সা পর্য্যন্ত বিক্রীত হয়। এই ফলের আকার কাকৃজি নেবু হইতে কিছু বড়। খোলা, ভিতরের শাঁস, বীজ প্রভৃতির তুলনায় প্রথম দৃষ্টিতে ইহাকে কাকৃজি নেবু বলিয়াই ভ্রম জন্মে। শর্কর পারার আস্বাদন অম্লমধুর এবং শাঁসটি কোমল সৌগন্ধময়। ইহার উত্তম সরবৎ প্রস্তুত হয়; এবং উষ্ণদুগ্ধের সহিত ইহার রস মিশ্রিত করিয়া দিলে দুগ্ধের দুগ্ধত্ব নষ্ট হয় না, অথচ উত্তম সুস্বাদযুক্ত, সুবাসিত, পাচক, সারক এবং প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়। শীতকালে এই ফল অধিক পরিমাণে এই দেশে আসিয়া

থাকে। পঞ্জাব, পেশোয়ার, আফগানিস্থান এই তিন স্থানের শর্কর পারা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কাবুল শীত-প্রধান স্থান; তথাকার মনুষ্য, পশু, পক্ষী, লতা, গুল্ম, বৃক্ষ, ফুল, ফল সমুদায়ই শৈত্যসহ। কাবুলে যে সকল ফল হয়, তাহার অধিকাংশ এদেশে হয় না; তাহার কারণ এই যে, এদেশ উষ্ণ-প্রধান এবং কাবুলের জল-বায়ু স্বতন্ত্র। শর্কর পারা এদেশে সহজে জন্মেনা, কিন্তু এদেশস্থ কোন কোন সম্ভ্রান্ত ধনবান্ ব্যক্তি যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়া কাবুল দেশজাত কোন কোন ফলের বীজ এদেশে বপন করিতেছেন। আমরা এপর্য্যন্ত এদেশে শর্কর পারা ফলের বৃক্ষ জন্মিতে দেখিনাই, কিন্তু শুনিয়াছি কোন কোন স্থানে পরিশ্রম সফল হইয়াছে। কাবুলীয় পাঠানেরা বলেন, এদেশের লোকেরা যে প্রণালীতে উহা বপন করিবার চেষ্টা করেন, তাহা কোন কার্য্যেরই নহে। তাহাদের মতে যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত, তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে লিখিয়া দিলাম।

শর্কর পারার বৃক্ষ দেখিতে ঠিক নেবু গাছের ন্যায়। গাছের পাতা নেবু গাছের পাতা হইতে কিঞ্চিৎ পুরু ও বড়; কিন্তু কণ্টকাদি ঠিক নেবু গাছের মত। লতা ও কণ্টক যদিও ভিন্ন নয় বটে, কিন্তু উভয়ের পুষ্পে বড় বিভিন্নতা আছে। শর্কর পারার ফুল লোহিতবর্ণ, ক্ষুদ্র এবং বড় মনোহর; নেবুর ফুল ক্ষুদ্র ও শ্বেত-বর্ণ। উভয় ফুলেরই সৌগন্ধ অতি চমৎকার বটে, কিন্তু নেবু ফুলের মত কড়া গন্ধ শর্কর পারা ফুলে নাই। নেবু ফল অপেক্ষা শর্কর পারা ফল দেখিতে মনোহর এবং বড় নয়নানন্দদায়ক; দূর হইতে ছোট ছোট লাল লাল ফলগুলি যখন দৃষ্টি-পথে পতিত হয় এবং সমীরণ যখন ইহার সৌগন্ধ লইয়া গিয়া নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করায়, তখন মনে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দের উদয় হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এক একটা গাছে ২৫০ হইতে ৩০০টা পর্য্যন্ত ফল জন্মে, বৃক্ষের উচ্চতা ঠিক নেবু গাছের ন্যায়।

আষাঢ় মাসের প্রথমে বৃষ্টি বর্ষণ হইয়া ভূমি সিক্ত হইলে, জমিতে একবার লাঙ্গল দিবে, তদনন্তর সেই মাটীর সহিত শুষ্ক বালুকা এবং চুণ মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। কর্ষণের ৬ দিন পরে সেই জমির মাটি কোদালের দ্বারা কাটিয়া ফেলিবে। তদনন্তর ইহাতে কোন প্রকারের সার ফেলিয়া সমুদয় মাটি চোস্ত (Level) অর্থাৎ সমতল (Even) করিবে। এই সকল হইয়া গেলে যে যে স্থানে বীজ ফেলিতে হইবে, সেই সেই স্থানে অল্প অল্প গর্ত্ত করিয়া গর্ত্তের

ভিতরে কোন প্রকারের মাংস খণ্ড রাখিতে হইবে। মাংস রাখিয়া তদুপরি মাটি চাপা দিতে হইবে। মাংস পূত হইয়া গেলে, ঐ স্থান পুনরায় খনন করিয়া উহাতে বীজ ফেলিবে। পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত যে ঐ বীজে মাসের মধ্যে একবার জল দিলেই যথেষ্ট হইবে মেঘের জল হইতে রক্ষা করিবার জন্য বীজ স্থানটীর উপর আবরণ দেওয়া আবশ্যক, এতদ্ভিন্ন ইহার আর কোন প্রক্রিয়া নাই। কার্ত্তিক মাসে চারা দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া থাকিলে পর বৎসর শীত ঋতুতে ফল ধরিবে। দ্বিতীয় বৎসরে যে ফল হইবে তাহা বৃক্ষ হইতে গ্রহণ করা উচিত নহে। তৃতীয় বর্ষ হইতেই ফল সংগ্রহ করা উচিত। এক একটি বৃক্ষ প্রায় ৭।৮ বৎসর জীবিত থাকে।

বীজ রাখিবার প্রণালী—ফল অত্যন্ত পাকিয়া উঠিলে কিম্বা রৌদ্রে অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া গেলে তাহা হইতে বীজ-সংগ্রহ করিয়া ঐ বীজ কাচের বোতলের মধ্যে এমন ভাবে রাখিবে, যেন তাহাতে জল কিম্বা বাহিরের বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। বীজ বপনের সময় কাবুলবাসীরা বীজগুলিতে পশুর চর্ব্বি মাখাইয়া দেয়, এদেশে বোধ হয় পশুচর্ব্বি ব্যবহার করিতে অনেকে অসম্মত হইবেন।

কৃষি পরীক্ষা।

(সরকারী রিপোর্টের সারাংশ)

১৮৯৯ সালের এপ্রেল হইতে ১৯০০ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই এক বৎসরের সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা ও যত্নে দেশীয় কৃষি সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ের পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত হইয়াছে; তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষিকার্য্যের পরীক্ষার জন্য স্থানে স্থানে গভর্ণমেণ্টের কিছু কিছু আবাদী জমী আছে এবং ঐ সকল জমীতে আবাদ করিয়া ফসলের ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়া থাকে। ঐ সকল জমীকে এক্সপেরিমেণ্ট্যাল্ ফারম্ (Experimental Farm) অর্থাৎ "আদর্শ কৃষিক্ষেত্র" বলে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে যে কয়েকটী "আদর্শ কৃষিক্ষেত্র" আছে তন্মধ্যে শিবপুর, বর্দ্ধমান এবং ডুমরাঁও প্রধান। এই সকল ক্ষেত্রে অন্যান্য বৎসরের

ন্যায় এবারেও (১) সার, (২) নূতন উৎকৃষ্ট কৃষিযন্ত্র, (৩) চাষ আবাদের বিভিন্ন প্রথা এবং (৪) নূতন জাতি ফসল—এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা হইয়াছিল।

"বর্দ্ধমান আদর্শ কৃষিক্ষেত্র" মিষ্টার ডি, এল, রায় তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। মিষ্টার এন্. এল্. ব্যানার্জী "ডুমরাঁও আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের" পরীক্ষা করিয়াছিলেন। "শিবপুর আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে" শিবপুর কৃষি বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক মিষ্টার এন্, জি, মুখার্জী তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বিলাত প্রত্যাগত কৃষিতত্ত্ববিদ।

জমির সার।

হাবড়ার শিবপুর, বৰ্দ্ধমান এবং বিহার-ডুমরাওনের আদর্শ-কৃষিক্ষেত্রে সারের পরীক্ষা, এ বৎসরও হইয়াছিল। ধান জমির পক্ষে কোন্ সার ভাল? বৰ্দ্ধমান আদর্শ ক্ষেত্রে তিন রকমে তিনপ্রস্থ সারের পরীক্ষা হয়। গোবর, রেড়ির খৈল, হাড়ের গুঁড়া এবং হাড়ের গুঁড়া ও সোরা দিয়া, এক প্রস্থ পরীক্ষা হয়। হাড়ের গুঁড়া ও সোরার সারেই ফসল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফলিয়াছিল বটে; কিন্তু গোবরের সারেই বেশী লাভ হয়। অর্থাৎ সোরা মিশ্রিত হাড়ের গুড়ার সার দিয়া, প্রতি তিন বিঘা জমির ফসলে, লাভ হয় ৩৮৲ টাকা; আর গোবরের সার দিয়া ৪০৲ টাকা। কথা এই, হাড়ের গুঁড়ায় খরচা পড়ে বেশী; আর গোবরের সারে খরচা অল্প। কাজেই হাড়ের গুঁড়া ও সোরার সারে ফসল বেশী জন্মাইলেও, খরচা বেশী পড়ে বলিয়া লাভ কম হয়; আর গোবরের সারে ফসল কিছু কম হইলেও, লভ্যাংশ বেশী দাঁড়ায়। রেড়ির খৈলের সার, হাড়ের গুঁড়া অপেক্ষা নিকৃষ্ট; আবার শুদ্ধ হাড়ের গুঁড়া (সোরা মিশ্রিত নহে) গোবর অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অন্যরূপেও এই কয়েকটী সারের পরীক্ষা হয়। তাহাতেও সিদ্ধান্ত হয় যে, ধান জমির ফসল বৃদ্ধির পক্ষে অস্থিচূর্ণ ও সোরার সারই উৎকৃষ্ট; আর কোন কোন ক্ষেত্রে গোবরের সার অপেক্ষা ইহাতে যে লাভাংশ বেশীও না হইতে পারে, এমন নহে। উদ্ভিজ্জ সারের পরীক্ষায় দেখা যায়, গোবরের সার অপেক্ষা পাটের সার উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ ক্ষেত্রে পাট ছড়াইয়া সেই পাটের সহিত জমি চষিয়া, সেই জমিতে ধান বুনিলে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়, জমিতে শুদ্ধ গোবরের সার দিলে, তাহাতে তদপেক্ষা অল্প ফসলই ফলিয়া থাকে। তিন বিঘা জমিতে ৫০ মন গোবর-সার দেওয়া হয়, অপর তিন বিঘা জমিতে ৫০ মন পাটের সার দেওয়া

হয়; পাটের সারেই ফসল বেশী হইয়াছিল। ইহা হইল বর্দ্ধমান আদর্শ-কৃষি-ক্ষেত্রের কথা। ডুমরাওনের আদর্শ-ক্ষেত্রে ধান জমির জন্য এই কয়েকটী সারের পরীক্ষা হয়, (১) গোবর (২) হাড়ের গুঁড়া, (৩) রেড়ির খৈল; (৪) ঘুঁটের ছাই; (৫) ঘুঁটের ছাই ও সোরা (৬) গোবর এবং রেড়ির খৈল (৭) হাড়ের গুঁড়া ও সোরা। এখানে রেড়ির খৈলের সারেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়। কেবলমাত্র হাড়ের গুঁড়ার সারে বেশী ফল হয় নাই; অন্যান্য কয়েকটী সার প্রায় তুল্যমূল্য। গমের জমির পক্ষে সোরা মিশ্রিত গোবর এবং জঞ্জাল আবর্জ্জনার সারই উৎকৃষ্ট বলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে। শিবপুর আদর্শ-ক্ষেত্রের পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, ধান জমির পক্ষে মহুয়ার সারেও বেশ ফল হইতে পারে। আমাদের দেশে চাষীরা সাধারণতঃ গোবরের সার ব্যবহার করে। গোবরের সার যে সহজপ্রাপ্য উৎকৃষ্ট সার, উপরের পরীক্ষায় তাহা একরূপ প্রমাণিত হইতেছে।

উপরে যে প্রকার সার পরীক্ষার কথা বিবৃত হইল—তদ্ব্যতীত আরও দুই দফায় দুই প্রকার সারের পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম সার প্রয়োগের বিশেষত্ব ছিল। যাহাতে প্রত্যেক প্রকার সার হইতে প্রতি একারে ৫০ পাউণ্ডের অনধিক নাইট্রোজেন (Nitrogen) জমী প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরিমাণ সার প্রয়োগ করা হইয়াছিল। এরূপ সার প্রয়োগ করিতে হইলে একটা সারে কি পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে, তাহা অগ্রে পরীক্ষা করিতে হয়। এবং পরীক্ষাপ্রাপ্ত হিসাব অনুসারে সেই পরীক্ষিত সারের হিসাবানুযায়ী যতটা ইচ্ছা নাইট্রোজেন জমীতে মিশ্রিত করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ৫০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন প্রয়োগ পরীক্ষায়—হাড়ের গুঁড়া মিশ্রিত সোরা দিয়া এক স্থলে ধান্যের ফলন গোবর সারের অপেক্ষা বেশী ও লাভজনক হইয়াছিল। শুদ্ধ হাড়ের গুঁড়াতেও ফলন মন্দ হয় নাই। কিন্তু কেবল সোরা সার ধান্যের পক্ষে নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

শেষ দফায়—কেবলমাত্র দুই প্রকারের সারের পরীক্ষা হইয়াছিল। গোবর সার ও গ্রিন মেনিউরিং (Green Manuring) অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ সার। শেষোক্ত প্রকার সার প্রয়োগ প্রথা আমাদিগের প্রচলিত নাই। ধান্য রোপণ করিবার পূর্ব্বে জমীতে পাট চাষ করা হইয়াছিল। এবং সেই পাট গাছ হইতে পাট বাহির না করিয়া—সমস্ত গাছগুলি কাটিয়া জমির সহিত চষিয়া সারের কার্য্য করে। ইহাই হইল "গ্রিন ম্যানিওর" অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ সার। কেবল যে

পাটই উদ্ভিজ্জরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে। অন্যান্য ফসলের গাদ উক্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রান্তর হইতে উৎপন্ন পাট গাছও গ্রিন ম্যানিওরের কার্য্য করিতে পারে। বর্দ্ধমান ক্ষেত্রের পরীক্ষায় উদ্ভিজ্জসার দিয়া ধান্ত গোবর-সার দেওয়া অপেক্ষা বেশী ফলিয়াছিল—লভ্যাংশও বেশী দাঁড়াইয়াছিল।

পাট।—পাটবীজ বপনের পর বৃষ্টিপাতে গাছ না হওয়ায় সারের পরীক্ষা করিতে পারা যায় নাই।

অবশিষ্ট সারের পরীক্ষা।

ইক্ষুদণ্ড।—আখে ও আলুতে বিভিন্ন প্রকারের সার প্রয়োগে উহাদের ফলন পরীক্ষা হইয়াছিল।

ইক্ষু চাষে—(১) হাড়ের গুঁড়া, (২) গোবর সার (৩) গোবর সার ও সুপার ফস্‌ফেট্ অফ লাইম্—Superphosphate of lime—(ফস্‌ফরস্ ও চূণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশ্রিত) প্রয়োগ করা হইয়াছিল। যাহাতে প্রত্যেক আথ পরীক্ষা ক্ষেত্রে উক্ত চারি প্রকারের প্রত্যেক সার হইতে ২৫০ পাউণ্ড করিয়া নাইট্রোজেন প্রাপ্ত হয়, এরূপ পরিমাণে সার সকল জমীর সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপ পরীক্ষা গত ৪ বৎসর যাবৎ করা হইতেছে। পরীক্ষার ফল সকল বৎসর সমান না হওয়ায়—কোন্ সারটী আথ চাষের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট—তাহার কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। গত বৎসর হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ফসল হইয়াছিল। লাল পিপীলিকার উপদ্রব ইক্ষুক্ষেত্রে গত বৎসর অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়াছিল। আরও কয়েক বৎসর এই সার পরীক্ষা চালাইলে, কোন্ সার আথের উপযোগী, তাহা সিদ্ধান্ত করা যাইবে।

আলু—দুই প্রকারে, আলুতে সার দিয়া আলুর ফলন পরীক্ষা করা হইয়াছিল। গোবর সার, রেড়ির খৈল, হাড়ের গুঁড়া, নিমের খৈল, এবং মহুয়া খৈল—এই পাঁচ প্রকার সার আলুতে প্রয়োগ করা হইয়াছিল। রেড়ির খৈলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আলু জন্মিয়াছিল। তন্নিম্নে হাড়ের গুঁড়া আলু চাষে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু হাড়ের গুঁড়া সারে উৎপন্ন আলু হইতে বেশী লাভ দাঁড়াইয়াছিল। নিম এবং মহুয়া খৈল গত বৎসর প্রথম দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত খৈলদ্বয় আলুর পক্ষে উপযোগী নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। রেড়ির খৈলে বিঘা করা প্রায় ৯৩ মণ এবং হাড়ের গুঁড়ায় বিঘা করা প্রায় ৮৬ মণ আলু হইয়াছিল। হাড়ের গুঁড়া সার

প্রয়োগে কম খরচ পড়িয়াছিল, কাজেই লাভ দাঁড়াইয়াছিল—অধিক। দ্বিতীয় প্রকার সার পরীক্ষায়—কেবল দুই প্রকার গোবর সার দেওয়া হইয়াছিল। বর্দ্ধমান ক্ষেত্রে প্রস্তুত গোবর সার ও স্থানীয় প্রজাদিগের নিকট হইতে ক্রীত গোবর সার দিয়া পরীক্ষায়—ক্ষেত্র-প্রস্তুত গোবর সারে বেশী আলু ফলিয়াছিল। ক্ষেত্রে পাকা গর্ত্তে গোবরসার তৈয়ারী হইয়াছিল—কাজেই তাহার গুণ উৎকৃষ্ট, সন্দেহ নাই।

ধান্য।

বর্দ্ধমান আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্রে সরু মোটা সাত রকম ধান্যের আবাদ করা হয়। ইহার মধ্যে বাঁশমতি ধান্যেরই ফলন বেশী হইয়াছিল; লাভও ইহাতে বেশ দাঁড়ায়। ইহার পরেই পরমান্নশাল। ডুমরাওনেও—বাঁশমতি ধান্যের আবাদেই বেশী ফসল এবং বেশী লাভ হয়।

ধান পাতলা করিয়া রোয়া ভাল, না ঘন করিয়া রোয়া ভাল, বর্দ্ধমানের আদর্শ ক্ষেত্রে ইহারও পরীক্ষা হইয়াছিল। জানা যায়, ধান খুব ঘন করিয়া রোয়া হইলেও ফসল সে পরিমাণে বেশী হয় না; তবে কিছু বেশী হইতে পারে।

আলু।

বর্দ্ধমান আদর্শ-কৃষি-ক্ষেত্রে নৈনিতাল, অমরাগাছি, (পাটনাই) এবং আরও কয়েকরূপ আলুর চাষ হয়। অমরাগাছিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফলিয়াছিল; বিঘা করা ১২ মণের উপর। ইহার পরেই নৈনিতালের ফলন। এই নৈনি-তালী গোটা আলু অপেক্ষা, আলু কাটিয়া বীজরূপে সেই টুকরা আলু ব্যবহার করিলে, তাহারই ফলন বেশী হয়। কিন্তু সকল প্রকার আলুই কাটিয়া এইরূপ টুকরা করিয়া, বীজরূপে ব্যবহার করিলে, প্রত্যেকের ফলন কিরূপ হয়, এ রিপোর্টে সে কথার কোন উল্লেখ নাই। ডুমরাওনে গাজীপুরী, বেতিয়া, অমরাগাছ এবং আরও দুইপ্রকার আলুর চাষ হয়। এখানে গাজীপুর আলুরই ফলন বেশী হইয়াছিল।

পাট।

বাখরগঞ্জ জেলার অনেক স্থানেই পাট বিবর্ণ হইয়া যায়। ওয়াট সাহেব বলেন, এই অঞ্চলে যে জলে পাট পচাইতে দেওয়া হয়, তাহাতে লৌহের সূক্ষ্ম অংশসমূহ অধিক মিশ্রিত থাকে; সেই জন্যই পাটের বর্ণ এরূপ হয়। এ বৎসর ইহার প্রতিকার-পক্ষে পরীক্ষা হইবে।

ইক্ষু।

বর্দ্ধমানের রাজকীয় আদর্শ-কৃষিক্ষেত্রে চারি প্রকার ইক্ষুর চাষ করা হয়;—(১) সামসাড়া (২) পুনা (৩) কাজলি এবং (৪) পুরী। সামসাড়া আখেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গুড় হয়। বিঘা করা পাকি ২৫ মণ। ইহার নীচে কাজলি; কাজলীর পর পুনা; পুনার পর পুরীর আখ। পুরীর আখ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। আখের জমির জন্য এই কয়েকটী সারের পরীক্ষা হয়,—হাড়ের গুঁড়া; গোবর; হাড়ের গুঁড়ায় মিশানো গোবর। কেবলমাত্র হাড়ের গুঁড়ার সারেই অধিক ফলন হয়। কিন্তু রিপোর্ট দেখিতেছি, ইক্ষুর জমির সারের বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত বর্দ্ধমানের আদর্শ-ক্ষেত্রে এখনও কিছু হয় নাই। ডুমরাওন ক্ষেত্রে সামসাড়া, খাড়ী, লাল বোম্বাই এবং পুনা আখের চাষ করা হইয়াছে। এ বৎসর ইহাদের গুণাগুণ জানা যাইবে।

নূতন জাতি ফসলের পরীক্ষা।

সাত জাতি ধান্যের পরীক্ষা হইয়াছিল। তন্মধ্যে "বাঁশমতি" ধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিকপরিমাণে জন্মিয়াছিল। "পরমান্নশাল" নামক ধান্য উহা অপেক্ষা কিছু কম হইয়াছিল। উক্ত দুই প্রকার চাউলই উৎকৃষ্ট। অন্যান্য স্থান হইতে আমদানী করা নূতন ধান্যের পরীক্ষা সফল হয় নাই।

"সামসাড়া" "পুনা" "কাজলী" ও "পুরী"—এই চারি জাতি ইক্ষুর চাষ করা হইয়াছিল। ফসলে ও লাভে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সামসাড়া, তন্নিম্নে কাজলী। পুরী জাতি আখ এখানকার পক্ষে উক্ত চারি প্রকারের মধ্যে ফলনে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছিল। পুনা জাতি আখ পুরী অপেক্ষা ভাল। বিঘা করা সামসাড়ায় ২৫ মণ, কাজলী আখে ২৪ মণ, পুনায় ১৮ মণ এবং পুরী আখে ১৭ মণেরও কম গুড় হইয়াছিল।

নৈনিতাল, আমড়াগাছি ও দেশীয় আলু—এই তিন জাতি আলুর ফলন পরীক্ষা হইয়াছিল। আমড়াগাছির ক্ষেত্রোৎপন্ন বীজ ও আমদানী করা বীজ বপন করা হইয়াছিল। আমদানী করা আমড়াগাছি বীজে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আলু জন্মিয়াছিল। নৈনিতাল উহা অপেক্ষা কম জন্মিয়াছিল। ক্ষেত্রোৎপন্ন আমড়াগাছি বীজে নৈনিতাল অপেক্ষা কম আলু পাওয়া গিয়াছিল। নিম্নে ফলনের তালিকা দেওয়া গেল।

আলু।	বিঘা করা ফলন।
আমদানী করা আমড়াগাছি	৭০॥০ মণ
নৈনিতাল	৮৯॥০ মণ
ক্ষেত্রোৎপন্ন আমড়াগাছি	৫২॥০ মণ
দেশী আলু	৩০।০ মণ

ভূট্টা পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল লাভ হয় নাই। আমেরিকান ও জোনপুরী ভূট্টার পরীক্ষা হইয়াছিল।

"সোরগাম" (জোয়ার জাতি) পরীক্ষায় লাল বীজ অপেক্ষা কাল বীজ উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে। কাল বীজে বেশী সোরগাম পাওয়া যায়।

নূতন কৃষিযন্ত্রের পরীক্ষা।

বৰ্দ্ধমান আদর্শক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটী কৃষিযন্ত্রের গুণাগুণ পরীক্ষিত হইয়াছিল। শিবপুর লাঙ্গল, আমেরিকান কোদালী, এবং বিহিয়া আখ-মাড়া কল।

শিবপুর লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত জমি হইতে, দেশী লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত ভূমি অপেক্ষা অধিক ফসল পাওয়া গিয়াছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আমেরিকান কোদালী, এবং বিহিয়া আখমাড়া কল ব্যবহারে সন্তোষজনক ফল হইয়াছিল।

বিভিন্ন প্রকার চাষাবাদের পরীক্ষা।

বিভিন্ন প্রকার প্রথানুসারে চাষ করিয়া ধান্য, ইক্ষু ও আলুর ফলন পরীক্ষিত হইয়াছিল।

ধান ঘন করিয়া বুনিলে বেশী ফলিবে, অথবা পাতলা করিয়া বুনিলে বেশী ফলিবে—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ঘন বুনিয়াই ধান্য বেশী পাওয়া গিয়াছিল। এক স্থানে বিঘা করা পাঁচ সের ধান্য বপন করা হইয়াছিল। অন্য স্থানে বিঘা করা ১০ সের উপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বিঘা করা ১০ সের উক্ত স্থান হইতে বেশী ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল।

সাধারণ বীজ ও বাছাই করা বীজ বপন করিয়াও ফলাফল পরীক্ষিত হইয়াছিল। বাছাই করা বীজ হইতে সামান্য বেশী পরিমাণ ধান্য জন্মিয়াছিল। উহা বাছাই করা বীজ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সাধারণ বীজোৎপন্ন ধান্য অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

চারি প্রকার বিভিন্ন প্রথানুসারে আখ চাষ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে জমীতে জল বাঁধিয়াছিল বলিয়া প্রথম প্রকার পরীক্ষা বিফল হইয়াছিল। নিম্নলিখিত তিন প্রকারে ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।

আখের "পাব" কাটিয়া আখ চাষ করা হইয়া থাকে। পূর্ব্ব বৎসরের আখের "জড়" বা গোড়া পুঁতিয়া কিরূপ আখ উৎপন্ন হয়—তাহার পরীক্ষা করা হইয়াছিল। "জড়" পুঁতিয়া বেশী পরিমাণ গুড় হইয়াছিল এবং লাভও বেশী দাঁড়াইয়াছিল।

কেবল আখের "ডগা" কাটিয়া পুঁতিলে এবং সমগ্র আখের পাব কাটিয়া পুঁতিলে কিরূপ ফললাভ হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত দুই স্থানে আখ চাষ করা হইয়াছিল। সমগ্র আখটার "পাব" কাটিয়া রোপণেই বেশী পরিমাণ আখ উৎপন্ন হইয়াছিল।

"খারি" আখ ক্ষেত্রে বর্দ্ধিতাবস্থায় পাতা বাঁধিয়া দিয়া কোন সুফল পাওয়া যায় কি না—তাহার পরীক্ষা হইয়াছিল। পরীক্ষায় অনেকটা সুফল ফলিয়াছিল বটে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে এই প্রথায় আরও পরীক্ষা করা হইবে।

এক মণ আলু এক একটা পুঁতিয়া ও উহা কাটিয়া পুঁতিয়া পরীক্ষায়, কাটিয়া বপনে বেশী লাভজনক সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কাটা ও গোটা আলু সমান সংখ্যা বপন করিলে গোটা আলু হইতে বেশী পরিমাণ আলু জন্মে বটে, কিন্তু বীজে অধিক টাকা লাগে বলিয়া গোটা আলু বপনে কাটা আলু চাষের মত লাভ দাঁড়ায় না।

অন্যান্য কৃষি।

রেশম,—মালদহ, বীরভূম এবং মুরশিদাবাদে রেশমের কাজ বেশই চলিয়াছিল। গত বৎসর ৭৮ হাজার কাহন গুটী তৈয়ার হইয়াছে।

খেজুরে গুড়,—ছোট নাগপুর, সাহাবাদ এবং পাটনায় খেজুরগাছের আবাদে কিরূপ লাভ দাঁড়ায়, তাহার পরীক্ষা হইয়াছে। কিন্তু সাহাবাদ ব্যতীত অন্যত্র সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নাই।

কাসাভা,—মুরশিদাবাদ ইসলামপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ মজুমদার পরীক্ষাস্বরূপ কাসাভার চাষ করিয়াছিলেন।

অন্যান্য বিদেশীয় কৃষি,—ভারতীয় এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটী,—পরীক্ষাস্বরূপ সিঙ্গাপুরী আনারস, ফিজি দ্বীপের পেঁপে এবং মিসর দেশের আবাসী ও

আফ্রিকাই নামক দুই প্রকার কার্পাস তুলার চাষ করেন। কার্পাসের ফলন বেশ হইয়াছিল। শিবপুর আদর্শ-ক্ষেত্রে কাবুলের ছোলা, গিনি ঘাস, মিশর-দেশজাত, সি-আইলাণ্ড নামক স্থানজাত, গারো-পর্ব্বতজাত এবং দেশী কাপাস তুলা, আরারুট, কাসাভা এবং অন্যান্য কতিপয় নূতন দ্রব্যের চাষ হইয়াছিল।

কৃষি-প্রদর্শনী।

গত বৎসর নিম্নলিখিত স্থানসমূহে কৃষিপ্রদর্শনী হইয়াছিল—

কোন্ স্থানে।	কোন্ জেলা।	সরকারী সাহায্য।
বিষ্ণুপুর	বাঁকুড়া	১০০ টাকা
সিউড়ী	বীরভূম	১৫০ "
কলিকাতা ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এগ্‌জিবিশন্—		১৫০ "
কালিমপং	দার্জ্জিলিং	৫০০ "
আলিপুর	জলপাইগুড়ী	২০০ "
ফলকাটা	ঐ	৩০০ "
বেরা	পাবনা	০ "
রুকিন্দিপুর	বগুড়া	২০০ "
সীতামারি	মজঃফরপুর	১০০ "
বেরাপুর	সাহাবাদ	০ "
তিনভাঙ্গা	ভাগলপুর	০ "
মধুপুর	সাঁওতাল পরগণা	১০০ "
কটক	কটক	১০০ "
শোণপুর	শারণ	০ "

কৃষি বিষয়ের উন্নতি-সাধনই এই সকল প্রদর্শনীর মুখ্য উদ্দেশ্য। গবমেণ্টও ইহাদের পরিপুষ্টিপক্ষে একান্ত প্রয়াসী। কৃষিজাত অত্যুৎকৃষ্ট নানারূপ দ্রব্য প্রদর্শনীর জন্য প্রদর্শনীসমূহে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা আছে। প্রদর্শনীগুলি ক্রমেই উন্নতিলাভ করিতেছে।

শেষকথা।

অতি সংক্ষেপে রিপোর্ট হইতে কয়েকটী কথা মাত্র বলা হইল। ফলতঃ এদেশের কৃষি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিলাভ করে, সে পক্ষে আমাদের কর্ত্তব্য

হৃদয় গবর্মেণ্ট যেমন সতত চেষ্টাশীল, কৃষিজীবী প্রজাগণেরও ইহার জন্ত তদধিক উদ্যোগী হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত।

বঙ্গে খর্জ্জুর চাষ।

বঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ উদরান্নের জন্ত নিয়ত পরমুখাপেক্ষী থাকিয়া পরের দাসত্বে জীবন সমর্পণ করিয়া থাকে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে বিস্তর উর্ব্বরা ভূমি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত থাকিতেও কেহ স্বাধীন-বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কৃষিকার্য্যে মনযোগী হন না। বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, জগতে যতপ্রকার জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার উন্নতির মূল ভিত্তিই কৃষিকার্য্য; তৎপরে বাণিজ্য, তৎপরে শিল্প ও কলাবিদ্যাদি। বাণিজ্যই বল, শিল্পই বল, ললিতকলাই বল, কৃষি না থাকিলে ঐ সকল বিষয়ের কোনরূপ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কারণ কৃষিকর্ম্মোৎপন্ন শস্যাদি মানবগণের জীবন ধারণের মুখ্য উপাদান এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদি ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন। এরূপ মহদুপকারী কৃষিকার্য্যে আমরা যে কেন উদাসীন থাকি তাহা কেহই বলিতে পারি না। ইহার কারণ অন্য কিছুই নহে। আমাদের অলসতা ও বিলাসিতা আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অপারগ করিয়াছে, অর্থাৎ আমরা কোনরূপ যত্ন, আয়াস ও কষ্ট স্বীকার করিয়া কোন প্রকার কৃষি ও বাণিজ্য ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু হইয়া উহাদের তত্ত্বালোচনা করি না। যাহাহউক অদ্য আমরা একটী অনায়াসলব্ধ লাভজনক কৃষিকার্য্যের বিষয় আমাদের পাঠকবর্গের গোচরে আনিলাম।

বঙ্গে খর্জ্জুরবৃক্ষ উৎপন্ন করা অধিক কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য কার্য্য নহে। এক বিঘা ভূমিতে দুই শত বৃক্ষ জন্মাইতে পারে। শীতকালে প্রত্যেক খর্জ্জুরগাছ

হইতে গড়ে আধ মণ গুড় উৎপন্ন হয়, সুতরাং এক বিঘা জমীর খেজুরগাছ হইতে বৎসরে অনায়াসে একশত মণ গুড় পাওয়া যায়, একশত মণ গুড়ের দাম নিতান্ত অল্প হইলেও আড়াই শত টাকা। একজন লোক অনায়াসে তিন চার বিঘা জমীতে খেজুর গাছের আবাদ করিয়া কয়েকজন লোক লইয়া গুড় প্রস্তত করিতে পারে। রস জাল দিবার জন্য পল্লী অঞ্চলে আশ্বাওড়া, কালকাসন্দ ও ভাঁটের জঙ্গলের অভাব নাই, জঙ্গল কাটিয়া আনিলেই হইল। শীতকালে পল্লী অঞ্চলে শর্ষপ, তিল প্রভৃতি শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে, সেই সকল শস্যের শুষ্ক গাছ অতি অল্প খরচেই পাওয়া যায়, তাহাও রস জাল দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। যশোহর ও বাঁকুড়া জেলায় অনেক দরিদ্র শ্রমজীবি এই ব্যবসায়ে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করে। বঙ্গের প্রতি পল্লীতে যদি এই ব্যবসায় আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে অনেক অন্নহীন ব্যক্তিকে ফসল হইল না বলিয়া নিয়ত আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় না, খেজুর গাছ বৃষ্টির অভাবেও বাঁচিয়া থাকে এবং বৃষ্টি না পাইলেও সুমিষ্ট রস ধারা দান করিতে কদাচ বিরত থাকে না।

খর্জ্জুর চাষে কোন প্রকার পাইট করিতে হয় না; কেবল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া চারা বসাইলেই হইল তবে মধ্যে মধ্যে গোড়ায় কিছু কিছু মাটি দিতে হয় ও পাতা কাটিয়া দিতে হয়। চারি পাঁচ বৎসরের গাছ হইলেই রস পাওয়া যায়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে জঙ্গলে (বাঁশবনে) প্রায়ই খেজুর চারা আপনাপনি জন্মাইতে দেখা যায়। বর্ষাকালে উহাদের উঠাইয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিলেই চলিতে পারে। যেখানে চারা পাওয়া যায় না, তথায় খর্জ্জুর আঁটী অাজ্ঞাইলেই হইবে। খর্জ্জুর আঁটী যে কোনরূপ অবস্থায় আজ্ঞাইতে পারা যায়। উপরে যে দুইটী চিত্র প্রদর্শিত হইল তাহাতেই সকলে বেশ বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীহরিদাস ঘোষ,
পালপাড়া, বেলুড় (হাওড়া)